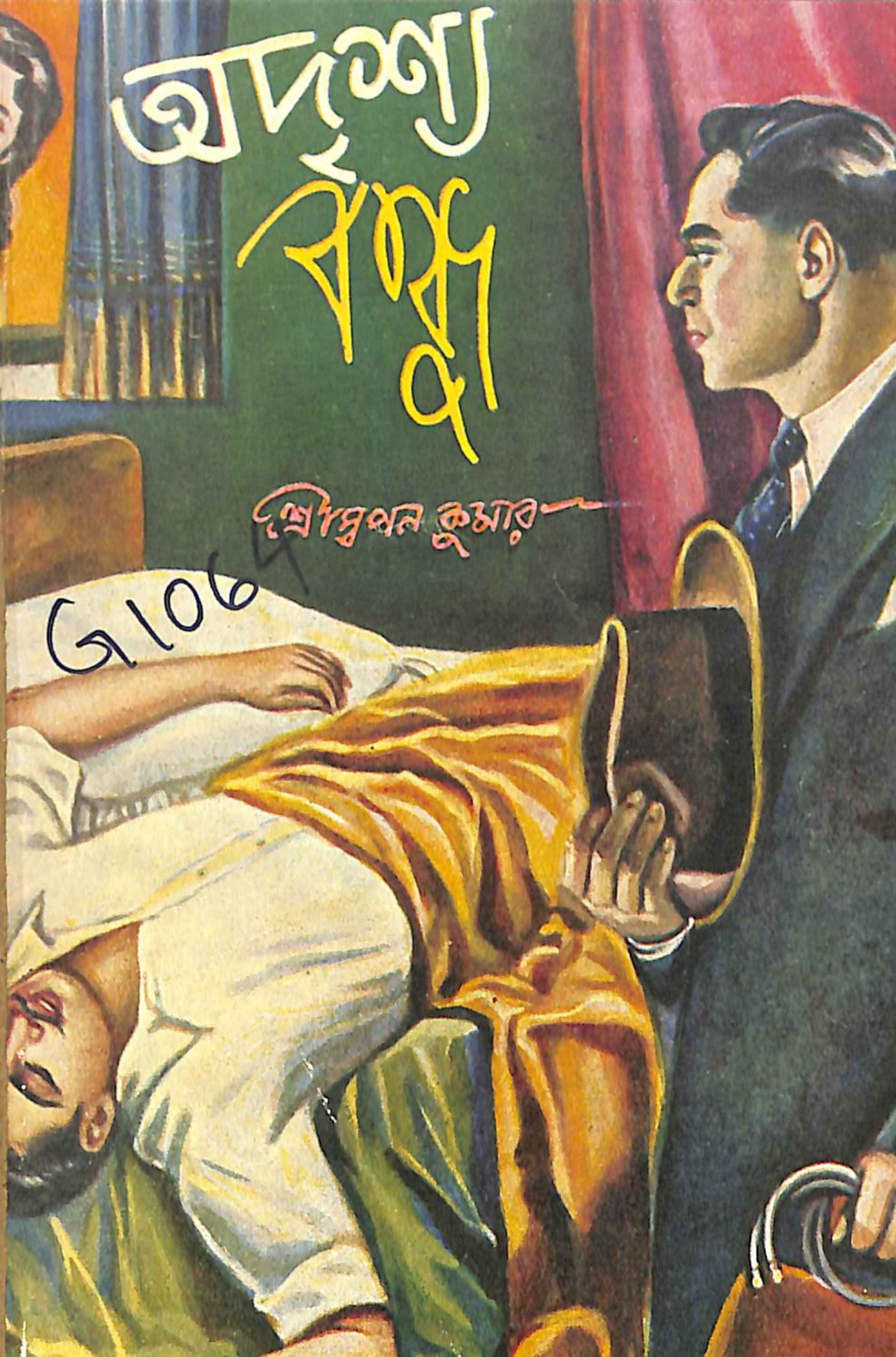

G1064

কলেজ স্টুডেন্টদের জন্য—

বিশ্ব-চক্র সিরিজের ৩৮ নম্বর বই—

G1064

বিশ্ব সাহিত্য প্রকাশনী

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার
বিশ্ব-সাহিত্য-প্রকাশনী
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

চৈত্র
১৩৭৪
৯

ছেপেছেন—
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

দাম—
৬০ পয়সা

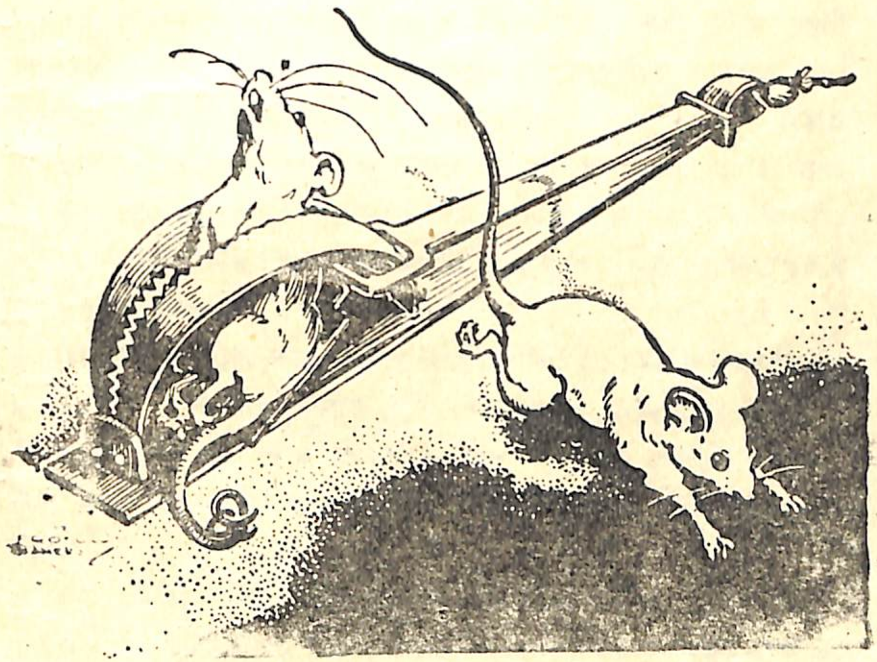

অদৃশ্য বন্ধু

এক

মিস্ ব্যানার্জীকে চেনেন ত?

ও, তাঁর নাম জানা থাকলেও তাঁকে কখনও চোখে দেখেন নি? আর দেখবেনই বা কেমন করে! তিনি ত আর অন্য পাঁচটা মেয়ের মতো সাধারণ মানুষের চোখের সামনে আসতে অভ্যস্ত নন! তিনি শিল্পী—তিনি কুশলী অভিনেত্রী। তাই সাধারণ লোকের সামনে বেরোতে বিশেষ ভালবাসেন না। তবে প্রযোজক এবং পরিচালকদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আলাপ-পরিচয়ে অভ্যস্ত না হলে আবার চিত্রজগতে চান্স পেতে অসুবিধে হয়—তাই বিশেষ বিশেষ পরিচিত প্রযোজক এবং পরিচালকের সামনে তিনি বের হন। কথাবার্তা বলেন। এমন কি হাসিখুসী, ভাবভঙ্গীর মধ্যে বেশ একটা 'গ্ল্যামার' ফুটিয়ে তুলতেও চেষ্টা করেন।

মিস্ ব্যানার্জীর ছবি কিন্তু আপনার নিশ্চয়ই পরিচিত। মাসিক, সাপ্তাহিকের মলাটে তাঁর প্রতিকৃতির 'কালার্ড আর্ট প্লেট' আজকের দিনে না দেখেছে কে? 'রূপ-রঙ' পত্রিকার সম্পাদক ত কারণে অকারণে প্রত্যেকটি স্পেশ্যাল issueতে তাঁর বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমার একরঙা দুরঙা এমন কি তিনরঙা ছবিও প্রকাশ করে থাকেন।

বলতে ভুলে গেছি কোল্‌কাতার কয়েকটি নামী সংবাদপত্রের সম্পাদকের সাথেও মিস্ ব্যানার্জীর পরিচয় আছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে ইন্টিমেসী না থাকলে ত আর পাব্‌লিসিটি হয় না—আর পাব্‌লিসিটিই হচ্ছে আজকাল

জনপ্রিয়তার মানদণ্ড। তাই মিস্ ব্যানার্জী মাত্র কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করলেও অতি-পরিচিত অভিনেত্রী। যুবকমহলে তাঁর নাম অতি-আলোচিত অভিনেত্রীদের মধ্যে একটি।

যে সময়ের কথা বলতে স্থরু করছি তখন মিস্ ব্যানার্জীর বয়স তেইশের কোঠা পেরিয়ে চব্বিশের কোঠার দিকে দ্রুত চলতে স্থরু করেছে। কিন্তু রুজ, পাউডার, লিপস্টিক আর দামী সিল্কের শাড়ির কল্যাণে তাঁকে আঠারো বছরের তরুণী বলে ভুল হওয়া বিচিত্র নয়।

যাক্, এবারে বর্তমানের কাহিনী স্থগিত রেখে মিস্ ব্যানার্জীর পুরোনো দিনের কিছু কাহিনী শোনাই আপনাদের। অতীত ইতিকথা। তাঁর সবটুকু পরিচয় পেতে হলে অতীত কাহিনীটাও জানতে হবে আপনাকে।

মুর্শিদাবাদ জেলার একটা ছোট গ্রামে ছিল মিস্ ব্যানার্জীর পিতৃগৃহ। তখন তিনি মিস্ ব্যানার্জীরূপে অবশ্য পরিচিতা হননি—তাঁর গেঁয়ো ডাকনাম ছিল মীরা। বিষ্ণুভক্ত বাবা তাঁর সবকটি ছেলেমেয়েরই ওইরকম নামকরণ করেছিলেন। মীরারা ছিল চার বোন, দুই ভাই।

যাক্, পল্লীগ্রামের কোনও একটি গেঁয়ো মেয়ের কাহিনী বেশীক্ষণ শুনতে ভাল লাগবে না আপনাদের। আর বিনিয়ে বিনিয়ে একটা দশ বছরের গেঁয়ো মেয়ের কাহিনী শোনাতে বসলে আপনিও পয়সা খরচ করে বই কিনবেন না। কাজেই পরবর্তী ইতিহাস স্থরু করছি।

মীরার মামা বড়লোক। চাকরী করতেন লক্ষ্ণৌতে। সরকারী চাকরী—মোটা মাইনে। কিন্তু ভদ্রলোকের বড় দুঃখ, তাঁর একটিও মেয়ে নেই! তিনিই একবার ছুটিতে সস্ত্রীক মুর্শিদাবাদে বেড়াতে এসে মীরার বাবার কাছে প্রস্তাব করলেন—মীরাকে তুমি আমার হাতে দাও। আমার দুটি ছেলে, কিন্তু মেয়ে একটিও নেই। আমিই ওকে মানুষ করে তুলব। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি,

ছেলেবেলা থেকেই মীরা ছিল অপূর্ব সুন্দরী, চোখ-ঝল্সানো সৌন্দর্য ওর ছিল। তা ছাড়া কথাবার্তাও ছিল খুব মিষ্টি।

মীরার বাবা ছা-পোষা মানুষ—অতগুলো ছেলেমেয়ের চাপে অতিষ্ঠ। তা ছাড়া আরও ছেলেমেয়ে হবে কি না ভগবান জানেন! কাজেই তিনি এক কথায় রাজী! আর মামার বাড়িতে মীরা থাকবেও ভাল!

তাই বাংলার এক অখ্যাত অবজ্ঞাত পল্লী থেকে আলো-ঝলমল লক্ষ্ণৌ শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে এসে আশ্রয় পেল মীরা। শুধু আশ্রয় নয়—তার মামা মামীর কাছ থেকে রীতিমত স্নেহ-ভালবাসাও আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছিল সে।

স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো মীরাকে। পড়াশুনায় তার মাথা ছিল মোটামুটি মন্দ নয়। সেকেণ্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় যখন সে উত্তীর্ণ হলো তখন তার বয়েস পনরো পূর্ণ হয়েছে।

বাবা মার কথা সুদীর্ঘদিনে সে প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল। তা ছাড়া তাঁরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত - মাঝে মাঝে দু একটা পোস্টকার্ডে কন্যাকে স্নেহাশীর্বাদ জানিয়েই কর্তব্য শেষ করতেন।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর মীরা সংকল্প করল সে আর্ট স্কুলে ভর্তি হবে। ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার দিকে তার কিছুটা ঝোঁক ছিল। অবশ্য তার আঁকা কোনও ছবিই ঠিক 'সুপার্ব' শ্রেণীতে উন্নীত হবার অবকাশ পায় নি, কিন্তু তবু মোটামুটি তাকে ছবি বলা যেতে পারে বিনা দ্বিধায়। স্নেহান্ধ মামা মামীর কাছে তাই যথেষ্ট। কাজেই মীরা হলো আর্টের ছাত্রী। অবশ্য লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলে তাকে ভর্তি করবার ইচ্ছাই তার মামার ছিল, কিন্তু মীরা বলল যে সে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হবে। আর্ট শুধু একটা বাঁধাধরা স্কেচ্ নয়—তার মধ্যে চাই লাইফ। চাই জীবন। চাই softness and lively beauty—শিল্পীর মনে

সৃষ্টির সাথে কিছুটা খামখেয়ালী মনোবৃত্তি স্থান না পেলে তা ঠিক 'গ্রাফিক আর্ট'এর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না।

মীরার আবদারকে উপেক্ষা করতে পারলেন না মামা। সত্যই ত, তাঁর নিজের ছেলে দুটো অধঃপাতে যাচ্ছে—লেখাপড়ার ধার দিয়েও যায় না তারা। অথচ মীরা শুধু যে ভালভাবে পাশ করেছে তাই নয়, ও একজন 'ইন্‌বর্ণ আর্টিস্ট'। ওর এই প্রতিভাকে নষ্ট করা চলে না। সবে-দল-মেলা ফুলটাকে ফুটিয়ে তুলতে হলে তার পেছনে যত্ন করতে হবে। এখন যদি এতটুকুও অযত্ন হয় তা হলে ওর প্রতিভা দলিত পিষ্ট হয়ে অকালে বিনষ্ট হবে।

এত টাকা খরচ করে মীরাকে ছবি আঁকার স্কুলে ভর্তি করবার ইচ্ছা অবশ্য তার মামীমার ছিল না। কিন্তু মামা একরকম জোর করেই মামীর মতকে উপেক্ষা করলেন। মেয়েটার মধ্যে যে প্রতিভা আছে তা স্ফুরিত হলে, ও ছেলেদের চেয়েও বেশী কাজে লাগবে। ছেলেরা ত একটাও মানুষ হলো না। এখন ও যদি মানুষ হয়...

মামীমার আপত্তি তাই টিকল না। মীরা ভর্তি হলো শান্তিনিকেতনে।

শান্তিনিকেতনে মীরার দিনগুলো মন্দ কাটছিল না। শুধু ছবি-আঁকা বা আর্ট শেখাটাই বড় কথা নয়, শান্তিনিকেতনের সমস্ত পরিবেশের মধ্যে রয়েছে একটা harmony—একটা একটানা সাবলীলতার সুর, যা মীরার হৃদয়কে দোলা দিল।

দিনের পর দিন কাটে।

মীরা দু একজন অধ্যাপকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলো তার প্রতিভার গুণে। তেমনি দু একজন ধনীর ছেলে, যারা শান্তিনিকেতনে পড়ত তাদের সঙ্গে তার গড়ে উঠল প্রীতির সম্বন্ধ।

শুধু প্রীতি বললে ভুল হবে, ওদের দুজনের প্রতি মীরার আচরণ দেখলে

তাকে আরও কিছুটা বেশি বলেই মনে হয়। অন্য যে কেউ দেখলে বলবে এর মধ্যে রয়েছে কিছুটা ভালবাসার ছোঁয়াচ। কিছু প্রেম আর কিছু প্রীতির মিলন।

মীরা কিন্তু কোনওদিন স্বীকার করত না তা। তার মন যথেষ্ট সবল। তুচ্ছ দুর্বলতাকে সে প্রশ্রয় দিতে চায় না। তাই মাঝে মাঝে তার মধ্যে চাড়া দিয়ে ওঠে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব। মীরা সত্যিই অবাক হয়ে ভাবে সে কি চায়! সে চায় স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, না সে চায় আর্ট? নিজের মনেই মীরা ভাবে।

ওরা দুজন কিন্তু মীরার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল অনেক বেশি। একজনের নাম শ্যামল, অন্যজন দেবব্রত। শ্যামল উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। তার বাবা কোল্‌কাতার একজন বিজনেস্‌ম্যান। মাসে তাঁর আয় হাজার খানেক টাকার কিছু বেশি। আর দেবব্রত যথেষ্ট বড়লোক। যাদবপুরে তার বড় বাড়ি আছে। দেশে আছে প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি। দেবব্রতের বাবা মাসে মাসে ছেলের জন্যে প্রায় তিনশো টাকা হাতখরচ পাঠান।

দুজনেই শান্তিনিকেতনের ছাত্র। দুজনেই মীরাকে ভালবাসে। মীরার মনেও দুজনের প্রতি কিছুটা দুর্বলতা আছে। কিন্তু সে যে সঠিক কাকে ভালবাসে তা নিজেও ভাল করে বুঝে উঠতে পারে না।

দেবব্রত শ্যামলের চেয়ে সাত আট বছরের বড়। মীরার চেয়েও সে অনেক বড়। তার বাবা খিদিরপুরের কাছাকাছি কোথায় ভাল একটা মেয়ে দেখে বিয়ের ব্যবস্থাও নাকি করেছেন। কিন্তু ছেলে জানিয়েছে সে এখন বিয়ে করবে না। মীরাকে সে বলেছে, মীরা যদি তাকে বিয়ে করতে রাজী হয় তবে তাতেই সে রাজী। না হলে সারা জীবন সে অবিবাহিত থাকবে।

মীরা তার ভালবাসাকে প্রশ্রয় দেয়নি। সে বলেছে, যে ভালবাসা এত ঠুন্‌কো, এত স্বার্থপরায়ণ, এত সংক্ষিপ্ত, তাকে সে আদৌ বিশ্বাস করে না।

মীরার সঙ্গে গাছের নিচে বসে চোখ বুঁজে কবিতা আবৃত্তি করেই তার তৃপ্তি। (পৃষ্ঠা ১১)

সে চায় উদার, স্বার্থশূন্য ভালবাসা। যে ভালবাসা আকাশের মতো উদার। সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো মহান্, শাশ্বত, পবিত্র।

G106

দেবব্রত এর উত্তরে বলেছে, 'ও সব হচ্ছে কথার ধোঁওয়া, ও সব হচ্ছে কাল্পনিক একটা কিছু। প্লেটোনিক লাভকে সে বিশ্বাস করে না। ভালবাসা চায় দয়িতকে চিরদিনের জন্যে কাছে পেতে, তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে চিরদিন হতাশভাবে বসে থাকতে চায় না সে।

কিন্তু অদ্ভুত ছেলে শ্যামল।

সে শুধু মীরাকে দেখে প্রাণ ভরে। মীরার সঙ্গে কথা বলেই তার আনন্দ। মীরার সঙ্গে গাছের নিচে বসে চোখ বুঁজে কবিতা আবৃত্তি করেই তার তৃপ্তি। মীরা তাই শ্যামলকে প্রশ্রয় দেয় দেবব্রতের চেয়ে বেশি।

এমনি ভাবেই দিন কেটে চলে।

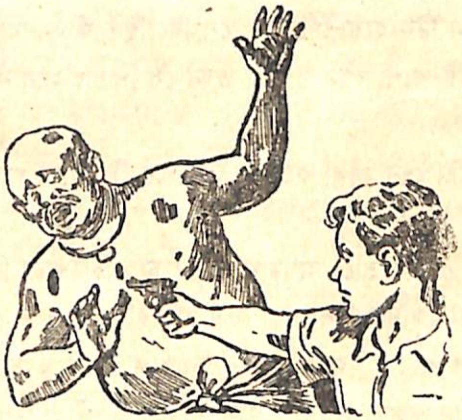

১০/৮

দুই

মীরার আর্টের কোর্স শেষ হবার কিছু আগে হঠাৎ আকস্মিকভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে তার মামা মারা গেলেন।

দীর্ঘদিন ধরে মীরা যে জিনিসটাকে স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করে গেছে, আজ হঠাৎ যেন সেটাই বড় হয়ে দেখা দিল তার জীবনে। মামা বেঁচে থাকতে থাকতে সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে এই ধারণাই ছিল তার, কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি এসে দেখতে পেল সে যা ভেবেছে তা সম্পূর্ণ ভুল। মামার এই মৃত্যু যেন তার জীবনপ্রবাহকে সম্পূর্ণ ওলোটপালোট করে দিল।

ইতিমধ্যে দেবব্রত শান্তিনিকেতন ছেড়ে দেশে চলে গেছে। সেখানে যাবার মাস দুয়েক পরে হঠাৎ মীরা একখানা চিঠি পেয়েছিল। দেবব্রত চিঠি দিয়েছে যে তার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। সে বিবাহিত জীবন যাপন করতে চায়। আর মীরাকে পাবার আশা যখন দুরাশা তখন সে পিতার মনোনীত কন্যাকেই বিয়ে করছে।

মীরার কানদুটো যেন জ্বালা করে উঠেছিল সে চিঠিখানা পড়ে।

কি স্পর্ধা!

মীরাকে সে প্রত্যক্ষভাবে অপমান করতে চায় চিঠিখানা লিখে। তার বিয়ে করার পথে ত মীরা কোনও দিন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি! তবে কেন সে মীরাকে অপমান করতে এত ব্যগ্র! হয়ত সে ধনীর ছেলে। কিন্তু তাই বলে সে মীরাকে গায়ে পড়ে অপমান করতে আসবে কোন্ সাহসে? মীরা তাই দেবব্রতের চিঠির কোনও উত্তর দেয়নি। তা ছাড়া দেবব্রত মীরার চাইতে বয়সে অনেক বড়। মীরার মত মেয়েকে বিয়ে করতে যাওয়ার দুরাশা তার মনে স্থান পেল কেমন করে!

এর কিছুদিন পরেই মীরা পেল মামার মৃত্যুর খবর। আর সেই সঙ্গে পেল মামীমার লেখা একখানা চিঠি।

তিনি লিখেছেন:

স্নেহের মীরা,

তোমার মামার মৃত্যুতে আমরা কতটা অসুবিধার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি তা তোমাকে না বুঝিয়ে বললেও তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে। তুমি জান, অমিতাভ আর ভবেশকে (মীরার মামাত ভাই) তোমার মামা চেষ্টা করেও মানুষ করতে পারেননি। তাঁর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল তোমাকে ঘিরে। তোমাকে তিনি তাঁর নিজের ছেলেদের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন।

বর্তমানে তোমাকে আর টাকা পাঠান যে সম্ভব নয় তা তুমি বুঝতে পার। আমরা চাই, তুমি মানুষ হয়ে উঠে আমাদের সারা পরিবারের ভার গ্রহণ কর। যদি তুমি লক্ষ্ণৌতে আসতে চাও আমরা প্যাসেজ ফেয়ার পাঠাচ্ছি। আর যদি তুমি মনে কর আমরা বাংলায় গেলে তোমার সুবিধে হবে, তবে আমরা এখানকার বাড়ি বিক্রি করে বাংলায় চলে যাচ্ছি। এখন তোমার মুখ চেয়েই আমাদের প্রতীক্ষা করতে হচ্ছে। আশা করি তুমি আমাদের বিমুখ করবে না। ইতি—

আশীর্বাদিকা
মামীমা।

এ চিঠিখানা পড়ে মীরার মনের অবস্থা হলো ভয়াবহ। সে উপলব্ধি করল মামীমার কাছ থেকে আর একটা পয়সাও আশা করা উচিত নয়। আর সে এতদিনে আর্ট শিখেছে যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশী সময় তার অতিবাহিত

হয়েছে শ্যামল, দেবব্রত ইত্যাদি সকলের সঙ্গে। তাই সে টাকা উপার্জন করে মামীমার অভাব দূর করবে এ আশা দুরাশা।

কিন্তু তাকে বেঁচে থাকতে হবে। তাকে সুখী হতে হবে। মামীমার কথা না চিন্তা করলেও, তার নিজের চিন্তা এখন থেকে তাকেই করতে হবে। কিন্তু টাকা উপার্জন করার বিশেষ কোনও পন্থাই জানা নেই মীরার। সে তাই ঠিক করল যে, শ্যামলের সাহায্য গ্রহণ করবে।

শ্যামলকে একদিন সে মনের কথাটা জানাল। জানাল যে শ্যামল যদি তাকে বিয়ে করতে চায় তাতে তার অমত নেই। শ্যামল এ কথার কোনও উত্তর দিল না। কিংবা শ্যামলের সত্যিকারের মনের ভাব যে কি তাও তার চোখমুখ দেখে আদৌ বোঝা গেল না। সে শুধু বলল, ভাববার জন্যে দুদিন সময় চাই।

তারপর দিন সাতেক কেটে গেল। শ্যামল বলল—চল কোল্‌কাতায় যাই। বাবাকে কথাগুলো বলি। তিনি যদি মত দেন···

তেজের সঙ্গে মীরা বলে—তুমি না পুরুষ মানুষ! বাবার মত না পেলে তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না? এতটুকু সাহস নেই তোমার মনে?

শ্যামল বলল—আমার যতটুকু জোর সব আমার বাবার কাছ থেকেই ধার করা। বাবা টাকা দেন বলেই দিন কাটে।

—কেন, তুমি টাকা উপার্জন করতে পার না? এতদিন তবে কি করলে?

—তুমি ত জান মীরা এতদিন কি করে কাটিয়েছি। ছবি এঁকে টাকা উপার্জন করবার মত ভাল ছবি আঁকতে শিখিনি, আর কোনও ব্যবসা-বাণিজ্য করবার মত বিষয়বুদ্ধিও আমার নেই। ওসব বাজে চিন্তা ছেড়ে দাও। তার চেয়ে বাবাকে ভাল করে ধরে দেখি যদি তাঁর মত করাতে পারি।

—বেশ, চল কোল্‌কাতায়।

—তুমিও যাবে?

—নিশ্চয়ই।

—থাকবে কোথায়?

—সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না। এখনও গায়ে পনেরো ভরি গহনা আছে। হাজার টাকা খরচ করলে কোল্‌কাতা শহরে থাকবার জায়গার অভাব হয় না। সেই ফাঁকে আমি কিছু ছবিও এঁকে ফেলব। যদি ভাল দামে সেগুলি বিক্রি হয়···

বাধা দিয়ে শ্যামল হেসে উঠে বলে—তোমার মন এখনও যথেষ্ট কাঁচা মীরা। বাস্তব পৃথিবীর স্পর্শে ত এখনও আসনি! ধীরে ধীরে যখন পৃথিবীটাকে চিনবে, তখন দেখবে পৃথিবী অনেক ঊষর, অনেক rough—অনেক বন্ধুরতা এর প্রতিটি চলার পথে।

মীরা এ কথার কোনও উত্তর দেয় না। স্থির করে পরদিনই তারা রওনা হবে কোল্‌কাতার দিকে।

* * * *

কোল্‌কাতায় এসে মীরা এক ভদ্রলোকের বাড়িতে 'পেয়িং গেস্ট' হিসেবে আশ্রয় নেয়। হাজরা রোডের ওপর ভদ্রলোকের বাড়ি। তিনি নিজেও একজন আর্টিস্ট। শুধু আর্টিস্ট নন, খুব ভাল ছবি আঁকতেন তিনি। কিন্তু শুধু ছবি আঁকাকেই প্রফেশন করলে চলে না—তাই নিজে খুলেছিলেন একটা ফটোগ্রাফীর স্টুডিও।

হাজরা রোড আর রসা রোডের কাটিংএর ডান দিকে দোতলার ওপর ভদ্রলোকের বিরাট স্টুডিও। মোহন ফটো স্টুডিও কোল্‌কাতার মধ্যে বেশ কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেছে অল্পদিনেই। আর সে স্টুডিওর মালিক হচ্ছেন মিঃ মিশ্র—যাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে মীরা।

মিঃ মিশ্র বিবাহিত। তাঁর স্ত্রী শোভনা দেবী একসময়ে যথেষ্ট সুন্দরী

ছিলেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু বর্তমানে তিনি কিছুটা স্থূলাঙ্গী হয়ে গেছেন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। তবুও পুরানো সৌন্দর্যের সবটুকু এখনও তাঁর শরীর থেকে মিলিয়ে যায়নি।

মীরার সঙ্গে কয়েকদিনের মধ্যেই শোভনা দেবীর অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হলো। শোভনা দেবী জানতে পারলেন কেন মীরা এসেছে কোল্‌কাতায়। সব শুনে তিনি বললেন—তোমার জন্যে আমার মনে যথেষ্ট সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছে বোন, কিন্তু কি করব, আমারও সংসার চলে কোনরকমে। ফটো স্টুডিও থেকে যা আয় হয় তা থেকে ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে, আর দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার চালিয়ে বিশেষ কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, মিঃ মিশ্রের এক ছেলে আর এক মেয়ে।

শোভনা দেবী মীরাকে ভালবাসেন ঠিক নিজের বোনের মতই। মীরাও নিজের দিদির মত শ্রদ্ধা করে শোভনাকে। শোভনাকে সে বলে দিদি আর মিঃ মিশ্রকে বলে দাদা।

এমনিভাবে প্রায় মাসখানেক কেটে গেল।

এর মধ্যে শ্যামল দুদিন এসে ঘুরে গেছে। তার মুখে শুধু এক কথা—সে চেষ্টা করেছে যথেষ্ট, কিন্তু এখনও কিছু করে উঠতে পারছে না। তার ভাবভঙ্গী দেখে মীরা বুঝতে পারে সে কতটা নিরুপায়। মীরাকে সে ভালবাসে সত্যিই। তার ভালবাসার মধ্যে এতটুকু ভেজাল নেই। কিন্তু মাকে ধরেও বাবার মত করাতে পারেনি।

তার বাবা সেকেলে মানুষ। তিনি চান মধ্যবিত্ত ঘরের মধ্যমশিক্ষিত মেয়েকে পুত্রবধূ করতে। কিন্তু শ্যামলও বেঁকে বসেছে। সে বলেছে মীরার সঙ্গে বিয়ে না হলে এ জীবনে সে বিয়ে করবে না!

মীরা অবশ্য শ্যামলের ব্যবহারে এতটুকু মনঃক্ষুণ্ণ হয়নি। সে জানে ভাগ্যে যা

আছে তা ঘটবেই। শুধু পর পর কতকগুলো দুর্ঘটনা তার মনকে কিছুটা ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল।

এর মধ্যে মীরা একবার মুর্শিদাবাদে তার পিতৃগৃহেরও খবরাখবর নিল। তার অন্য বোনদের বিয়ে দিয়ে বাবা মারা গেছেন। তার ভাইয়েরা কেউ মানুষ হতে পারেনি। অনেক কষ্টে মায়ের দিন কাটে। মীরা তাই মনস্থ করল, মাকে সে এনে কোল্‌কাতায় রাখবে।

মার কাছে চিঠি লিখল মীরা। এত দিন পরে যে মীরার কাছ থেকে চিঠি আসতে পারে এ ধারণা তার মায়ের ছিল না—তাই যথেষ্ট খুশী হলেন তিনি। দিন দুয়েক পরে একদিন বিকেলে তিনি এসে উপস্থিত হলেন কোল্‌কাতায়।

হাজরা রোডের কাটিং থেকে ডানদিকে একটা সরু গলির মধ্যে একটি বাড়ির দোতলায় মিঃ মিশ্রের ফ্ল্যাট। মীরা সেখানেই থাকে। মীরার জন্যে একটি পৃথক ঘরের ব্যবস্থা হয়েছিল। মাও এসে সেখানেই আশ্রয় নিলেন। মাকে পেয়ে অনেক অসুবিধার মধ্যেও মীরার মনে কিছুটা সান্ত্বনা ফিরে এলো। যাই হোক, আপাততঃ মাকে কাছে পেয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারল সে।

তিন

শ্যামলের সঙ্গে বিয়ের আশা আর মীরার ছিল না। কিন্তু গহনা বিক্রি করে যে টাকা ছিল তাও দিনে দিনে প্রায় ফুরিয়ে এলো। একটা কিছু মীরাকে করতে হবে। কিন্তু কি ভাবে সে নিজেকে তুলে ধরবে পৃথিবীর সামনে? এমন কি উপায় আছে, যা থেকে প্রচুর উপার্জন করা তার পক্ষে সম্ভব?

মীরা তার কথা খুলে বলে মিঃ মিশ্রের কাছে। মিঃ মিশ্রও কিছুটা চিন্তিত হন।

তিনি মীরার কাছে নতুন একটা প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁর স্টুডিওতে মডেলের কাজ করে কয়েকটি মেয়ে। ছবি-আঁকা বা ফোটোর কাজে কারণে-অকারণে তাদের প্রয়োজন হয়। মিঃ মিশ্রের ছবি মাঝে মাঝে আর্ট একজিবিশনে ভাল দামে বিক্রি হয়। মীরা যদি মডেল হিসেবে তাঁর স্টুডিওতে সিটিং দেয় তবে মাসে দু তিন শো টাকা তার পক্ষে উপার্জন করা সম্ভব।

প্রথমে কিছুটা চিন্তিত হয় মীরা। আর্টিস্ট হিসেবে সারা ভারতে খ্যাতি অর্জন করবার স্বপ্ন ছিল যার মনে, সে কিনা সামান্য একজন মডেল হিসেবে গিয়ে দাঁড়াবে অন্য এক আর্টিস্টের সামনে! নিজের অর্ধনগ্ন দেহকে অন্য এক পুরুষের চোখের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তুলে ধরে টাকা উপার্জন করতে হবে তাকে!

কিন্তু তার মা বললেন, এ ছাড়া উপায় কি তার! তা ছাড়া মিঃ মিশ্র সত্যিকারের চরিত্রবান পুরুষ। তাঁর সামনে দাঁড়াতে তার লজ্জা করবার কিছু নেই!

তা ছাড়া মীরা সত্যিকারের সুন্দরী। তার মতো একজন সত্যিকারের নারীকে মডেল হিসেবে পেলে মিঃ মিশ্রের খুবই সুবিধা। তিনি চান সত্যি-

কারের এমন একজন মডেল, যাকে জোর করে ডিরেকশান দিয়ে পোজ্ সৃষ্টি করতে হবে না, যে আপনা থেকেই নিজের দেহকে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় লীলায়িত করে তাঁর নিত্য নতুন ছবির খোরাক জোগাবে।

তাতে সফল হলেন তিনি। মীরা সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেল মিঃ মিশ্রের প্রস্তাবে। সে বলল, শুধু মডেল হিসেবেই নয়, সে মিঃ মিশ্রের স্টুডিওতে যাবে তাঁর ছাত্রী হিসেবেও। মীরা নিজে একজন আর্টিস্ট। কিন্তু আর্ট স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হয়নি তার। সে নিজেও হয়ত পারে ছবি আঁকতে—কিন্তু সে ছবি পূর্ণ রূপ পায় না। প্রকাশভঙ্গীকে কি করে সব দিক থেকে পূর্ণ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে রূপায়িত করতে হয় তা ভাল করে জানা নেই তার।

মিঃ মিশ্র তার প্রস্তাবে রাজী হলেন। মীরা যাতায়াত সুরু করল মিঃ মিশ্রের স্টুডিওতে।

কিন্তু মিঃ মিশ্রের স্টুডিওতে দিন কয়েক যাতায়াত করেই মীরার লজ্জা কেটে গেল। দূর হলো তার আড়ষ্টতা। প্রথম দিনেই তার বিভিন্ন ভঙ্গিমার কতকগুলি ছবি তুললেন মিঃ মিশ্র। তিনি শুধু একজন ভাল ক্যামেরাম্যান নন—তাঁর পোর্‌ট্রেটের মধ্যে পাওয়া যায় লাইফ! কি করে ছবির মধ্যে জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে হয়, তা বেশ ভালমত জানা আছে তাঁর।

খুশী হলো মীরা। মিঃ মিশ্রের চোখের সামনে নিজের দেহের আবরণকে উন্মোচন করতে এতটুকু লজ্জা লাগত না তার। মিঃ মিশ্রের সামনে সে একজন নারী নয়—সে শুধু একটা শরীর। শুধু দেহের কতকগুলো উন্নত বা অবনত অংশই তার সবচেয়ে বড় জিনিস। এর মধ্যে প্রাণ আছে কি না আছে, মন আছে কি না আছে সেটা ভাববার সময় ছিল না মিঃ মিশ্রের। তিনি শুধু তার শরীরের বিভিন্ন অনলস ভঙ্গিমার বিভিন্ন রূপকে ক্যানভাসের বুকে তুলে ধরতে পারলেই সন্তুষ্ট।

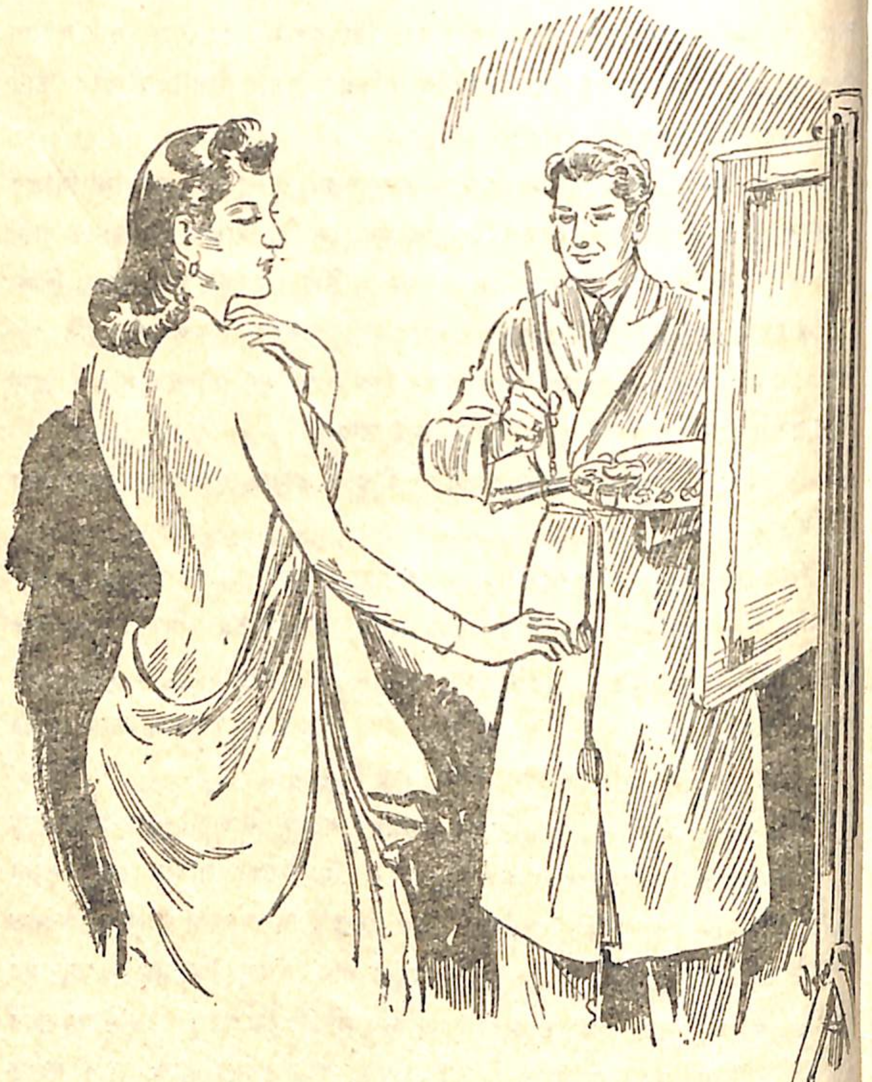

…দেহের আবরণকে উন্মোচন করতে লজ্জা লাগত না তার (পৃষ্ঠা ১৭)

কিন্তু ছবি আঁকার মধ্যে রয়েছে কতোটা আর্ট, কতোটা নিপুণতা চাই যে কোনও ছবিকে সত্যিকারের গ্রাফিক আর্টের স্ট্যাণ্ডার্ডে তুলে ধরতে সেটা বেশ ভাল করেই জানা ছিল মিঃ মিশ্রের। তাই যথেষ্ট খুশী হয়েছিল মীরা। এখানে এসে সে কিছু শিখতে পারবে অন্ততঃ।

এমনিভাবেই দিন চলছিল।

মিঃ মিশ্রের আঁকা তুটো ছবি আর্ট একজিবিশনে যথেষ্ট সম্মান পেল। বেশ মোটা দামে তিনি সেগুলোকে বিক্রি করলেন। মীরাও অবশ্য তুখানা ছবি সাব্‌মিট করেছিল সেখানে। মীরার ছবি কিন্তু তেমন কদর পেল না। সকলেই মত প্রকাশ করল যে মীরার ছবি আঁকবার হাত এখনও তেমন পাকেনি। সত্যিকারের আর্টের স্ট্যাণ্ডার্ডে ছবিকে তুলতে গেলে যতটুকু সাধনার প্রয়োজন তা তার নেই।

মিঃ মিশ্রের আঁকা যে তুখানা ছবি পুরস্কার পেল সে তুখানাই কিন্তু মীরার প্রতিকৃতি। একটি হচ্ছে ভৈরবীবেশে মীরা কতকগুলি বৃক্ষে জলসিঞ্চন করছে, অন্যটি হচ্ছে মীরা একটি বিরাট সাপের বাঁধনে অক্টোপাসের মতো বাঁধা পড়েছে। তার সারা দেহে একটা বিভীষিকার স্পর্শ। সারা চোখে-মুখে একটা আতঙ্ক আর ভয়াবহতার ছায়া।

মীরার প্রতিকৃতি তুটি পুরস্কার পাবার পর বিভিন্ন চিত্র-প্রতিষ্ঠান থেকে মীরার আমন্ত্রণ এলো ছবিতে অভিনয় করবার। মীরা কিন্তু তখনও সিনেমার অভিনয় কি জিনিস তা জানত না। কিন্তু তার দৈহিক গঠন যে চিত্রে অভিনয়ের উপযোগী তা স্বীকার করল অনেকেই। এমন কি মিঃ মিশ্রও বললেন, এমন সুযোগ তোমার ত্যাগ করা উচিত নয় মীরা।

মীরারও কথাটা মনে হয়েছিল। সত্যিই এ যেন তার কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক

জগৎ। সে হবে মস্তবড় একজন অভিনেত্রী। সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে তার সুনাম।

মীরা রাজী হলো। ফিল্ম কোম্পানীকে জানিয়ে দিল যে সে অভিনয় করতে রাজী।

পরদিনই কণ্ট্রাক্ট সই হয়ে গেল। মীরা প্রথম বইতে একটা ছোট রোল করল। 'সেকেণ্ড্ হিরোইন্'এর রোল। মীরা সে বইয়ের জন্যে পেল দেড় হাজার টাকা।

*   *   *   *

দিন হয়ত এমনি করেই কাটত।

মীরা পর পর অনেকগুলি বইতে কণ্ট্রাক্ট করেছিল। সব মিলিয়ে চারটি কি পাঁচটি।

ছবি আঁকায় তার প্রতিভা থাক বা না থাক ফিল্মে অভিনয় ব্যাপারে তার প্রতিভা ছিল সত্যিই প্রশংসনীয়। মীরার অভিনীত প্রতিটি ছবিই সুনাম অর্জন করতে লাগল। মীরার খ্যাতিও বেড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু সমস্ত কিছু গোলমাল হয়ে গেল একটা ব্যাপারে।

মীরা তখন চতুর্থ ছবিতে কণ্ট্রাক্ট করতে চলেছে। ফিল্ম কোম্পানীর অফিসে হয়েছে তার আমন্ত্রণ।

কিন্তু স্টুডিওতে পা দিয়ে সে জীবনে যা আশা করেনি এখানে ঘটল তেমনি এক অঘটন। এই ফিল্ম কোম্পানীর প্রোডিউসার ভদ্রলোক ছিলেন মাল্টি-মিলিওনেয়ার। মীরা শুনেছিল তিনি যে কটা বই প্রোডিউস করেছেন সব কটাই হিট্ করেছে।

ফিল্ম অফিসে স্যুইং ডোরটাতে মৃদু ঠেলা দিয়ে মীরা ভেতরে প্রবেশ করে নমস্কার জানায়। কিন্তু তারপর ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়েই সে অবাক হয়ে যায়।

সে যেন চোখের সামনে একটা জীবন্ত অশরীরীর দর্শন পেয়েছে। কিংবা সে যেন পৃথিবী ছেড়ে কোন্ এক সুদূর গ্রহের দিকে যাত্রা করেছে।

মীরা হতভম্ব। বিস্মিত। বিমূঢ়।

তার সামনে প্রোডিউসারের আসনে বসে শান্তিনিকেতনের অতীত দিনের ছাত্র দেবব্রত!

—আপনি! মীরার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

—চিনতে পেরেছ তা হলে?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি

—ঠিকই ধরেছ। আমিই এ বইয়ের প্রোডিউসার। মানে ফাইনেন্সার।

—কতদিন আপনি এ লাইনে…

—বছর দুয়েকের কিছু বেশি হলো। বাবার মৃত্যুর পর থেকেই।

—ভাল।

—তুমি কতদিন এসেছ ফিল্ম ওয়ার্ল্ডে?

—আমারও বছর দুই তিন হলো।

—হঠাৎ ছবি আঁকা ছেড়ে অভিনেত্রীর বেশে যে তোমাকে কোনওদিন দেখতে পাব, শান্তিনিকেতনে থাকতে তা কল্পনাও করিনি আমি।

—অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রকৃতি পালটায়।

—ভাল কথা। আমাদের বইতে কিন্তু তোমাকে প্রথম প্রধান ভূমিকায় সুযোগ দেব বলে ইচ্ছা করেছি। এর আগে সব কটা বইতেই 'সেকেণ্ড হিরোইন্'-এর রোল করে আসছ।

—আপনাদের সহৃদয়তার জন্যে ধন্যবাদ। যাক সে কথা, বাড়ির খবর কি বলুন!

—বাড়ির খবর মানে?

—মানে আপনার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে···

হো হো করে হেসে ওঠে দেবব্রত। বলে—আমি বড্ড unlucky মীরা। বিয়ের পর আমার স্ত্রী বেচারা কিছুদিন সংসার করবার আনন্দটুকুও উপভোগ করতে পেল না।

—তার মানে ?

—প্রথম ছেলেটার ডেলিভারীর সময়েই তিনি দেহরক্ষা করেছেন !

—বুঝলাম। তাই বোধ হয় সংসারে বৈরাগ্য এসেছে আপনার ?

—কিছুটা তাই।

—আর সেইজন্যেই বোধ হয় সব ছেড়ে যোগ দিয়েছেন ফিল্ম লাইনে ?

—অস্বীকার করছি না।

—কিন্তু আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবছি আপনি এতটা পরিবর্তিত হলেন কি করে ?

—মনের দুঃখে। বয়সটা এমন বেড়ে গেছে যে এ বয়সে কেউ আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়েও দেবে না। কাজেই সংসার সম্বন্ধে আমি উদাসীন। কিন্তু একটা কিছু ত করতে হবে ! তাই নেমে পড়লাম ফিল্ম লাইনে।

—নিত্য নতুন হিরোইনদের সঙ্গে এভাবে আলাপ-আলোচনা করবার সুযোগ পাবার জন্যেই এ লাইনে এসেছেন বোধ হয় ? বিদ্রূপের ছোঁয়াচ পাওয়া যায় মীরার কণ্ঠে।

—তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ মীরা ?

—মোটেই না।

—তবে এরকম কথা বলার অর্থ ? চিত্রজগৎকে যদি এতটা ঘৃণাই কর তবে এ পথে এলে কেন ?

—কিছুটা বাধ্য হয়ে।

—সেকি, আমি ত জানতাম তুমি এতদিন শ্যামলকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করছ।

—সে একটা ভীরু। কাপুরুষ। তার সাহস হলো না বাবার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাকে বিয়ে করে !

—বুঝলাম। তাই বুঝি মনের দুঃখে শেষ পর্যন্ত ফিল্ম লাইনে যোগ দিলে ?

—কিসের দুঃখে যোগ দিলাম তা জানি না—তবে আর যাই হোক আমার মধ্যে মনের বৈরাগ্য নেই এতটুকু।

আবার হেসে ওঠে দেবব্রত। বলে—তুমি দেখছি এখনও আগের মতই আছ। বয়স বেড়েছে, কিন্তু প্রকৃতি বদলায়নি এতটুকু ! যাক্, কাল পরশু এসে আমাদের ছবিতে কণ্ট্রাক্ট করবে। আগামী সাত তারিখেই পরবর্তী বই মহরৎ হচ্ছে।

—আর আমার যদি ইচ্ছা না থাকে আপনার ছবিতে কণ্ট্রাক্ট করবার ?

—সেকি ? ছবিতে অভিনয় করাই যখন তোমার প্রফেশন তখন আমাদের কোম্পানীকে ignore করবার ইচ্ছা নিশ্চয়ই হবে না তোমার ! আর যাই হোক বাজারে আমাদের কোম্পানীর একটা গুড উইল আছে ; আমাদের কোম্পানীতে প্রধান নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করলে সুনাম ছাড়া দুর্নাম হবে না তোমার !

কোনও কথা বলে না মীরা। একটু থেমে বলে—বেশ, কালই আমি আসছি আপনার কাছে।

—ধন্যবাদ।

ধীরে ধীরে হাতের চুরুটটাতে একটা সুদীর্ঘ টান দেয় দেবব্রত। তারপর বলে—তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমি।

মীরা ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে গ্রীবার সূক্ষ্ম আন্দোলনে একটা তরঙ্গের হিল্লোল তুলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

দেবব্রতের সারা মনে যেন তখন বিরাজ করতে থাকে মীরার কথা।

—মানে আপনার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে···

হো হো করে হেসে ওঠে দেবব্রত। বলে—আমি বড্ড unlucky মীরা। বিয়ের পর আমার স্ত্রী বেচারা কিছুদিন সংসার করবার আনন্দটুকুও উপভোগ করতে পেল না।

—তার মানে?

—প্রথম ছেলেটার ডেলিভারীর সময়েই তিনি দেহরক্ষা করেছেন!

—বুঝলাম। তাই বোধ হয় সংসারে বৈরাগ্য এসেছে আপনার?

—কিছুটা তাই।

—আর সেইজন্যেই বোধ হয় সব ছেড়ে যোগ দিয়েছেন ফিল্ম লাইনে?

—অস্বীকার করছি না।

—কিন্তু আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবছি আপনি এতটা পরিবর্তিত হলেন কি করে?

—মনের দুঃখে। বয়সটা এমন বেড়ে গেছে যে এ বয়সে কেউ আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়েও দেবে না। কাজেই সংসার সম্বন্ধে আমি উদাসীন। কিন্তু একটা কিছু ত করতে হবে! তাই নেমে পড়লাম ফিল্ম লাইনে।

—নিত্য নতুন হিরোইনদের সঙ্গে এভাবে আলাপ-আলোচনা করবার সুযোগ পাবার জন্যেই এ লাইনে এসেছেন বোধ হয়? বিদ্রূপের ছোঁয়াচ পাওয়া যায় মীরার কণ্ঠে।

—তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ মীরা?

—মোটেই না।

—তবে এরকম কথা বলার অর্থ? চিত্রজগৎকে যদি এতটা ঘৃণাই কর তবে এ পথে এলে কেন?

—কিছুটা বাধ্য হয়ে।

—সেকি, আমি ত জানতাম তুমি এতদিন শ্যামলকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করছ।

—সে একটা ভীরু। কাপুরুষ। তার সাহস হলো না বাবার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাকে বিয়ে করে!

—বুঝলাম। তাই বুঝি মনের দুঃখে শেষ পর্যন্ত ফিল্ম লাইনে যোগ দিলে?

—কিসের দুঃখে যোগ দিলাম তা জানি না—তবে আর যাই হোক আমার মধ্যে মনের বৈরাগ্য নেই এতটুকু।

আবার হেসে ওঠে দেবব্রত। বলে—তুমি দেখছি এখনও আগের মতই আছ। বয়স বেড়েছে, কিন্তু প্রকৃতি বদলায়নি এতটুকু! যাক্, কাল পরশু এসে আমাদের ছবিতে কণ্ট্রাক্ট করবে। আগামী সাত তারিখেই পরবর্তী বই মহরৎ হচ্ছে।

—আর আমার যদি ইচ্ছা না থাকে আপনার ছবিতে কণ্ট্রাক্ট করবার?

—সেকি? ছবিতে অভিনয় করাই যখন তোমার প্রফেশন তখন আমাদের কোম্পানীকে ignore করবার ইচ্ছা নিশ্চয়ই হবে না তোমার! আর যাই হোক বাজারে আমাদের কোম্পানীর একটা গুড উইল আছে; আমাদের কোম্পানীতে প্রধান নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করলে সুনাম ছাড়া দুর্নাম হবে না তোমার!

কোনও কথা বলে না মীরা। একটু থেমে বলে—বেশ, কালই আমি আসছি আপনার কাছে।

—ধন্যবাদ।

ধীরে ধীরে হাতের চুরুটটাতে একটা সুদীর্ঘ টান দেয় দেবব্রত। তারপর বলে—তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমি।

মীরা ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে গ্রীবার সূক্ষ্ম আন্দোলনে একটা তরঙ্গের হিল্লোল তুলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

দেবব্রতের সারা মনে যেন তখন বিরাজ করতে থাকে মীরার কথা।

চার

মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যা সত্যিই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অভাবনীয়। মানুষ প্রথমে সেটা ঠিক কল্পনা করতেও পারে না। ঠিক যখন ঘটনাটা ঘটে যায় তখন সে অবাক হয়ে ভাবতে থাকে কেমন করে এটা ঘটল। তারপর নতুন ঘটনার তালে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে।

ঠিক তেমন একটা ঘটনা ঘটল মীরার জীবনেও। মীরা ঠিক এমন একটা কিছু কল্পনা করেনি। কিন্তু কেমন করে যে এটা ঘটল সেটাও সে আশ্চর্য হয়ে ভাবে। যথারীতি কন্ট্রাক্ট সই হয়ে গেল। মীরা পরিচিত হলো নতুন পরিচালক ও সহ-পরিচালকের সঙ্গে। অবশেষে দেবব্রতের সঙ্গে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

গাড়িতে উঠে বসল ওরা দুজন—দেবব্রত আর মীরা। দেবব্রত বলল, সে মীরাকে তার বাড়ি পর্যন্ত একটা লিফ্‌ট্ দেবে।

মীরা আপত্তি জানাল না। দেবব্রত বসল ড্রাইভারের সীটে। সে নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করবে। মীরা বসল তার পাশে। গাড়ি ছুটে চলল।

দেবব্রতই কথা বলল প্রথমে। সুরু করল—আমাদের অফিস তোমার কি রকম লাগল মীরা?

—ভাল।

—এখানে কাজ করতে নিশ্চয়ই কোনও অসুবিধে···

বাধা দিয়ে মীরা বলে—অতটা ফর্ম্যালিটি কিন্তু আমি সহ্য করতে পারব না দেবব্রত।

—তার মানে? তুমি এতক্ষণ ছিলে আমাদের গেস্ট···

খিল খিল করে হেসে ওঠে মীরা। বলে—যাদের কোম্পানীতে আমি যখন যাই তখনই তাদের ফর্ম্যালিটি দেখে অবাক হয়ে যাই। কিন্তু তারপর যখনই তাদের কোম্পানী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই, তখন তাদের কারো সঙ্গে দেখা হলে সে ফর্ম্যালিটির চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাই না।

—তার মানে তুমি বলতে চাও, সবই শুধু মাত্র স্বার্থের প্রয়োজনে?

—নিশ্চয়ই তাই।

—কিন্তু আমার কি স্বার্থ আছে বিশেষ করে তোমাকে মনোনীত করবার জন্যে?

—হয়ত অতীত দিনের বন্ধুত্বের নিদর্শনের জন্যেই তুমি এতটা পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছ আমার প্রতি!

—কিন্তু এমনও ত হতে পারে যে, আমার নিজের ধারণা আমাদের ছবি অনুযায়ী এই 'রোল'টাই তোমার সবচেয়ে বেশি স্যুট করবে!

—তা অবশ্য পারে। কিন্তু সে কথা যাক! এখন অন্য একটা বিশেষ কথা বলতে চাই তোমাকে। যে জন্যে তোমার সঙ্গে তোমার গাড়িতে বের হলাম।

—কি বিশেষ কথা? আড়চোখে একবার মীরার মুখের দিকে চেয়ে দেবব্রত বলে।

—তুমি কি আর বিয়ে করবে না বলে মনস্থির করে ফেলেছ?

—কিছুটা তাই।

—কারণ?

—এ বয়সে মেয়ে দেবে কে বল?

—যদি মেয়ের ব্যবস্থা আমি করে দিই?

—তবে হয়ত আপত্তি নেই!

—কিন্তু বাংলাদেশে কি ধনীর ছেলের জন্যে মেয়ের অভাব আছে নাকি? মীরা প্রশ্ন করে।

—তা হয়ত নেই। কিন্তু চল্লিশের কাছাকাছি যে ছেলের বয়স তার সঙ্গে বিয়ে করে তেমন ছেলেকে ভালবাসবে এমন মেয়ে বাংলাদেশে নেই বললেই চলে।

—সেকি কথা! তার মানে তুমি বলতে চাও বিয়ের পর তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালবাসবে না?

—মন খুলে ভালবাসবে না নিশ্চয়ই! হয়ত কিছুটা ভালবাসা দেখাবার চেষ্টা করবে···কিন্তু সেটা হবে নেহাৎই বাহিক। হয়ত সে ভালবাসবে আমার টাকাকে, আমাকে নয়!

—এই ধরনের ধারণা তোমার কতদিন থেকে হলো?

—যবে থেকে আমি একটা মেয়ের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি।

আবার হেসে ওঠে মীরা। দেবব্রতের দিকে চেয়ে বলে—একটা মেয়ে বলতে আমাকে বোঝাতে চাইছ ত?

দেবব্রত কোনও উত্তর দেয় না।

মীরা বলে—কিন্তু বর্তমানে যদি সেই মেয়েটি অতীত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়?

—তার মানে? দেবব্রত বিস্মিতভাবে বলে।

—মানে অতি প্রাঞ্জল। আমি যদি তোমাকে বিয়ে করতে চাই?

—এ তুমি কি বলছ মীরা?

—ঠিক বলছি।

—এটা কি তোমার মনের কথা?

—তার মধ্যে সন্দেহ আছে নাকি?

—না থেকে উপায় কি! অতীত দিনের মীরার মধ্যে বর্তমানে এতটা পরিবর্তন ঘটবে এটা আমি অত সহজে আশা করতে পারিনি।

—যাক, তোমার তরফ থেকে আপত্তি নেই ত?

—আপত্তি মানে! তুমি কি বলতে চাও? আমি অবশ্য এখুনি কথা দিতে পারছি না। আমাকে একটু ভাববার সময় দাও।

—কেন?

—আমার বাবা মারা গেছেন বটে, কিন্তু আমার মা এখনও বেঁচে। আর তা ছাড়া আমাদের পরিবারে অনেক ক'জন আত্মীয়বর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে চলতে হয় আমাকে। অনেকগুলি পোষ্যের ভার আমার ওপর। তাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তুমি চলতে পারবে কিনা···

—সে বিষয়ে তোমার অনর্থক দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। আমাকে তুমি আর যাই ভাব না কেন এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার যে তোমার পরিবারের কেউ আমাকে বলতে পারবে না যে আমি এতটুকুও স্বার্থপর।

—যাক, তুমি আমাকে ক'দিন ভাববার সময় দিতে রাজী আছ মীরা?

—কতদিন তুমি চাও।

—দিন তিনেক?

—বেশ, রাজী।

—তুমি তিন চার দিন বাদে নিশ্চয়ই অফিসের দিকে আসছ?

—তুমি যদি বলো, আসব। এখন থেকে কোনও কাজ তোমার অনুমতি না নিয়ে করা উচিত নয়। মীরা হেসে ওঠে কৌতুকের হাসি।

—এখন থেকেই এতটা আনুগত্য ভাল নয়। দেবব্রতের কথার মধ্যে কেমন যেন একটা ঠাট্টার সুর।

মীরা কথা বলে না। একটু থেমে বলে—সত্যি তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত ভেবেছিলাম জীবনটাকে একটা খাতে বইয়ে দেব। কিন্তু তোমার দেখা পাওয়ার পর থেকে সবকিছুই কেমন যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল। আশ্চর্য !

—আশ্চর্যের আর কি আছে ! আমার ছবির হিরোইন্ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে তুমি হলে আমার জীবনের হিরোইন্। আমি সত্যিই ভাবছি মীরা, পৃথিবী কতো দ্রুত পরিবর্তনশীল !

গাড়ির গতি কমে যায়। গাড়ি ক্রমে থামে হাজরা রোডের সামনে। দেবব্রত বলে—আজকের জার্নিটা আরও দীর্ঘস্থায়ী হলে বোধ হয় ভাল হতো, কি বল মীরা ?

মীরা বলে—কি সব বলছ ! কে আবার শুনে ফেলবে হয়ত। আচ্ছা, চলি। গুড্ বাই।

দেবব্রত গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

* * * *

বাড়ি ফিরে এসে মীরা ভাবে।

এ সে কী করল ? এতে কি সে আনন্দ পাবে ? পেতে পারবে পরম ও বহু-আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তি ?

হয়ত পাবে। কিন্তু…

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে মীরার নিস্পন্দ বুক ভেদ করে। শ্যামলকে সে চেয়েছিল, কিন্তু পায়নি। আর দেবব্রতকে সে চায় না, অথচ তাকেই পেতে হবে।

হ্যাঁ, দেবব্রতকে সে জয় করবে। তার জীবনে যে চিত্তের ধু ধু করা হতাশ তপ্ত মরুভূমি অকালে ঘনিয়ে আসবে এটা সে চায় না। এটা সে ঘটতে দিতে

পারে না। জীবনকে পরিপূর্ণ উপভোগ করতে চায় সে। কানায় কানায়। জীবন-সমুদ্রের প্রতিটি ঢেউয়ে সে গা ভাসিয়ে দিতে চায়। আর তাই…

একটা চিন্তা ঝিলিক দেয় তার মাথায়। কিন্তু না। তার চেয়ে যা সে করতে চলেছে সেটাই অনেক সহজ। অনেক আনন্দপূর্ণ। আর তার মধ্যে বিপদও অনেক কম ! জীবনকে একটা নিশ্চিন্ততার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় মীরা। তার এ রূপ ও যৌবন চিরদিন থাকবে না। চিরদিন সে পারবে না অন্যের চোখের সামনে নিজেকে মোহনীয় করে তুলে ধরতে। তখন সে কি করে জীবন কাটাবে ? কিসের ওপর ভরসা করতে পারবে সে ?

তার চেয়ে এ অনেক ভাল। অনেক বেশি অবলম্বন সে পাবে এর মধ্যে। অনেক বেশি তৃপ্তি।

মীরা মনস্থির করে।

* * * *

দেবব্রতের মত পাওয়া যায়। অনেকদিন পরে ছেলে বিয়ে করতে চেয়েছে শুনে মা খুশীমনেই মত দেন। এমন কি মেয়েটিকে দেখবার ইচ্ছাও হয় না তাঁর।

আর আত্মীয়স্বজনেরা সকলেই দেবব্রতের পোষ্য। দেবব্রতের কোন কাজে বাধা দেবার ক্ষমতা তাদের নেই। তাদের ক্ষমতা নেই তাকে তার পথ থেকে বিচ্যুত করবার।

তাই বিয়ের দিন স্থির হলো।

বাজনা, আলো আর আনন্দের মধ্য দিয়ে বিয়ের কলরব ঢুকে গেল খিদিরপুরের মায়া-মঞ্জিলে। দেবব্রতের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর নাম ছিল মায়া—তাই বাড়ির নামও ছিল মায়া-মঞ্জিল।

বিয়েতে উপস্থিত হলেন অনেকেই। মিঃ মিশ্র, মিসেস্ মিশ্র অর্থাৎ শোভনা দেবী, শ্যামল ইত্যাদি সকলেই নবদম্পতিকে বিভিন্ন সামগ্রী উপহার দিলেন।

শ্যামলও এসেছিল নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে। সে মীরাকে উপহার দিল কবিগুরুর লেখা 'শেষের কবিতা' বই একখানা।

বইখানা হাতে নিয়ে মীরা একটু হাসল। শ্যামল বড় বড় করে উপহারের পাতায় লিখেছে—'হে বন্ধু বিদায়'...

মীরা শ্যামলের দিকে চেয়ে বলল—এই ধরনের emotionই বাংলাদেশের ছেলেদের মাথা খেয়েছে।

—তার মানে?

—মানে অতি প্রাঞ্জল। মাত্র দুটো কথা লিখেই খালাস! আপনি কি কথাদুটোর অর্থ বুঝে লিখেছেন?

—না, মানে...

—আপনার মাথা! আপনার জীবনে আমার আবাহন কবে ঘটেছিল যে আজ বিসর্জন ঘটল? আমার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক প্রীতির—আজও তা অক্ষুণ্ণ আছে। কাজেই এ রকম কাব্যিক কথা লেখার অর্থ কি?

শ্যামল থতমত খেয়ে যায়। কোনও কথা বের হয় না তার মুখ দিয়ে।

মীরা বলে—আপনি যথারীতি আসবেন আমাদের এখানে। মিঃ মিশ্রকেও মীরা বলে একই কথা। শোভনা দেবীকে জড়িয়ে ধরে বলে—দিদি, আমাদের ভুলতে পাবে না কিন্তু। মাঝে মাঝে ছোটদের সঙ্গে করে আসবে আমার বাড়িতে। শোভনা দেবীর ছোট মেয়েটির মাথায় হাত দিয়ে আদর করে মীরা।

মীরার ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করে। আজ সে যে আচম্কা ফিল্ম ছেড়ে বিয়ে করে বসবে তা কল্পনা করেনি কেউ।

বিয়েবাড়ি থেকে ফেরবার পথে মিঃ মিশ্র বললেন—নাঃ, মেয়েটার এত বড় একটা প্রসপেক্ট নষ্ট হলো!

বাধা দিয়ে শোভনা দেবী বললেন—ঠিক তার উল্টো। সত্যিই এতদিনে ওর মধ্যেকার চিরন্তনী নারী সার্থকতা খুঁজে পেল!

—তার মানে দেবব্রতকে ও ভালবাসতে পারবে বলে তুমি বিশ্বাস করো?

—নিশ্চয়ই!

—কিন্তু আমার ভয় হয়...

—তোমার ভরসা কোনদিনই হবে না! কেন, আমরা কি বিয়ে করে অধঃপাতে যাচ্ছি? এই সব আজকালকার মেয়েদের কি যে এক হুজুগ উঠেছে বিয়ে না করা! এতে তারা সারা জীবন কষ্ট পাবে!

—কেন? নিজে উপার্জন করে কি আনন্দ পাওয়া যায় না?

—নিশ্চয়ই না! বিয়ে করে একজনকে না ভালবেসে দশজনকে ভালবেসে বেড়ানটাকে কি তুমি ভাল মনে কর? এতে বিলাস বেড়ে যায়—টাকা সবই যায় খরচ হয়ে। শুধু শুধু শেষ জীবনে তারা কষ্ট পায়।

শোভনা দেবীর কথার ওপর আর কোনও কথা বলতে পারেন না মিঃ মিশ্র। তাঁর শুধু বার বার মনে হয়, বিয়ে করে মীরা বোধ হয় ভুল করল!

পাঁচ

প্রাসাদতুল্য মায়া-মঞ্জিল।

যেন গর্বোদ্ধত হিমালয়ের মতোই আপনার বিরাটত্বের মাঝে পৃথিবীর সব কিছুকেই অবজ্ঞা করতে উদ্যত।

তারই কোন্ এক গোপন কক্ষে কি ভাবে যে মীরার জীবনের পুরো তিনটি বছর এবং নয়টি মাস কেটে গেল তার বিবরণ না দিলেও আমার গল্পের কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না।

আমার গল্প সুরু হবে নতুন এক অধ্যায়ে এসে নতুন কতকগুলো ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়ে।

বিয়ের পর পুরো তিন বছর ন' মাস মায়া-মঞ্জিলেই কাটিয়েছে মীরা। তাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসত দেবব্রত। বিয়ের পর তার সৌন্দর্য প্রচুর যত্ন আর অন্তহীন অবকাশে যেন বহুগুণে বেড়ে গেছে। যে কেউ মীরার দিকে তাকালে মুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু বলবে···সত্যই মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। সে যেন নিপুণ শিল্পীর কল্পনায় গড়া মানস-প্রতিমা।

মায়া-মঞ্জিলে আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা কম নয়। দেবব্রতের দূরসম্পর্কীয় এক কাকা, মামাতো ভাই, খুড়তুতো ভাই, দূরসম্পর্কের এক ভাইপো আর দুই ভাগে —সবশুদ্ধ ছয় সাতজন আত্মীয়। কিন্তু তাদের কেউ মীরার ব্যবহারে এতটুকুও অসন্তুষ্ট নয়। বরং কি একটা অজ্ঞাত কারণে মীরা তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার করে যে তারা যথেষ্ট খুশী।

খুশী নয় কেবল একজন। সে হচ্ছে দেবব্রতের এক খুড়তুতো বোন—তার নাম সুচিত্রা।

মীরার বিয়ে হয়েছিল যদিও দেবব্রতের সঙ্গে, তবু সে মাঝে মাঝে শ্যামলের সঙ্গে মিশত। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে কিছুটা ঘুরে বেড়াতেও দেখা যেত তাকে। দেবব্রত কিংবা বাড়ির অন্য কোনও আত্মীয় অবশ্য তাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেনি, কিন্তু সব সময় বিরক্তিপূর্ণ স্বরে এর প্রতিবাদ করত সুচিত্রা।

সুচিত্রার এই আপত্তিকে কেউ গ্রাহ্য করত না।

অল্পবয়সেই সে বিধবা হয়েছিল। কাজেই এটাকে সকলে তার অপ্রকৃতিস্থ মনের খামখেয়াল বলেই ধরে নিত।

কিন্তু মীরা শুধু বিরক্ত হতো সুচিত্রার ব্যবহারে। কোনও আত্মীয় যে তার কোনও কাজে এতটুকুও অসন্তুষ্ট হয়, এটা সে মোটেই চাইত না। কিন্তু অন্য সব

আত্মীয়েরা সন্তুষ্ট থাকলেও সুচিত্রার মনের মধ্যে রয়েছে কেমন একটা বিশ্রী complex—যেটাকে মীরা সব সময়ই ঘৃণা করত।

এমনিভাবে প্রকৃতির আবর্তনে, তিনটি বছর আর আটটি মাস কেটে গেল দেখতে দেখতে। ইতিমধ্যে বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি।

শুধুমাত্র দেবব্রতের মা মারা গেছেন ওদের বিয়ের মাস পাঁচ-ছয় পরেই। তারপর এই সাবলীল তিনটি বছর ও আটটি মাসের অতিক্রমণের পর এমন একটা ঘটনা ঘটল, যা শুধু অভাবনীয়ই নয়—কেমন যেন বিচিত্র।

দেবব্রতের ছিল কিছুটা পেটের গোলমাল। অনেকটা 'অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি' টাইপের।

মাঝে মাঝেই সে পেটের জন্যে কষ্ট পেত। শুধু নিজে কষ্ট পেত তাই নয়, বাড়ির সকলকেই সে অস্থির করে তুলত। আবার পাঁচ ছ দিন পরে আপনা থেকেই পেট ভাল হয়ে যায় তার।

সেবারেও তাই পেটের সামান্য গোলমালটাকে কেউ বড় একটা আমল দেয়নি। যথারীতি ডাক্তার ডাকা হলো। তিনি একটা ওষুধ লিখে দিয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু সেদিন বিকেল থেকে পেটের যন্ত্রণা এবং অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল। ডাক্তার এসে সব দেখে স্যালাইন্ ইন্জেকশন দিলেন। কিন্তু তবুও রোগের উপশম হলো না।

অতিরিক্ত পারজিংএর জন্যে তার শরীর দুর্বল হয়ে আসছিল। ডাক্তার পর পর দুটো ইন্জেকশন দিলেন, 'কোরামিন' আর 'অ্যাট্রোপিন'। কিন্তু তবুও তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না। অবশেষে সন্ধ্যার কাছাকাছি হার্ট ফেল করে মারা গেল দেবব্রত।

ডাক্তার পরীক্ষা করে ডেথ সার্টিফিকেট দিলেন—'death due to purging and dehydration'.

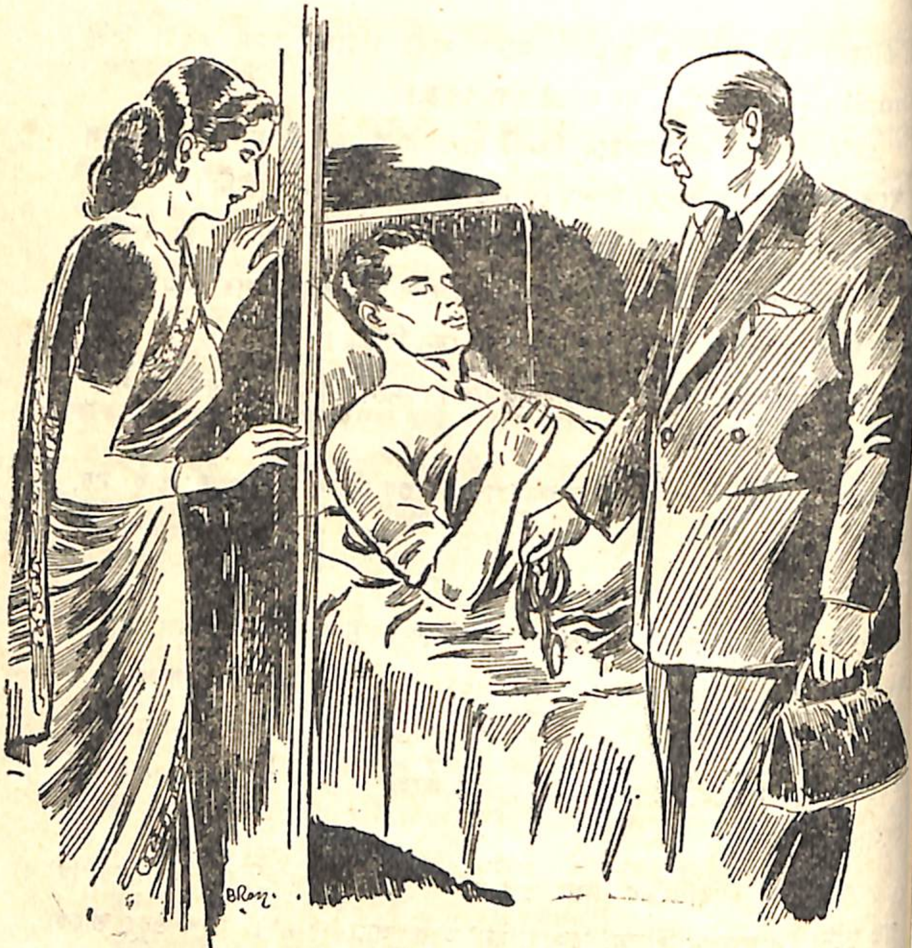

ডাক্তার পরীক্ষা করে ডেথ সার্টিফিকেট দিলেন। (পৃষ্ঠা ৩৫)

দেবব্রতের মৃত্যু মীরার কাছে সম্পূর্ণ আকস্মিক। আকস্মিক সকলের কাছেই। বাড়ি জুড়ে কান্নার রোল পড়ে গেল।

সেই দিনই রাত দশটা নাগাদ মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলো।

কিন্তু সেখানে ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা।

হঠাৎ এক লরী বোঝাই পুলিশ এসে শ্মশানে মৃতদেহ আটক করল। আত্মীয়েরা সকলে প্রশ্ন করল, এভাবে মৃতদেহ আটক করবার অর্থ কি?

তার উত্তরে পুলিশের বড়বাবু জানান, মৃতদেহ এখন নিয়ে যাওয়া হবে। পোস্ট মর্টেমের আগে আর মৃতদেহ পোড়াবার হুকুম দেওয়া যাবে না।

মীরা তীব্রভাবে আপত্তি জানাল। আত্মীয়েরাও আপত্তি জানাল। কিন্তু পুলিশের বড়বাবু অনড়।

তিনি বললেন—পুলিশ বিভাগের সন্দেহ যখন একবার পড়েছে, তখন যতক্ষণ সন্দেহ থেকে তারা মুক্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ মৃতদেহ পোড়াবার অনুমতি দেওয়া অসম্ভব। তিনি আরও জানালেন, লালবাজারের ঠিকানায় একটা অনামী পত্রলেখকের লেখা চিঠি গেছে। তাতে লেখা ছিল যে, দেবব্রতবাবুর মৃতদেহ যেন পোস্ট মর্টেম করা হয়। অজ্ঞাত পত্রলেখকের ধারণা এই যে এই মৃত্যু সাধারণভাবে হয়নি। এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়—দেবব্রতবাবুকে হত্যা করা হয়েছে।

এ কথা শুনে সকলেই বিস্মিত হলো। তারা বলল, নিশ্চয়ই তাদের পরিবারের কোনও শত্রু এমন কাজ করেছে। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একটা কথা। এমন কি ডাক্তারের সার্টিফিকেটও পুলিশকে দেখান হলো।

পুলিশের বড়বাবু বললেন—অনেক সময় বিষের ক্রিয়াতেও purging এবং dehydrationএ মৃত্যু ঘটতে পারে। এবং তিনি সন্দেহ করেন এটা তেমনই একটা কেস।

এর ওপর আর কথা চলে না। বাধ্য হয়েই মৃতদেহ ছেড়ে দিতে হলো

পোস্ট মর্টেমের জন্যে। কিন্তু এমন একটা আকস্মিক ঘটনা সকলকেই যথেষ্ট দুঃখি ও মনঃক্ষুণ্ণ করে তুলল।

মৃতদেহ লরীতে তুলে নিয়ে পুলিশবাহিনী প্রস্থান করল। ওরা সকলে ফি এলো বাড়িতে।

একে মনের দুঃখ, তার ওপর এত বড় একটা আঘাত। সেদিন সারা রা মীরার উপবাসেই কাটল। অন্যান্য আত্মীয়স্বজন অনেক অনুনয়বিনয় করেও তা কিছু খাওয়াতে পারল না।

পরদিন সকালে যথারীতি সে উঠে বসল। শ্যামলও এসেছিল মীরার এ দুঃখে সমবেদনা জানাতে। মীরা হঠাৎ দুপুরেই শ্যামলের সঙ্গে গেল লালবাজা পুলিশ স্টেশনে এই কেসের বিষয়ে দেখা করতে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে সে যা শুনল তা আরও বিচিত্র। দেবব্রতের larg intestine আর kidneyতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। এটা হচ্ছে ডেথ ডি টু chronic arsenic poisoning—আর্সেনিক অল্প অল্প ডোজে দীর্ঘদিন ধ খাইয়ে দেবব্রতকে হত্যা করা হয়েছে।

মীরা আবার বাড়িতে ফিরে এসে শয্যা নিল।

ছয়

দেবব্রতের কেসটির তদন্তের ভার পড়েছিল ইন্‌স্পেক্টর গুপ্তের ওপর।

সেদিন সকালে মিঃ গুপ্ত হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর বাড়িতে।

দীপক ঠিক সে সময় মিঃ গুপ্তকে আশা করেনি। কারণ সম্প্রতি শহরের বুকে এমন কোনও মারাত্মক ঘটনা ঘটেনি যার জন্যে দীপকের মত গোয়েন্দার কাছে ছুটে আসা প্রয়োজন।

—গুড্ মরণিং মিঃ গুপ্ত!

—গুড্ মরণিং!

—তারপর, হঠাৎ কি ব্যাপার?

—কেসটা খুব জরুরী। কিন্তু ব্যাপারটা একটু গোপন রাখতে হবে। মানে এটা হচ্ছে একটা ফ্যামিলির সিক্রেট অ্যাফেয়ার…

—বেশ, কথা দিচ্ছি।

—শুনুন। দেবব্রতবাবুর নাম শুনেছেন?

—না।

—যার সঙ্গে সেই অভিনেত্রী মীরা ব্যানার্জীর বিয়ে হয়েছিল! সেই খিদিরপুরের মায়া-মঞ্জিলের মালিক!

—বুঝেছি। তা হঠাৎ কি প্রয়োজনে তাঁর ব্যাপারে আমার কাছে…

—একটু ধৈর্য ধরুন, ব্যক্ত করছি।

—বেশ, ধরলাম ধৈর্য! দয়া করে এবার ব্যক্ত করুন।

—দেবব্রতবাবু হঠাৎ মারা গেছেন।

—সে ত ভাল কথা। একটা শ্রাদ্ধের ভোজ…

—তা নয় মিঃ চ্যাটার্জী! পুলিশের ধারণা এ মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।

—তবেই ত ফ্যাসাদ। কি ধরনের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে?

—'Slow arsenic poison' দিয়ে ওঁকে মেরে ফেলা হয়েছে।

—তাই নাকি! কিন্তু আত্মীয়দের কেউ না হলে ত এভাবে chronic arsenic poison দিতে পারবে না।

—আত্মীয়েরা কেউ নিশ্চয়ই ছিল এর ভেতর!

—কে?

—তা কি করে জানব! সেই জন্যেই ত এলাম আপনার কাছে। আপনি হলেন অধমতারণ...

—বাঃ, বেশ নামটা দিয়েছেন ত! Thanks for your compliments মিঃ গুপ্ত! কিন্তু শুধু আমি গিয়েই ত কেসটা solve করতে পারব না। যাক, মৃতদেহের আশেপাশে কোনও ক্লু পেয়েছেন?

—কি ক্লু পাব বলুন? সকলে ত এটাকে স্বাভাবিক death বলেই ধরে নিয়েছিল। মৃতদেহ শ্মশানেও গেছিল। এমন সময় পুলিশের সন্দেহ হলো বলেই ব্যাপারটা এ রকম দাঁড়াল।

—কিন্তু পুলিশ হঠাৎ সন্দেহ করল কেন? দীপক প্রশ্ন করে।

—পুলিশ হয়ত সন্দেহ করত না। কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে এল একটা বেনামী চিঠি। পুলিশকে অনামী পত্রলেখক জানাচ্ছে যে দেবব্রতবাবুর মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। বিষপ্রয়োগের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

—তারপর?

—তারপর আমরা বাধ্য হই শ্মশান থেকে মৃতদেহটা নিয়ে এসে সেটা পোস্ট-মর্টেম করতে। আর তাতেই মৃত ব্যক্তির large intestine এবং kidneyতে বিষ পাওয়া যায়।

মৃদু হেসে দীপক প্রশ্ন করে—সেই পত্রপ্রেরক কে তা জানতে পেরেছেন কি?

—না। তা ছাড়া সে চেষ্টাও করিনি আমরা। তার কথা যখন সত্যি বলে প্রমাণিত হলো তখন আমরা কেসটা ইন্‌ভেস্টিগেট করে দেখতে চাই। আমার মনে হয় আপনার সাহায্য পেলে অল্পদিনের মধ্যে সফল হব আমরা।

দীপক একটু চিন্তা করে। তারপর মুখ তুলে মিঃ গুপ্তের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—আচ্ছা, দেবব্রতবাবুর কি কোনও সন্তানাদি আছে?

—না। মিঃ গুপ্ত বলেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী সন্তান প্রসবের সময় মারা যান। সে সন্তানও বেঁচে নেই। আর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মীরা দেবীর কোন সন্তানাদি হয়নি।

দীপক বলে—দেবব্রতবাবুর মৃত্যুর পর তা হলে ওঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে কে?

—সেটা ঠিক জানি না। উনি মৃত্যুর আগে একটা উইল করে গেছেন বলে জানি।

—সেটা কোথায় আছে?

—শুনেছি ওঁর অ্যাটর্ণী দত্ত চ্যাটার্জী কোম্পানীর অফিসে সেটা আছে। আপনি ইচ্ছা করলে সেটা দেখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

—ওঁদের অফিসটা কোথায়?

— বোধ হয় ধর্মতলা স্ট্রীটে।

—বেশ, চলুন তা হলে সব আগে সেখানে গিয়েই হানা দেওয়া যাক। ইন্‌ভেস্টিগেশন শুরু করবার আগে আমি দেখতে চাই সেই উইলখানা।

একটু থেমে মিঃ গুপ্ত বলেন—আপনি কি মনে করেন দীপকবাবু যে ওঁর আত্মীয়দের কেউ সম্পত্তির লোভে ওঁকে হত্যা করেছে?

—ঠিক কিছু মনে করি না বটে, তবে সেটাও ত অসম্ভব নয়! তাই সব কিছু information আগে থেকেই জানতে চাই আমি।

—বেশ, তবে চলুন ওঠা যাক। ধর্মতলা স্ট্রীটে দত্ত চ্যাটার্জী কোম্পানীর অফিসে গিয়ে খোঁজটা নিয়ে আমরা যাব দেবব্রতবাবুর বাড়িতে।

দীপক একটু চিন্তা করে বলে—যাক, আশা করছি আজ মায়া-মঞ্জিলের স্বপ্ন-তোরণ বেয়ে নতুন কোনও অকথিত ইতিহাস হয়ত আবিষ্কৃত হবে!

মিঃ গুপ্ত দীপকের কথা শুনে মৃদু হাসেন। তারপর বলেন—সত্যিই আমি ভাবতে পারছি না মিঃ চ্যাটার্জী, এ কেসটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে এবং কে সেই অজ্ঞাত খুনী যে এমন একজন দেবতুল্য লোককে বিনা দ্বিধায় হত্যা করল!

দীপক এ কথার কোনও উত্তর দেয় না।

দুজনে উঠে দাঁড়ায়।

সাত

দত্ত চ্যাটার্জী কোম্পানীর অফিস হচ্ছে আটাশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটের তিনতলায়। একতলা আর দোতলায় অনেকগুলো ছোট ছোট অফিস। নানা ধরনের টুকরো টুকরো সব সাইনবোর্ড। সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় গিয়ে পাওয়া গেল ওঁদের অফিসটা। সারা তিনতলা জুড়ে দত্ত চ্যাটার্জী কোম্পানীর অফিস।

মিঃ চ্যাটার্জী ছিলেন না। অর্ধাংশের পার্টনার মিঃ দত্তর সঙ্গে দেখা করল ওরা। তিনি বললেন—কি ব্যাপারে আপনারা দেখা করতে এসেছেন জানলে বাধিত হব।

দীপক বলল—আমরা পুলিশ অফিস থেকে আসছি। ইনি ইন্‌স্পেক্টর গুপ্ত আর আমার নাম দীপক চ্যাটার্জী।

—নমস্কার। আপনাদের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে জানান। We will try our best to help you.

—দেখুন, সম্প্রতি খিদিরপুরের দেবব্রতবাবুর হত্যাব্যাপারের তদন্তভারটা এসে পড়েছে আমাদের ওপর।

—তাই নাকি? কিন্তু তাঁর dead bodyটা হঠাৎ পুলিশ সন্দেহ করে নিয়ে যায় বলে শুনেছি। ব্যাপারটা কি তা অবশ্য জানি না।

—দেখুন, পুলিশ আবিষ্কার করেছে, it was a clear case of murder—ধীরে ধীরে স্লো আর্সেনিক পয়জনিং করে দেবব্রতবাবুকে হত্যা করা হয়েছে।

—আশ্চর্য! এটা আমার ধারণার বাইরে মিঃ চ্যাটার্জী।

—তা ছাড়া আরও একটা কথা। আমাদের ধারণা ওঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেউ এই খুনের জন্যে দায়ী। তাই আমরা আপনার শরণাপন্ন হয়েছি বিশেষ কারণে বাধ্য হয়েই। আমরা চাই ওঁর উইলের বিষয়ে জানতে। তা থেকে আমাদের ডিডাক্‌শনে সুবিধা হবে।

—বেশ, আমি দেবব্রতবাবুর উইল আপনাদের শোনাচ্ছি। যদি অসুবিধা না হয় একটু বসতে হবে আপনাদের। তাতে আপত্তি নেই ত?

—না না, আপত্তি কিসের! আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছি।

—ধন্যবাদ।

মিঃ দত্ত ভেতরে প্রবেশ করেন। বেরিয়ে আসেন মিনিট পনর কুড়ি পরে।

—এই যে দেখুন, এটাই দেবব্রতবাবুর উইল। The last deed of gift executed by him···

—পড়ুন ত ওটা।

—হ্যাঁ শুনুন, উইলে উনি ওঁর সম্পত্তি চার ভাগে ভাগ করেছেন। তার সিকি অংশের মালিক হচ্ছে ভাগ্নে সুবিমল আর ভাগ্নী সুচিত্রা, সিকি অংশ পাবেন ওঁর স্ত্রী মীরা দেবী, সিকি অংশ অন্যান্য আত্মীয়েরা—মানে ওঁর কাকা, ভাইপো, দূরসম্পর্কের মামাতো ভাই, মাসতুতো ভাই ইত্যাদি। অবশিষ্ট যে সিকি অংশ থাকছে তা উনি ওঁর ফিল্ম কোম্পানীর নামে দান করেছেন। সেই টাকাটা ঠিকমত খরচ হচ্ছে কিনা তা দেখবার ভার উনি দিয়ে গেছেন দত্ত চ্যাটার্জী কোম্পানীকে।

দীপক মৃদু হেসে বলে—তার মানে আপনাদের হাতে এসে পড়েছে মাত্র সিকি অংশ?

মিঃ দত্ত বাধা দেন। বলেন—আমাদের হাতে বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন মিঃ চ্যাটার্জী? আমাদের অধিকার নেই তা থেকে একটা পয়সাও

খরচ করি। এই ফিল্ম কোম্পানী হচ্ছে ওঁর আগের স্ত্রীর নামে—মায়া আর্ট প্রোডাকসন্স। উনি চাইতেন ওঁর স্ত্রীর নামকে চিরদিন অমর করে রাখতে। তাই যাতে ওই ফিল্ম কোম্পানী lossএর সম্মুখীন না হয় সেই উদ্দেশ্যেই উনি সিকি সম্পত্তি ওঁদের দিয়ে গেছেন—আর আমরা সুপারভাইজ করব যাতে সেই টাকা অনর্থক কোনও বাজে কাজে অপব্যয় না হয়।

দীপক বলল—আচ্ছা আপনি কি ওঁদের বাড়িতে কখনও গেছেন মিঃ দত্ত?

—একবার নয় অনেকবার গেছি।

—কারণ?

—কারণ দেবব্রতবাবু শুধু আমার ক্লায়েন্ট ছিলেন না, উনি ছিলেন আমার অকৃত্রিম বন্ধুস্থানীয়।

—বুঝলাম। আপনাকে কি উনি বিশ্বাস করতেন খুব বেশি?

—নিশ্চয়ই। ওঁর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে উনি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন আমাকে।

—সেটা ওঁর উইল থেকেই বুঝতে পারছি। যাক, আপনি কি জানেন উনি হঠাৎ এত বেশি বয়সে আবার বিয়ে করলেন কেন?

—যা ভাবছেন তা ঠিক নয় মিঃ চ্যাটার্জী। বিয়ে উনি স্বেচ্ছায় করেননি। মীরা দেবীই ওঁর কাছে প্রপোজ করেছিলেন।

—সে কি কথা? আধুনিক যুগের একজন স্টাইলিশ অভিনেত্রী হঠাৎ ওঁর মতো একজন বয়স্ক ভদ্রলোকের কাছে propose করে বসলেন?

—তাই ত শুনেছি।

—কিন্তু কেন?

—পৃথিবীর অনেক অজ্ঞাত প্রশ্নের মতো এ প্রশ্নটার উত্তরও জানা নেই

আমার। তবে মনে হয় মীরা দেবী আর দেবব্রতবাবু বহুদিন আগে একসঙ্গে শান্তিনিকেতনে পড়তেন। সেই সূত্রেই হয়ত কোনও গোপন অন্তরঙ্গতা বা ভালবাসা···

—বুঝেছি। দীপক বলে—I like to go deeper in the matter মিঃ দত্ত। আচ্ছা, চলি। গুড্‌বাই।

মিঃ দত্তর অফিস থেকে বিদায় নিয়ে দীপক আর মিঃ গুপ্ত নিচে নেমে এসে গাড়িতে চড়ে বসে।

মিঃ গুপ্ত ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বলেন—খিদিরপুর।

আট

আবার মায়া-মঞ্জিল।

খিদিরপুরের সেই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সামনে গাড়ি এসে থামে।

গাড়ি থেকে নামে দীপক ও মিঃ গুপ্ত।

মিঃ গুপ্তকে এ সময়ে এখানে আশা করেনি কেউ। সকলেই তাঁকে দেখে অবাক হয়ে যায়।

একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেন—কাকে চান?

মিঃ গুপ্ত বলেন—আমি আসছি দেবব্রতবাবুর হত্যার ব্যাপারে তদন্ত করতে।

—ও, নমস্কার।

—নমস্কার। আপনার নাম?

—সুবিমল···

—ও, আপনিই বোধ হয় দেবব্রতবাবুর ভাগ্নে?

—হ্যাঁ।

—ধন্যবাদ।

—আপনাদের সাহায্য করতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত স্যর, সুবিমল বলে। মামার আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে যে কতোটা শক্ আমরা পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

—আপনারা কি আপনার মামার উইলের বিষয়ে অবগত আছেন?

—হ্যাঁ, শুনেছি তিনি মৃত্যুর আগে একখানা উইল করে গেছেন। তবে সে উইল অনুযায়ী কে কতোটা সম্পত্তি পাবে তা আমাদের জানা নেই।

—বুঝলাম। আমরা কিন্তু আপনার মামার অ্যাটর্ণী অফিস থেকে উইলের বিষয়ে সবটুকু অবগত হয়েছি।

—তাঁর উইলে কি আছে?

দীপক বলে—সব কথাই জানাব আপনাদের। কিন্তু তার আগে আমরা আপনাদের বাড়ির প্রত্যেককে কয়েকটি করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই।

—বেশ, তাতে আপত্তি নেই আমাদের।

—আপনারা নিশ্চয়ই চান যে আপনার মামার হত্যাকারী ধরা পড়ুক!

—নিশ্চয়ই!

—আর সে বিষয়টা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনাদের সহযোগিতার ওপর।

—তা জানি। কিন্তু আপনাদের কি ধারণা আমাদের মধ্যেই কেউ মামার হত্যার জন্যে দায়ী?

—নিশ্চয়ই! দীপক বলে—যতক্ষণ তার উল্টো প্রমাণ না পাচ্ছি, ততক্ষণ সেটাই বিশ্বাস করব। কারণ পরিবারের মধ্যকার কোনও লোক ছাড়া এভাবে স্লো পয়জনিং করা কি করে সম্ভব?

—কিন্তু আপনাদের অনুমতি দেবার আগে মামীমার মতামতটা একবার নেওয়া উচিত।

—বেশ, আপনি বরং জিজ্ঞাসা করে আসুন। আমরা এখানেই অপেক্ষা করছি।

সুবিমল ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তার মামীমার কাছে জিজ্ঞাসা করবার জন্যে।

দীপক মিঃ গুপ্তের দিকে চেয়ে বলে—খুব সহজে সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না মিঃ গুপ্ত। সকলেই এখানে লুকোচুরি খেলবার জন্যে ব্যগ্র বলে মনে হচ্ছে। কাজেই সত্যি কথা অতটা সহজে বের করা যাবে বলে মনে হয় না।

—কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও পথও ত খোলা নেই আমাদের!

—তা ত আমিও স্বীকার করছি। কিন্তু এতগুলো আত্মীয় যেখানে জড়িত সেখানে সত্যিকারের ক্লুর সন্ধান চট্ করে পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা হয় না। আর এঁরা কেউই স্বীকার করবেন না আসল সত্যি কথাটা।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সুবিমল। বলে—আসুন দীপকবাবু। মামীমা বললেন, আপনারা যদি খুব বেশি বিরক্ত না করে সকলকে কিছু কিছু প্রশ্ন করে বিদায় নিতে চান, তাতে ওঁর আপত্তি নেই। সকলেই এখন শোকার্ত। কাজেই কাউকেই খুব বেশি বিরক্ত করা উনি পছন্দ করেন না।

—বেশ, সেইমতই কাজ হবে সুবিমলবাবু। আমরা যে ঘরে দেবব্রতবাবু মৃত্যুর আগে থাকতেন সেটা একবার ভাল করে দেখতে চাই। তারপর একটা জায়গায় বসে একে একে সকলকেই কয়েকটা করে প্রশ্ন করে চলে যাব।

সুবিমল মৃদুকণ্ঠে বলে—বেশ, আসুন আমার সঙ্গে।

* * * *

দেবব্রতবাবুর ঘরখানা খুব ভাল করে সার্চ করেও এমন কোনও কিছু পাওয়া গেল না যা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, কিভাবে বিষটা তাঁর ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে।

তারপর সুরু হলো প্রশ্নোত্তরের পালা। দীপক ওদের সকলকে একে একে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। সকলেই দেবব্রতবাবুর আত্মীয়। বাইরের মধ্যে ছিল একমাত্র শ্যামল। শ্যামল এদের বাড়ীতে ইতিমধ্যে এসে গিয়েছিল মীরার সঙ্গে দেখা করতে। মীরার শোকে সান্ত্বনা দিতে। দীপক শ্যামলকেও কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল সেই সঙ্গে।

আমরা ওদের বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর একে একে এখানে তুলে ধরছি। ওদের কথাবার্তা থেকে দীপক যে সমাধানে পৌছবার চেষ্টা করল, আপনিও হয়ত চেষ্টা করলে সে সমাধানের দিকে পৌছতে পারেন।

আপনি যদি সে সব প্রশ্নোত্তর থেকে সমাধান করতে পারেন প্রকৃত অপরাধী কে, তা হলে বোঝা যাবে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি আপনারও আছে।

নয়

সবার প্রথমে এলেন দেবব্রতবাবুর কাকা ব্রজবিলাসবাবু। দীপক তাঁকে যে যে প্রশ্ন করল আর তিনি যা যা উত্তর দিলেন সেই থেকেই তদন্তচক্র সুরু হচ্ছে।

ব্রজবিলাসবাবু প্রৌঢ়। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। একটা চোখে একটু কম দেখেন। ডাক্তারের মতে চোখে তাঁর ছানি পড়তে সুরু করছে।

কিন্তু ব্রজবিলাসবাবু তা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, ওটা ডাক্তারের ভুল ধারণা। চশমা নিলেই তিনি এই চোখেই দেখতে পাবেন। তবে অন্য চোখটিতে তিনি বেশ ভালই দেখতে পান।

কাকা ব্রজবিলাস ঃ

—দেবব্রতবাবুকে আপনি কতদিন থেকে দেখে আসছেন ?

—চৌদ্দ পনর বছর।

—দেবব্রতবাবুর বাবা মারা যান কতদিন আগে ?

—আজ প্রায় পাঁচ ছ বছর হলো।

—ওঁর প্রকৃতি কি রকম ছিল ?

—সরল, মিশুকে প্রকৃতি ছিল ওর। তবে সবাইকেই বিশ্বাস করত খুব বেশী।

—দেবব্রতবাবুর বাবা কি রকম লোক ছিলেন ?

—একটু সেকেলে আমলের। দৃঢ়চেতা ও জেদী ছিলেন তিনি। যা ভাল বুঝতেন তাই করতেন।

—ওঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী ?

—খুবই সরল মেয়ে ছিল।

—তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে কি আপনার কোনও সন্দেহ হয় ?

—মোটেই না।

তাঁর মৃত্যু কি ভাবে ঘটেছিল ?

—জ্বর। ডাক্তার বলেছিল ডেলিভারীর পর নাড়িতে না কি সেপ্‌টিক্ হয়েছিল।

—আর তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলে ?

—মা মারা যাবার দিন কয়েক পরেই মারা যায়।

ফিল্ম লাইনে যে দেবব্রতবাবু টাকা ইন্‌ভেষ্ট করতেন, তাতে কি কারও আপত্তি ছিল ?

—মোটেই না।

—আপনার কি মত ?

—সেটাকে আমরা একটা ব্যবসা বলেই মনে করতাম।

—কিন্তু ফিল্ম লাইনের বিষয়ে ত অনেক কিছু বদনাম শোনা যায় সকলের মুখে।

—সে বিষয়ে আমাদের মতামত যথেষ্ট উদার ছিল।

—মীরা দেবীকে বিয়ে করার ব্যাপারে আপনারা কোনও আপত্তি করেননি।

—না।

—কেন ?

—ও যা ভাল বুঝবে তাই করবে। তাতে বাধার সৃষ্টি করা…

—কিন্তু উনি ছিলেন একজন অভিনেত্রী।

—তা জানতাম। কিন্তু সাধারণ আর পাঁচটা অভিনেত্রীর মতো অভিনয়টাই

ত ওর প্রফেশন ছিল না। তা ছাড়া ওর প্রকৃতি ছিল খুব ভাল। এখনও আমরা সকলে ওর ব্যবহারে মুগ্ধ। ও ছিল আর্টিষ্ট।

—উনি কি এখনও ছবি আঁকেন?

—নিশ্চয়ই।

—অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন?

—সম্পূর্ণ।

—দেবব্রতবাবু মৃত্যুর আগে যে উইল করেছেন সেটা কি জানা আছে আপনার?

—শুনেছি।

—তার মর্মার্থ জানেন?

—না।

—তিনি সব আত্মীয়কেই কিছু কিছু সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। তাই আত্মীয়দের মধ্যে যে কেউ সম্পত্তির লোভে ওঁকে হত্যা করতে পারে।

—কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না।

—কেন?

—আত্মীয়দের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে আমি মার্ডারার বলে ভাবতে পারি।

—আচ্ছা আর একটা কথা। আপনার কি ধারণা আছে কে ওঁকে হত্যা করতে পারেন? শুনুন, আত্মীয়েরা সকলেই যেমন ওঁর মৃত্যুতে লাভবান হবেন, তেমনি দত্ত চ্যাটার্জী কোম্পানীও কিছু লাভবান হবে। উনি সম্পত্তির সিকি অংশ ফিল্ম কোম্পানীকে দিয়ে গেছেন, আর তা দেখাশুনা করবে ওই কোম্পানী। কাজেই সবদিকে ভেবে উত্তর দেবেন আপনি।

—না, আমি আত্মীয়দের মধ্যে এমন কাউকেই দেখছি না যে ওর মৃত্যুর

কারণ হতে পারে। না, আমি এটা ভাবতেই পারি না। আর দত্ত চ্যাটার্জী কোম্পানী বাইরের লোক। তারা কি করে ওর মৃত্যুর কারণ হতে পারে?

—তা হলে আপনি কি মনে করেন?

—আমার কোনও সঠিক ধারণা এখনও গঠিত হয়নি। আশা করি এজন্য আপনারা কিছু মনে করবেন না।

—ধন্যবাদ। আপনাকে আর বিরক্ত করব না। এবার ওঁর বড় ভাগ্নে সুবিমলবাবুকে গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করব।

ব্রজবিলাসবাবু নমস্কার জানিয়ে উঠে দাঁড়ান।

বড় ভাগ্নে সুবিমল ঃ

—আপনার সঙ্গে যদিও ইতিপূর্বেই পরিচয় ঘটেছে, তবুও কয়েকটা কথা এখনও জিজ্ঞাসা করা বাকী আছে। দীপক সুরু করে।

—বলুন।

—আপনার মামার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারের সকলেই নিশ্চয়ই যথেষ্ট শোকান্বিত হয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, এমন কেউ ছিলেন, যাঁকে দেখে মনে হয়, তাঁর শোকটা ঠিক আন্তরিক নয়?

—এ আপনি কি বলছেন দীপকবাবু! প্রত্যেকেই গভীরভাবে শোকপ্রকাশ করেছিল।

—আচ্ছা, মীরা দেবীর সঙ্গে আপনার মামার প্রথম আলাপ হয় কোথায়?

—শুনেছি বহুদিন আগে শান্তিনিকেতনে।

—তারপর?

—তারপর মামাই প্রথমে ওঁকে বিয়ে করতে চান তখন। কিন্তু সে সময় তা

সম্ভব হয়নি। দাদামশাই ছিলেন একটু রাশভারী প্রকৃতির লোক। তাই তিনি মামার বিয়ে দিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রথম মামীমা অল্পদিন পরেই মারা যান। তার পরেই হয় এই দ্বিতীয় বিয়ে।

—আচ্ছা, দেবব্রতবাবুর মা তখন বেঁচে ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তিনি দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে কি মত দিয়েছিলেন?

—তিনি ছিলেন এর স্বপক্ষে। তিনি মামার বিয়ের ব্যাপারে উদ্গ্রীব ছিলেন। মামাও বিয়ে করছিলেন না। তাই যে মুহূর্তে মামা বিয়ে করতে রাজী হলেন, তখনই উনি মত দিলেন।

—মীরা দেবী হঠাৎ স্বেচ্ছায় ওঁকে বিয়ে করতে রাজী হলেন কেন?

—সেটা ঠিক বলতে পারব না। মামা জানতেন কিন্তু তিনি ত আর আজ বেঁচে নেই।

—আচ্ছা, মৃত্যুর কিছু আগে কোনও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কি ওঁর ঝগড়া বা মতানৈক্য হয়েছিল বলে আপনার জানা আছে?

—না।

—কোনও পারিবারিক দ্বন্দ্ব?

—ও, হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে। সুবিমল একটু চিন্তা করে বলে—মামার খুড়তুতো ভাইকে বোধ হয় চেনেন?

—তাঁর নাম?

—অমর।

—হ্যাঁ, বলে যান আপনি।

—ওঁর সঙ্গে মামার সামান্য কারণে খানিকটা মতানৈক্য হয়েছিল বলে জানি।

—কি ব্যাপার নিয়ে?

—ওঁর ছিল রেস খেলার সখ। রেসে উনি বেশ কিছু টাকা লোকসান করেন। শেষে সেই লোকসানটা পুষিয়ে নেবার জন্যে উনি আবার খেলতে চান। আর সেই জন্যেই কিছু টাকা চান মামার কাছে। মামা শুনে অত্যন্ত রেগে যান। এসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুব strict…

—তারপর?

—তারপর উনি মামাকে শাসিয়ে যান যে, তিনি টাকা পেলে মামাকে একবার দেখে নেবেন।

—এই ব্যাপারটা ঘটেছিল কতদিন আগে?

—তা প্রায় মাসখানেক হবে।

—আচ্ছা। আপনাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করব না। দয়া করে অমরবাবুকে একটু পাঠিয়ে দিন!

সুবিমল নমস্কার জানিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

দশ

সুবিমল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে মিঃ গুপ্ত দীপকের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন—এঁকে কি রকম মনে হলো?

—মন্দ না। সিগারেটে মৃদু টান দিয়ে বলল দীপক—মনে হয় ওঁর কথার মধ্য দিয়ে একটা ক্লু আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ইনি আর যাই হোন, বিশেষ মিথ্যা কিছু বলেন বলে মনে হয় না আমার।

—মিথ্যা বলেন এ কথা আমি বলছি না। কিন্তু ক্লুটা যে sure এমন কথা বলতে পারি না আমি।

—দেখা যাক।

একটু পরেই দেবব্রতের খুড়তুতো ভাই অমর এসে নমস্কার জানায় ওদের। সামনের চেয়ারে তাকে বসতে বলে দীপক বলে—যদি কোনও কথা আপনার অপ্রিয় শোনায় তবুও কিছু মনে করবেন না যেন!

—কিছুমাত্র না। আপনার কথা স্বরু করুন।

খুড়তুতো ভাই অমর ঃ

—কতদিন আপনি এ বাড়ীতে আছেন?

—আজ প্রায় দশ বছর হলো। জ্যেঠামশায়ের আমল থেকেই আমি এখানে আছি।

—আপনার বাবা কি বেঁচে আছেন?

—না। তাঁর মৃত্যুর পরেই জ্যেঠামশাই আমাকে এখানে এনে রাখেন। তিনি নিজের ছেলের থেকে আমাকে কম ভালবাসতেন না।

—দেবব্রতবাবুকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে পারেন, এমন কি কেউ আছেন আত্মীয়দের মধ্যে?

— মনে হয় না।

আচ্ছা, দেবব্রতবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন আগে আপনার সঙ্গে ওঁর কথায় কথায় কিছুটা তর্ক হয়েছিল।

—হ্যাঁ।

—আপনি কি ওঁকে ভয় দেখিয়েছিলেন?

—ভয় দেখান বলতে আপনি কি mean করছেন? আপনি কি মনে করেন, সেই রাগের বশেই আমি তাঁকে হত্যা করেছি?

—যদি তাই হয়?

—তা হলে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আপনার অনুমান ভুল। কারণ ওঁকে বিষ

দেবার অবকাশ আমার কোত্থেকে আসবে বলুন? আমি নিশ্চয়ই ওঁর সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার স্বযোগ পাইনি। সবসময়েই ওঁর সঙ্গে থাকতেন ওঁর স্ত্রী। তার মধ্যে হঠাৎ যদি আমাকেই আপনি…

—চাকরদের সঙ্গে গোপন চক্রান্ত করেও তা করা চলে অমরবাবু। দীপক তীক্ষ্ণস্বরে বলে—মনে করবেন না, আমাদের বুদ্ধি অতটা perplexed হয়ে গেছে! আমরা বুঝি কোন্‌টা সম্ভব আর কোন্‌টা নয়!

—দেখুন স্যর, আমি কিছু বলে আপনাদের ধারণা পাল্‌টে দেবার চেষ্টা করব না। অপরাধী চিরদিনই বলে থাকে যে সে নিরপরাধ। আমি তা বললেও মনে হবে যেন অত্যন্ত পুরোনো কথাই বলছি। তার চেয়ে আপনারা যদি তেমন প্রমাণ পান আমাকে arrest করবেন। আমি এর বেশি আর কিছু বলতে চাই না! আচ্ছা উঠি, নমস্কার।

আপন মনেই গট্‌ গট্‌ করে অমর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মিঃ গুপ্ত যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। দীপক মৃদু হেসে তাঁর হাতটা চেপে ধরে বলে—অতটা উত্তেজিত হবেন না। একটু পরেই আমার মতামত প্রকাশ করব। এখন স্ববিমলবাবুকে ডেকে বলুন, স্বচিত্রা দেবীর সঙ্গে একটু কথা বলব।

ভাগ্নী স্বচিত্রা ঃ

—আপনাকে খুব বেশি শোকার্ত বলে মনে হচ্ছে। দীপক স্বরু করে—তাই বেশিক্ষণ বিরক্ত করতে চাই না। গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করেই ছেড়ে দেব।

—বলুন।

—বোধ হয় শুনেছেন, আপনার মামা আকস্মিকভাবে বিষপ্রয়োগের ফলে মারা গেছেন?

—হ্যাঁ, শুনেছি। আমি জানতাম এমন একটা কিছু হবে…

—সেকি, কেন? আত্মীয়দের মধ্যে কাউকে আপনার সন্দেহ হয় নাকি?

আপন মনেই গট্ গট্ করে অমর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। (পৃষ্ঠা ৫৭)

—সন্দেহ সবাইকেই করা চলতে পারে। সে কথা বলে লাভ নেই। মামার মৃত্যু যে সাধারণভাবে হয়নি আমার তা আগেই ধারণা হয়েছিল। কিন্তু আমি তা অন্য কাউকে বলিনি, অন্য কেউ ও কথা বললে বিশ্বাস করত না!

—কি করে জানলেন তা?

আমার মন বলছিল।

—আপনি আপনার সমস্ত আত্মীয়দের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন?

—ধারণা কি করব বলুন! মামীমা ছবি আঁকা নিয়ে ব্যস্ত, অমর মামা ত মামার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করেই খালাস, একমাত্র স্থবিমলদা ছাড়া অন্য কেউ মামাকে মন দিয়ে ভালবাসতেন বলে মনে হয় না আমার!

—স্থবিমলবাবু কি আপনার আপন ভাই?

—হ্যাঁ, আপন দাদা। আর আমার ছোট ভাইয়ের নাম বিভাস। সেও এখানে থাকে।

—তার বয়স কতো?

—তের চৌদ্দ বছর হবে।

—আচ্ছা, আপনার মামীমা কি মামার সেবাশুশ্রূষা করতেন না?

—ঠিক যতটুকু করা উচিত ততটা করতেন না। ছবি আঁকা নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত থাকতেন। আর ছবি আঁকা ত ভারী! কতকগুলো সবুজ রঙের ছড়াছড়ি!

—আপনার মামীমার আঁকা কোন ছবি আছে না কি এখানে?

—কেন, দেখতে চান? ওই ত দেওয়ালে ঝুলানো ওই ছবিটা মামীমার আঁকা।

দীপক এতক্ষণে চোখ তুলে ছবিটা দেখল। একটু চিন্তা করে বলল—সত্যি এত বেশি সবুজ রঙের ছড়াছড়ি মারাত্মক। যে কোনও ছবি এতে খারাপ দেখায়! তবে ফিগারের দিকে ওঁর হাত ভাল।

মিঃ গুপ্ত কোনও কথা বলেন না। দীপক বলে—আচ্ছা, আপনার মামীমা কোথায় আছেন ?

—ভেতরের ঘরে ওঁর এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছেন।

—বন্ধু ?

হ্যাঁ, শ্যামলবাবু তাঁর নাম। তিনি বহুদিন থেকেই এ বাড়িতে নিয়মিত আসেন শান্তিনিকেতনে উনি মামীমার সঙ্গে পড়তেন।

—ওঁদের একবার এ ঘরে দয়া করে আসতে বলুন না। গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করেই ছেড়ে দেব। আমরাও আজকের মত বিদায় নেব।

—আচ্ছা, এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সুচিত্রা উঠে দাঁড়ায়।

মীরা দেবী ও শ্যামল ঃ

—আচ্ছা শ্যামলবাবু! দীপক সুরু করে,—শন্তিনিকেতনেই দেবব্রতবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছিল, তাই না ?

—হ্যাঁ। শ্যামল স্বীকার করে। কিন্তু আপনি কি করে তা জানলেন ?

—আপনি মীরা দেবীর সহপাঠী ছিলেন না ? কি করে জানলাম, সে কথা পরে।

—হ্যাঁ।

—আপনি ওঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন ? কিন্তু বিয়ে করেননি কেন ?

—বাবার অমতে।

—এখন আপনি বিবাহিত ?

—না।

—বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই আপনার ?

—না। কোনও দিনই আর বিয়ে করব না আমি।

—কেন ?

—সেটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন।

—আচ্ছা মীরা দেবী, আপনার স্বামীর উইলে কি আছে তা আপনি জানেন ?

—না।

—কিন্তু আপনি মিথ্যা বলছেন বলে মনে হচ্ছে আমার। আপনার চোখমুখ প্রমাণ করছে আপনি জানেন। একি, শ্যামলবাবুর দিকে তাকাচ্ছেন কেন ? আপনি নিজে থেকে বলুন···

—হ্যাঁ জানি। উনি একদিন বলেছিলেন যে···

—বুঝেছি। কিন্তু আপনি এতে আপত্তি করেননি ?

—তাঁর সম্পত্তিতে আমার আপত্তি কররার কি অধিকার আছে ?

—আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু ফল হয়নি। আপনি চেয়েছিলেন সবকিছু আপনিই পাবেন।

—তা হলে হয়ত এ দুর্ঘটনা ঘটত না ! নিশ্চয়ই কোনও আত্মীয়···

হো হো করে হেসে ওঠে দীপক। বলে—মিঃ গুপ্ত, চলুন এবার ওঠা যাক। আমার conclusionএ আমি পৌঁছে গেছি।

দুজনকেই অবাক করে দিয়ে দীপক আচম্‌কা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে।

বাইরে শোনা যায় চলমান মোটর ইঞ্জিনের শব্দ। ওদের প্রস্থান করবার সংকেত ঘোষিত হলো যেন।

এগারো

থানা।

মিঃ গুপ্ত দীপকের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন—এভাবে হঠাৎ উঠে এলেন কে মিঃ চ্যাটার্জী?

দীপক বলে—আমি উঠে এলাম এইজন্যে যে, যে ক্লুর সন্ধানে আমি মাঝ মঞ্জিলে পা দিয়েছিলাম তা পেয়ে গেছি। দি মিসট্রি ইজ্ সল্ভ্ড্…

—তাই নাকি? দেন্ হু ইজ্ দি কাল্‌প্রিট্—আসল আসামী কে?

—মীরা দেবী।

—তার মানে?

সবুজ রঙের ছবি হচ্ছে ওঁর হত্যার গোপন সংকেত। আপনি বোধ হ জানেন না সবুজ রঙের মধ্যে থাকে আর্সেনিকের একটা insolubl compound—যা স্লো পয়জনিং-এর যথেষ্ট উপযোগী। উনি অত বেশি সবুজ র কেন ব্যবহার করেন সেটা চিন্তা করেই আমার problem-এর উত্তর পেয়ে গেলাম দেখুন পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট বলছে kidneyতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে—কি আর কোথাও তা পাওয়া যায়নি। তার অর্থ insoluble আর্সেনিক কম্পাউ ব্যবহার করা হয়েছিল।

—তা ত বুঝলাম।

—মীরা দেবীর সবুজ রং ব্যবহার, তাঁর স্বেচ্ছায় দেবব্রতকে বিয়ে করা শ্যামলের সঙ্গে গোপন ভালবাসা সব কিছু মিলিয়ে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম।

এখন আমি কি করব?

—আজ রাতেই মীরা দেবীকে arrest করতে পারেন। উনিই প্রত্যেক-দিন খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে (সবুজ রঙের compound) তা প্রয়োগ করেছেন ওঁর স্বামীকে। আর উনি বিয়ে করেছিলেন স্বামীকে ভালবাসার জন্যে নয়—স্বামীর প্রচুর অর্থের লোভে।

—কিন্তু

—এর মধ্যে কোনও hesitation এর প্রয়োজন নেই মিঃ গুপ্ত। আম যা বললাম তার মধ্যে এতটুকুও ভুল নেই। আজকেই আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। আমার মনে হয় শ্যামল নামে ছেলেটা পেছন থেকে মীরা দেবীকে ইন্ধন জুগিয়েছে। বাবার অমতে সে তাকে বিয়ে করতে পারেনি—এখন মীরার প্রচুর ঐশ্বর্য পেলে সে বাবার অমতেও তাকে বিয়ে করতে পারবে।

—সত্যি বলতে কি ঘটনার এমন পরিণতি আমি কল্পনাও করিনি।

*　　*　　*　　*

সেদিন রাত সাড়ে নটা।

দীপকের টেলিফোনটা ঘন ঘন বেজে উঠল।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে সে প্রশ্ন করে—Hallo…

—মিঃ গুপ্ত কথা বলছি…

—কি ব্যাপার?

—মীরা দেবী আত্মহত্যা করেছেন!

—কেন?

আমরা তাঁকে arrest করতে গেছি এই সংবাদ পেয়েই তিনি দরজা বন্ধ করে দেন। তারপর সকলে মিলে ভেঙে দরজা খুলে ফেলি।

—উনি কি বুঝেছিলেন আপনারা ওঁকেই arrest করতে গেছেন?

—হ্যাঁ।

—তারপর ?

—উনি আর্সেনিক, মানে সবুজ রং প্রচুর পরিমাণে খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

—এটা আমি জানতাম।

—আমাদের আগে সাবধান করে দেননি কেন ?

—এই ধরনের সমাপ্তিই চেয়েছিলাম আমি। ভদ্রমহিলাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাইনি আমি।

—আর একটা খবর আছে।

—বলুন।

—অনামী চিঠির প্রেরক হচ্ছে...

—বলতে হবে না মিঃ গুপ্ত, আমিই বলছি। সুচিত্রা দেবীই পুলিশকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, এই ত ?

—হ্যাঁ।

—যিনি স্বীকার করেছেন ?

—আজ মীরা দেবীর আত্মহত্যার পর স্বীকার করেছেন তিনি।

—আচ্ছা তা হলে রিসিভারটা এখন নামিয়ে রাখি। কি বলেন ?

—নিশ্চয়ই !

—আপনার অসাফল্যে আমি কিন্তু আনন্দিত।

দীপক রিসিভারটা নামিয়ে রাখে।*

—শেষ—

* গল্পাংশে বিদেশী ছায়া আছে।

বিশ্বচক্র সিরিজ

স্বপনকুমারের ডিটেক্‌টিভ গ্রন্থমালা—প্রত্যেকখানির মূল্য ·৬০ পয়সা

১। অদৃশ্য সঙ্কেত
২। দুরাত্মার ছল
৩। ভ্রান্তপথের শেষে
৪। চলন্ত ছায়া
৫। হিংসার অন্ধকার
৬। অব্যর্থ সন্ধান
৭। বিষাক্ত হাসি
৮। মিথ্যা চমক
৯। চায়না লজ
১০। বিজয়িনী তন্দ্রা
১১। শ্বেতপদ্ম
১২। অদৃষ্টের পরিহাস
১৩। ব্যথার প্রদীপ
১৪। মৃত্যুহীন প্রাণ
১৫। রক্তকমল
১৬। নূতন অতিথি
১৭। পৃথিবী থেকে দূরে
১৮। হারান ডাইরী
১৯। বিকেল ছ'টার 'শো'তে
২০। বিফল স্বপ্ন
২১। বাগানবাড়ি
২২। প্রবালপুরী
২৩। জীবন-মৃত্যু
২৪। পরপারের পথিক
২৫। জমাট অশ্রু
২৬। পরাজয়ের গ্লানি
২৭। আলো-আঁধার
২৮। তিন বন্ধু
২৯। ছায়ার আর্ত্তনাদ
৩০। রাঙ্গাজবা
৩১। এক পেয়ালা চা
৩২। বেনামী চিঠি
৩৩। রত্নমালার কাহিনী
৩৪। ঝড়ের সঙ্কেত
৩৫। জবানবন্দী
৩৬। ব্যর্থ অভিযান
৩৭। হারানো মাণিক
৩৮। অদৃশ্য বন্ধু
৩৯। হরতনের নওলা
৪০। গৃহপ্রবেশ
৪১। জোয়ার ভাঁটা
৪২। বেআইনী দখল
৪৩। রূপমহল
৪৪। পরশ-পাথর
৪৫। চোখের ভুলে
৪৬। চারশো বিশ
৪৭। রঙিন সূতো
৪৮। বিষকন্যা
৪৯। শুধু দুটি হাত
৫০। সন্ধ্যা-মালতী
৫১। বন্দী বাসুকী
৫২। শেষ রাতের কাহিনী
৫৩। বলয়গ্রাস
৫৪। মায়া-কানন
৫৫। ছদ্মবেশী
৫৬। ছন্দহারা
৫৭। তেরো নম্বর বাড়ী
৫৮। বন্দিনী বিশাখা
৫৯। একটি চোখের রহস্য
৬০। মুখার্জী ভিলা
৬১ চীনের পুতুল
৬২। কালো মুখোস
৬৩। গ্রীন ড্রাগন
৬৪। নাইট ক্লাব
৬৫। সোনার হরিণ
৬৬। তিন নম্বর ফ্লাট
৬৭। ঘূর্ণি হাওয়া
৬৮। বিষের বাঁশী
৬৯। ভাড়াটে বাড়ী
৭০। ঘুম ভাঙা রাত
৭১। শেষ অঙ্ক
৭২। লাল কুঠী
৭৩। নিশি মালঞ্চ
৭৪। পাগল হাওয়া
৭৫। ঝরা বকুল
৭৬। চৈত্রের পলাশ
৭৭। সাগর বেলায়
৭৮ আণবিক রশ্মি
৭৯। পাহাড়তলির বাংলো
৮০। কাঁটা ও কমল
৮১। প্রলয়ের আলো
৮২। জীবন-দোলা
৮৩। শ্রাবণী সন্ধ্যা
৮৪। সীমান্ত ষড়যন্ত্র
৮৫। রক্ত করবী
৮৬। অদৃশ্য পথরেখা
৮৭। অজয়গড়ের রহস্য

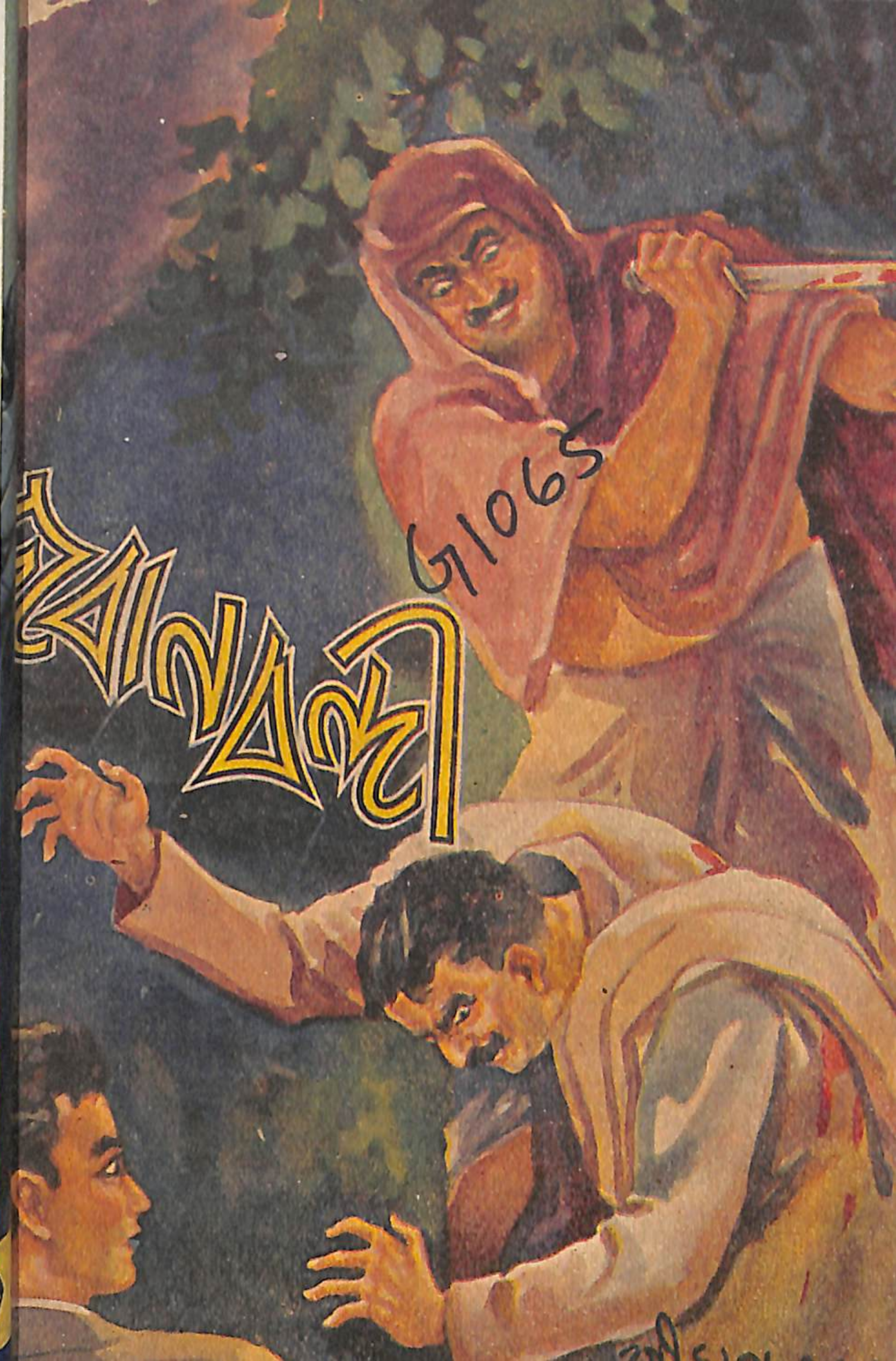

কলেজ স্টুডেন্টদের জন্য—

বিশ্ব-চক্র সিরিজের ৩৫ নম্বর বই—

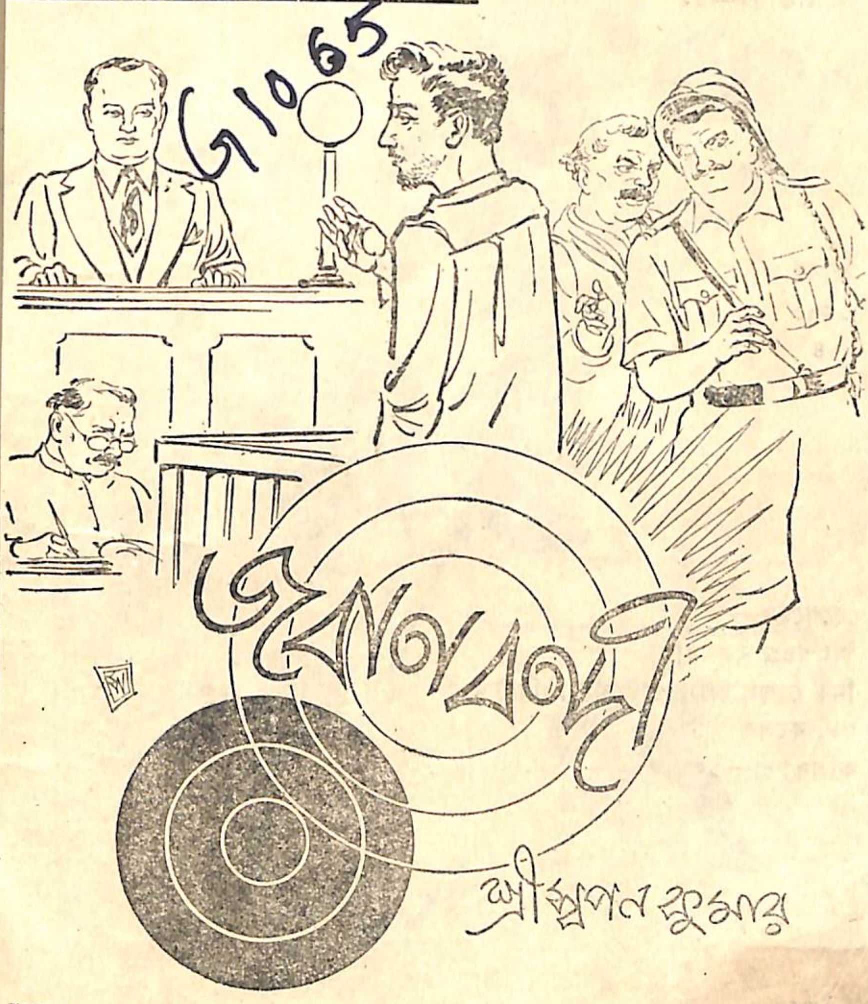

বিশ্ব সাহিত্য প্রকাশনী

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার
বিশ্ব-সাহিত্য প্রকাশনী
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

শ্রাবণ
১৩৭১
৪

ছেপেছেন—
অরুণচন্দ্র মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

৯০ পয়সা

জবানবন্দী

এক

—রক্তের ঋণ—

ইতিহাসটা আমার যেমন করুণ তেমনি বিচিত্র। তবু আপনারা যখন তা শোনবার জন্যে উৎসুক, তখন অল্প পরিসরের মধ্যে তা বলবার চেষ্টা করছি। কিন্তু দোহাই আপনাদের, আপনারা যেন ঘৃণায় শিউরে উঠবেন না।

আপনারা যদি জানতেন কি অপরিসীম দীর্ঘশ্বাস, কি ব্যথা-বেদনা-জড়ানো কান্না আমার বুকের ভেতর থেকে অহর্নিশি দমকে দমকে বেরিয়ে আসবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে তবে নিশ্চয়ই ঘৃণা-মাখা চোখ নিয়ে আমার দিকে চাইতেন না। বিশ্বাস করুন, আমি ঠিক এমনটি হতে চাইনি। কোনওদিন হতে চাইনে। আজও যেন সে সব ভয়াবহ দৃশ্যগুলো একে একে আমার সাম্‌নে ভেসে ভেসে আসে। আমি যতবার সে কথা ভাবি ততবারই আতঙ্কে শিউরে উঠি।

কিন্তু তবু এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হবার কোনও উপায় নেই আমার। আসুন, আমার বুকের ওপর আসন পেতে বসে শোনবার চেষ্টা করুন আমার এই বুকভাঙা কান্না। রক্ত আর আর্তনাদে ভরা আমার কাহিনী। আমার ওপর যে মনোরম ঘাসের আস্তরণ দেখছেন, আমার মুখে সেটা শুধু বাইরের মুখোস। অভিসারিকা নটীর মতো এটা শুধু আমার বহিরাবরণ। চুপসে-যাওয়া ব্রণক্ষত গালে তারা যেমন রঙের প্রলেপ লাগায়, আমি তেমনি আমার বুকের ওপর ঝরে-পড়া রক্তবন্যাকে ঢেকে রেখেছি ঘাসের আবরণ দিয়ে।

আর এই বিশাল অট্টালিকা? আমার বুকের একপাশে সে সগর্বে দাঁড়ি আমার প্রাচীন ইতিহাসকে বিদ্রূপ করছে! আমার পুরোনো নিষ্কলঙ্ক দিনে ব্যর্থতার কাহিনী সগর্বে প্রচার করছে! কিন্তু আমি নিষ্প্রাণতা নিয়ে দুঃখই পাচ্ছি, আমার ক্ষমতা নেই তাকে দূরে সরিয়ে দেবার। তাকে অস্বীকা করবার।

দিগন্ত-জোড়া মাঠ আমি। লোকে বলে ময়নামতীর মাঠ। ছায়াহীন জনশূন্য অবস্থায় আমি খাঁ খাঁ করছি আজ।

সে অনেকদিন আগের কথা। তখন আমার এমন অবস্থা ছিল না মাঠের একদিকে ছিল জলা। ছোট ডোবা। তাতে ফুটত শালুক ফুল। নানা ধরণের জলজ উদ্ভিদ্ ছিল তাতে। শ্যাওলা আর পাটা। মাঝে মাঝে এক ঠ্যাং ডুবিয়ে ধ্যান করত বকের দল। মাছরাঙা আর ডাহুক পাখী উড়ে উড়ে বেড়াত।

সে যেন ছিল নিষ্কলঙ্ক পবিত্র কুলবধূর মতো মনোহর রূপ। কিন্তু আমার এ পরিবর্তন ঘটল কেন? কেন আমার এ অধঃপতন? কেন আমি আজ বিপথগামী? এ দোষ আমার নয়—দোষ জনার্দন মিত্র আর তার ছেলে দীনবন্ধু মিত্রের। কিন্তু দীনবন্ধু আজ আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নির্বিবাদে সমাজের ওপর বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে—আর শাস্তি পেল নিরপরাধ জমিদার-পুত্র রণেন্দ্র। সেই পুরোনো দিনের ইতিহাস থেকে সুরু না করলে আপনারা এ কাহিনী বুঝতে পারবেন না। কাজেই সেখানে ফিরে যেতে হচ্ছে আমাকে।

রণেন্দ্রনাথের বাবা ধীরেন্দ্রনাথ ছিলেন ধনী জমিদার। ছোটখাট জমিদারী নয়, প্রায় দেড় লাখ টাকা তার দাম হবে। বছরে খাজনা আদায় হতো পনেরো বিশ হাজার টাকা। সেই জমিদারীর ছোটখাট একটা গোমস্তা ছিল

দীনবন্ধুর বাবা জনার্দন মিত্র। কিন্তু গ্রাম্য রাজনীতিতে জনার্দন ছিল চিরদিনই পারদর্শী। নিত্য নতুন খেয়ালে কাজ চালাত সে—আর সে শুধু খেয়াল নয়, তার সঙ্গে জড়ান থাকত নানা ধরণের স্বার্থবুদ্ধি। তাই দিনের পর দিন সে গাঁয়ের মাতব্বর লোকেদের একে একে সাধারণের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করেছে, আর সেই তালে তালে তার পদমর্যাদাও বেড়ে চলেছে। অবশেষে ধীরেন্দ্রনাথের বৃদ্ধবয়সে সে-ই নায়েব হয়ে সমস্ত সম্পত্তি পরিচালনা করত। রণেন্দ্র তখন কোল্‌কাতায় পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। গাঁয়ে সে বড় একটা আসত না, আর এলেও দু একদিনের বেশী থাকবার সময় পেত না।

হঠাৎ সেবার রণেন্দ্র বাবার তার পেয়ে গাঁয়ে ফিরে এলো। বাবা তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। রণেন্দ্র কোল্‌কাতায় রায়সাহেব বিনয় মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে রঞ্জনার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিল। তবে আকর্ষণই যে বিয়ের মানদণ্ড নয়, তা সে জানত। তাই ধীরেসুস্থে বাবার কাছে সব কথা খুলে বলবে এ ইচ্ছা তার ছিল। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের দিক থেকেই আকস্মিক একথা উত্থাপিত হওয়াতে এবং ধীরেন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই সম্বন্ধ স্থির করে ফেলেছেন একথা প্রকাশিত হওয়াতে রণেন্দ্র যথেষ্ট মনঃক্ষুণ্ণ হলো। তবে সে নিরাশ হলো না ততটা। ভাবল বাবাকে ধীরে ধীরে সব কথা বুঝিয়ে বললেই তাঁর মত ফিরবে। তিনি নিশ্চয়ই অভিমত পালটে ফেলবেন।

ধীরেন্দ্রনাথ কিন্তু চিরদিনই একটু একগুঁয়ে প্রকৃতির। সব শুনে তিনি বললেন, এ অসম্ভব। ইতিমধ্যেই তিনি এক জায়গায় কথা দিয়ে ফেলেছেন। কাজেই এর মধ্যে কোনও ব্যতিক্রম ঘটতে পারে না।

এর ফলে যা সাধারণত ঘটে থাকে তাই ঘটল। পিতাপুত্রে মতদ্বৈধ দেখা দিল। শুধু মতদ্বৈধই নয় বেশ কিছুটা কথা-কাটাকাটিও হলো দুজনার মধ্যে। উত্তেজনার মুহূর্তে রণেন্দ্র বলল যে সে আজীবন বিয়ে করবে না। যাই হোক

ধীরেন্দ্রনাথ হয়ত বিষয়টা বিবেচনা করে দেখতেন, কিন্তু তার আগেই ঘট
এক অদ্ভুত ঘটনা।

ধীরেন্দ্রনাথের জমিদারীতে কোথায় কি যেন গোলমাল হচ্ছে এই ধরণের খব
এলো তাঁর কাছে। খবরটা বহন করে আনল তাঁর ডান হাত বিশ্বস্ত জনার্দ
মিত্র। জনার্দনের কথায় তিনি এতটুকু অবিশ্বাস করতেন না। জনার্দ
জানাল, অবিলম্বে ধীরেন্দ্রনাথের সেখানে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন নাহলে যে
কোনও মুহূর্তে উত্তেজিত প্রজারা মারাত্মক একটা কিছু করে বসতে পারে।

ধীরেন্দ্রনাথ তক্ষুণি পালকীতে উঠে রওনা হলেন। সঙ্গে চলল জনার্দন।
প্রজাদের সঙ্গে মিটমাট করে আপোষে নিষ্পত্তি করাই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন
তিনি। কিন্তু তারপর যা ঘটল তা বলতে ঘৃণা আর ভয়াবহতায় আমার জিহ্বা
আড়ষ্ট হয়ে পড়ছে।

যাই হোক, সেদিন গভীর রাতে রণেন্দ্র খবর পেল তার পিতা আহত অবস্থা
ময়নামতীর মাঠের ধারে পড়ে আছেন। উন্মত্ত প্রজারা নাকি তাঁকে আঘাত
করেছে। দিকবিদিক চিন্তা করবার মতো মনের অবস্থা রণেন্দ্রের ছিল না।
সে তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। দিশেহারার মতো সে ছুটে চলল ময়নামতীর মাঠের
দিকে।

রাত তখন দুটো। নিরন্ধ্র আঁধারের ঘন কালো যবনিকা দিয়ে আবৃত বিবশা
পৃথিবী। ময়নামতীর মাঠের এককোণে জলার ধারে পিতার মৃতদেহটা দেখে
চিনতে দেরী হলো না রণেন্দ্রের। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে সে পিতার
মৃতদেহটা বুকে জড়িয়ে ধরল।

কিন্তু হতভাগ্য রণেন্দ্র জানত না, সেই সঙ্গে কি মারাত্মক ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে
সে। আর অক্টোপাসের মতো সেই চক্রান্তের বেষ্টনীতে তাকে জড়াবার জন্যেই
সেখানে ডেকে আনা হয়েছিল। রণেন্দ্র যখন ভাল করে চারদিকে চেয়ে দেখবার

অবকাশ পেল, তখন অবাক হয়ে লক্ষ্য করল মাঠের মধ্যে সে একা। রণেন্দ্রকে
সংবাদটা দিয়েই জনার্দন যে কোথায় অদৃশ্য হলো তা সে বুঝতেও পারল না।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সেটা তার কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হলো।
রণেন্দ্র দেখতে পেলো একদল পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে দারোগা সাহেব তার
দিকে এগিয়ে আসছেন। সবার পেছনে ক্রুর হাসিমুখে দাঁড়িয়ে-থাকা
জনার্দনকে দেখে সবটুকু বুঝতে রণেন্দ্রের অসুবিধা হলো না। কিন্তু তখন
কোন কথা বলবার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না।

আদালতে প্রমাণিত হলো রণেন্দ্রনাথই গোপনে তার পিতাকে ডেকে এনে
ময়নামতীর মাঠের ধারে তাঁকে হত্যা করেছে। এমন কি সেদিন বিয়ের ব্যাপার
নিয়ে বাবার সঙ্গে তার যে মতবিরোধ হয়েছিল সেটাও প্রমাণিত হলো। একের
পর এক সাজান মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্যে রণেন্দ্রের অপরাধ প্রমাণিত হলো।
জুরীরা রায় দিলেন—আসামী দোষী, তার কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।
রণেন্দ্রের দিকে চেয়ে বিচারক প্রশ্ন করলেন—আসামী, তোমার কিছু বলবার
আছে? রণেন্দ্র শুধু বলল—আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। প্রকৃত দোষী ঐ শয়তান
যে এই মামলা পরিচালনা করছে। আমাকে সেই মিথ্যা ফাঁদে জড়িয়েছে।
কিন্তু আমি যদি আগে তার ঐ চক্রান্ত জানতে পারতাম তবে নিশ্চয়ই এভাবে
মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়তাম না। কিন্তু আদালত রণেন্দ্রের কথা বিশ্বাস
করল না। সে হাতে হাতে ধরা পড়েছে। তবে কোন কথা আদালতের গ্রাহ্য
না হলেও benefit of doubt-এর জন্যে তার ফাঁসি হলো না। বিচারক হুকুম
দিলেন—দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। বিচারকের আদেশ শুনে আর কারো
চোখে আনন্দের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল কিনা জানি না, তবে জনার্দন আর
তার ছেলে দীনবন্ধু যে কতটা আনন্দিত হয়েছিল সেটা বোঝা গিয়েছিল
বেশ স্পষ্টই।

সেদিন দীনবন্ধু আর জনার্দন কেন এতটা খুসী হয়েছিল তা বুঝতে পারিনি কিন্তু মাত্র তিনটি বছরের মধ্যে তা বেশ স্পষ্টই উপলব্ধি করলাম।

কয়েকটি বছরের মধ্যে দেখতে দেখতে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলো দীনবন্ধু মিত্র। রণেন্দ্র ধীরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র, কাজেই তার দণ্ডাদেশের পর দীনবন্ধুর কাজে বাধা দেবার জন্যে কেউ ছিল না। রণেন্দ্রের মা অবশ্য ধীরেন্দ্রনাথের জীবিত অবস্থাতেই মারা গিয়েছিলেন।

কিন্তু বিধাতার অমোঘ বিধান কখনও প্রকৃত অপরাধীকে ক্ষমা করে না। তাই ধীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যে জনার্দন মিত্র মারাত্মক ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হলো। পালমোনারী টিউবারকিউলসিস। অজস্র অর্থব্যয় করেও তাকে বাঁচান গেল না। তিল তিল করে তার জীবনীশক্তি ক্ষীয়মাণ হয়ে আসতে লাগল। বুকের ভেতরে ক্ষয়রোগের জীবাণু বাসা বাঁধায় ঝলকে ঝলকে মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে সুরু করল। সাধারণ মানুষ হয়ত বিধাতাকে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে না প্রত্যেক মানুষকেই পাপের ঋণ একদিন কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হবে। সেদিনও মানুষ তা স্বীকার করত না।

কথাটা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিল একমাত্র জনার্দন মিত্র। মৃত্যুশয্যায় মুমূর্ষু অবস্থায় সে তাই পুত্রকে উপদেশ দিয়েছিল, জীবনে আর কখনও অন্যায় না করতে। কারো অন্যায়কে সমর্থন না করতে।

কিন্তু রক্তের ঋণ মানুষের রক্তের মধ্য দিয়ে সংক্রামিত হয়। বংশ-পরম্পরায় চলতে থাকে পাপের হিসাবনিকাশ। তাই দীনবন্ধু মিত্র পিতার অন্তিম কথাগুলোকে বিশ্বাস করেনি। বরং সেগুলোকে মুমূর্ষুর প্রলাপ মনে করে হয়ত উপহাস করেছিল। তাই তাকে ফলভোগ করতে হলো তার জীবনে। এবার সেই কাহিনীই সুরু করছি আমি।

G106

দুই

—অমোঘ লিপি—

উপরের ঘটনার পর সুদীর্ঘ পনরটি বছর কেটে গেছে।

এই দীর্ঘ দিনের অতিক্রমণে কতো কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে পরিবর্তনশীলা পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে। কতো নতুনের স্পন্দনে পৃথিবী মুখরিত হয়েছে, কতো পুরোনো নিজেদের হিসেবনিকেশ চুকিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে চিরবিদায় নিয়েছে।

আমার বুকেও ঘটেছে পরিবর্তন।

আজ দেখতে পাচ্ছেন যে সুবিশাল প্রাসাদ আমার দক্ষিণ দিকে শোভা পাচ্ছে, এটি দীনবন্ধু মিত্রের নিজের টাকায় তৈরী। এখানেই সে সস্ত্রীক বাস করে। হ্যাঁ, ইতিমধ্যেই পাশের গ্রামাঞ্চলের একজন সম্ভ্রান্ত বংশের জমিদারের একমাত্র কন্যার সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। তা ছাড়া আজ সে অর্থবান ও প্রতিপত্তিশালী জমিদার। তার বিয়েতে বাধা দেবে কে?

দুটি কন্যা হয়েছিল দীনবন্ধুর—লীনা আর মিতা। লীনার বয়স চৌদ্দ, মিতার দশ কি এগার। সকন্যা, সস্ত্রীক দীনবন্ধু মিত্র বেশ সুখেই ঘরসংসার করছিল বলতে হবে। ওদের দিকে চেয়ে পুরোনো দিনের কোন কল্পিত ইতিহাস আমার মনে জাগত না। আমিও ভুলে গিয়েছিলাম হতভাগ্য ধীরেন্দ্রনাথের নৃশংস মৃত্যুর অভিশপ্ত ইতিহাস।

সে কথা যাক। দীনবন্ধুর বর্তমান ইতিকথা নিয়েই আমাদের কাহিনী। দীনবন্ধু শুধু একজন প্রতিপত্তিশালী লোক নয়, তার দয়া এবং উদারতার কথা গ্রামের লোকের মুখে মুখে ফেরে। দীনবন্ধু নিজের টাকায় বিরাট দাতব্য-চিকিৎসালয় আর একটি স্কুল তৈরী করেছে গ্রামে। শুধু তাই নয়, গ্রাম

১০।৬

ছাড়াও ময়নামতী মাঠের পূর্ব দিক জুড়ে সে বিরাট একটা কলোনী তৈরী করেছে উদ্বাস্তু অর্থহীন লোকদের সাহায্যের জন্যে। অত্যন্ত অল্প ভাড়ায় সেখানে তারা থাকতে পারে। দীনবন্ধু অল্প ভাড়ায় মধ্যবিত্ত লোকদের এখানে থাকতে দিয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

শুধু দীনবন্ধু নয়, দীনবন্ধুর স্ত্রী অনুরাধা দেবীর সুখ্যাতিও সকলেই করে থাকে। অনুরাধা দেবী শুধু সুন্দরী নারী নন, তিনি পরম দয়াবতী ও ন্যায়নিষ্ঠ। সত্যি কথা বলতে কি দীনবন্ধু যেন প্রাণপণে সব কিছুকে পালটে ফেলে নিজেদের অতীতকে ঢেকে দেবার আপ্রাণ প্রয়াস পেয়েছিল। আসলে তার অতীত অপকার্যের কুখ্যাতি গ্রামের বুক থেকে মুছে গিয়েছিল বললেই হয়।

এমন কি তার সুকার্যের সঙ্গে সঙ্গে তার পিতা জনার্দন মিত্রও যে একজন দয়ালু, সাধু লোক ছিলেন, গ্রামের লোকে এ কথাই বিশ্বাস করতে সুরু করেছিল। কিন্তু তার অপকার্যের সাক্ষী ছিল মাত্র তিনজন। দীনবন্ধুর পুরোনো দিনের দুজন শয়তান অনুচর—বিনয় মল্লিক আর ইস্‌মাইল সর্দার।

কিন্তু দীনবন্ধু মিত্র তাদের দুজনকেই উঁচু চাকরী দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করেছিল। বিনয় মল্লিক এখন দীনবন্ধুর নায়েব আর ইস্‌মাইল সর্দার হচ্ছে তার লাঠিয়ালদলের সর্দার। তাই তাদের তরফ থেকে কোন ক্ষতি হওয়া যে সম্ভব নয় তা দীনবন্ধু বেশ ভাল করেই জানত।

আর তৃতীয় সাক্ষী হচ্ছি আমি। কিন্তু আমি সামান্য একটি নিষ্প্রাণ, নির্বাক মাঠ। পঙ্গু, অথর্ব। তাই আমার বুকের মধ্যে তাদের কাহিনীর পূর্বাংশ গুমরে উঠলেও মুখে তা প্রকাশ করবার ভাষা নেই, শুধু আজ আপনাদের কাছেই তুলে ধরছি আমার মনোবেদনা। যা কিছু ইতিকথা। আপনারা যদি এ থেকে আনন্দ পান, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক। সে কথা যাক, দীনবন্ধু আর তার নায়েব বিনয় মল্লিক কিন্তু মাঝে মাঝে চেষ্টা করত রণেন্দ্র সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার।

কিন্তু কারাবাসের দুবছর পরেই হঠাৎ তারা খবর পেয়েছিল, রণেন্দ্র অপূর্ব উপায়ে জেল কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে পলায়ন করতে সমর্থ হয়েছে। তারপর দীর্ঘ তের বছরের মধ্যে তার আর কোন খবর জানা যায়নি। এমন কি সে বেঁচে আছে কিনা, সে খবরও তাদের কাছে অজ্ঞাত।

এ ছাড়া আর একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছিল। অপূর্ব যোগাযোগ। গ্রামের বুকে রণেন্দ্রের একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল ভজহরি সমাদ্দার নামে একটি ছেলে। স্কুলজীবনে সে ছিল রণেন্দ্রের সহপাঠী, অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু রণেন্দ্র জেল থেকে বের হবার সংবাদ পাবার দিন কয়েক পরেই তার মাথাটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়।

ভজহরির বাবা মা তার মাথার চিকিৎসার জন্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে কিছুই করতে পারেননি। তা ছাড়া পল্লীগ্রামে মধ্যবিত্ত পরিবারের এমন সামর্থ্য নেই কোল্‌কাতায় ছেলেকে পাঠিয়ে চিকিৎসা করান। দু একবার তাঁরা অবশ্য দীনবন্ধু মিত্রের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন কিন্তু সদাশয় দীনবন্ধু অন্য ব্যাপারে যাই হোক, শত্রুর অন্তরঙ্গ বন্ধুর চিকিৎসায় এক কপর্দকও খরচ করতে রাজী নয়। ভজহরির চিকিৎসা তাই ভালমত হয়নি। সে অর্দ্ধ-উন্মত্ত অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

গাঁয়ের ছেলেরা মাঝে মাঝে তাকে বিরক্ত করে—কিন্তু আশ্চর্য, ভজহরি তাতে অন্যান্য পাগলের মতো মোটেই রেগে ওঠে না। সে বরং ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পারলেই খুসী হয়। তাই মাঝে মাঝে গাঁয়ের দু' একজন বলে—ছেলেটা তেমন পাগল নয়। চিকিৎসা করাতে পারলে হয়ত সেরে উঠত, কিন্তু—

সে 'কিন্তু'র সমাধান আর হয় না। কারণ গ্রামের সাধারণ লোকের কারোই এত টাকা নেই যে ভজহরির চিকিৎসা করায়। কাজেই ভজহরিকে একই ভাবে দিনের পর দিন কাটিয়ে যেতে হয়। অবশ্য এজন্যে কোনও দুঃখ নেই ভজহরির। সে জানে এমনি করে বাকী জীবনটুকু কাটাতে পারলেই সে ভাগ্যবান।

* * * *

দিনের পর দিন কেটে চলেছিল বৈচিত্র্যহীন ভাবে।

সাধারণ জীবনযাত্রায় মানুষের জীবনে অসাধারণ কিছু আশা করা যায় না। কিন্তু মাঝে মাঝে বাস্তব জীবনে নাটকীয় অনেক কিছু ঘটনা ঘটে। হঠাৎ একখানা চিঠি পেল দীনবন্ধু, সেদিন সকালের ডাকে। এমনি কতো চিঠি আসে কতো দেশ-বিদেশের না-জানা বিচিত্র সংবাদের ঝুলি বহন করে। কিন্তু এমন একটা চিঠি কেউ কল্পনাও করতে পারে না। চিঠিতে কোন মানুষ বা ঘটনার নামগন্ধ কিছু নেই—শুধু তাতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটুকরা কবিতা ঃ

যারে তুমি নিচে ফেল,
সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে।
পশ্চাতে ঠেলিছ যারে
সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে, আড়ালে রেখেছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

—নিয়তি—

বারকয়েক চিঠিখানা পড়েই দীনবন্ধুর মুখখানা কেমন যেন পাংশুবর্ণ ধারণ করে। কি এই চিঠির অর্থ? এর মধ্যে যেন কোন একটা রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে!

যেন অতীত দিনের সংকেত। মৃত ভবিষ্যতের দুর্নিবার হাতছানি। কিন্তু কি করে তা সম্ভব?

দীনবন্ধু মিত্র কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়ে। পনের বছর আগে যা ঘটে গেছে তার জের টানবার জন্যে আজ নিশ্চয়ই কেউ বেঁচে নেই। তা ছাড়া

যদি আজ রণেন্দ্র বেঁচে থাকত তবে পনের বছর আগেই সে আসত। এতদিন চুপ করে বসে থাকবার অর্থ কি?

আর অর্থহীন নিঃসম্বল রণেন্দ্রের পক্ষে তার মত ধনবান, বিত্তবান, মর্যাদা-সম্পন্ন লোককে শাস্তি দেবার কথা চিন্তা করাটাও অসম্ভব! হঠাৎ নিজের মনেই হেসে ওঠে দীনবন্ধু। এ সব সে পাগলের মতো কি চিন্তা করছে? কোথাকার কে পাগলামি করে কয়েক লাইন কবিতা লিখে পাঠিয়েছে তার সঙ্গে রসিকতা করবার জন্যে। এর সঙ্গে রণেন্দ্রেরই বা কি সম্বন্ধ? আর রণেন্দ্র বেঁচে থাকলেও, সে সব কিছু ছেড়ে এই গ্রামেই বা ফিরে আসবে কেন? তার বন্ধু ভজহরি পাগল হয়ে গেছে। সে নিজেও একজন বি. এ. পাস ছেলে। সে বরং সবার চোখের আড়ালে থেকে কোন কাজকর্মের চেষ্টায় ঘুরবে। গ্রামে ফিরে এলে তার ধরা পড়বার ভয় আছে, এটা নিশ্চয়ই সে ভাল করেই জানে।

তা ছাড়াও সাধারণ মানুষের প্রাকৃতিক নিয়মেই দীনবন্ধু এইভাবে নিজেকে বিপদমুক্ত বলে মনে করছিল। অপরাধীদের মানসিক প্রবৃত্তিই হচ্ছে, বিপদ সাম্‌নে থাকলেও সে নিজেকে বিপদমুক্ত মনে করে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর এক্ষেত্রে দীনবন্ধুর বেলাতেও হয়েছিল ঠিক তাই। এই সুদীর্ঘ দিন পরে সে আর নিজেকে কিছুতেই পুরোনো পাপের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চাইছিল না। তাই সে বাধ্য হয়ে নিজেকে সব বিপদের উর্দ্ধে বলে মনে করছিল। এটা তার একধরণের মানসিক সান্ত্বনাও বলা যেতে পারে।

তবু চিঠিখানা একবার বিনয় মল্লিককে দেখান উচিত। দীনবন্ধু চিঠিখানা খামের মধ্যে পুরে ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

* * * *

দিনের পর দিন কেটে চলেছিল বৈচিত্র্যহীন ভাবে।

সাধারণ জীবনযাত্রায় মানুষের জীবনে অসাধারণ কিছু আশা করা যায় না। কিন্তু মাঝে মাঝে বাস্তব জীবনে নাটকীয় অনেক কিছু ঘটনা ঘটে। হঠাৎ একখানা চিঠি পেল দীনবন্ধু, সেদিন সকালের ডাকে। এমনি কতো চিঠি আসে কতো দেশ-বিদেশের না-জানা বিচিত্র সংবাদের ঝুলি বহন করে। কিন্তু এমন একটা চিঠি কেউ কল্পনাও করতে পারে না। চিঠিতে কোন মানুষ বা ঘটনার নামগন্ধ কিছু নেই—শুধু তাতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটুকরা কবিতা ঃ

যারে তুমি নিচে ফেল,
সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে।
পশ্চাতে ঠেলিছ যারে
সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে, আড়ালে রেখেছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

—নিয়তি—

বারকয়েক চিঠিখানা পড়েই দীনবন্ধুর মুখখানা কেমন যেন পাংশুবর্ণ ধারণ করে। কি এই চিঠির অর্থ? এর মধ্যে যেন কোন একটা রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে!

যেন অতীত দিনের সংকেত। মৃত ভবিষ্যতের দুর্নিবার হাতছানি। কিন্তু কি করে তা সম্ভব?

দীনবন্ধু মিত্র কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়ে। পনের বছর আগে যা ঘটে গেছে তার জের টানবার জন্যে আজ নিশ্চয়ই কেউ বেঁচে নেই। তা ছাড়া

যদি আজ রণেন্দ্র বেঁচে থাকত তবে পনের বছর আগেই সে আসত। এতদিন চুপ করে বসে থাকবার অর্থ কি?

আর অর্থহীন নিঃসম্বল রণেন্দ্রের পক্ষে তার মত ধনবান, বিত্তবান, মর্যাদা-সম্পন্ন লোককে শাস্তি দেবার কথা চিন্তা করাটাও অসম্ভব! হঠাৎ নিজের মনেই হেসে ওঠে দীনবন্ধু। এ সব সে পাগলের মতো কি চিন্তা করছে? কোথাকার কে পাগলামি করে কয়েক লাইন কবিতা লিখে পাঠিয়েছে তার সঙ্গে রসিকতা করবার জন্যে। এর সঙ্গে রণেন্দ্রেরই বা কি সম্বন্ধ? আর রণেন্দ্র বেঁচে থাকলেও, সে সব কিছু ছেড়ে এই গ্রামেই বা ফিরে আসবে কেন? তার বন্ধু ভজহরি পাগল হয়ে গেছে। সে নিজেও একজন বি. এ. পাস ছেলে। সে বরং সবার চোখের আড়ালে থেকে কোন কাজকর্মের চেষ্টায় ঘুরবে। গ্রামে ফিরে এলে তার ধরা পড়বার ভয় আছে, এটা নিশ্চয়ই সে ভাল করেই জানে।

তা ছাড়াও সাধারণ মানুষের প্রাকৃতিক নিয়মেই দীনবন্ধু এইভাবে নিজেকে বিপদমুক্ত বলে মনে করছিল। অপরাধীদের মানসিক প্রবৃত্তিই হচ্ছে, বিপদ সাম্‌নে থাকলেও সে নিজেকে বিপদমুক্ত মনে করে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর এক্ষেত্রে দীনবন্ধুর বেলাতেও হয়েছিল ঠিক তাই। এই সুদীর্ঘ দিন পরে সে আর নিজেকে কিছুতেই পুরোনো পাপের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চাইছিল না। তাই সে বাধ্য হয়ে নিজেকে সব বিপদের উর্দ্ধে বলে মনে করছিল। এটা তার একধরণের মানসিক সান্ত্বনাও বলা যেতে পারে।

তবু চিঠিখানা একবার বিনয় মল্লিককে দেখান উচিত। দীনবন্ধু চিঠিখানা খামের মধ্যে পুরে ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

তিন

—অন্য কোনখানে—

ময়নামতীর মাঠের একদিকে যেমন নতুন ভাবে গড়ে উঠেছে দীনবন্ধুর প্রাসাদ আর কলোনী, তেমনি অন্যদিকে ছোট্ট একটা জমি কিনে নতুন বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ি তৈরী করে বাস করছিলেন বৈজ্ঞানিক মিঃ বাসু।

মিঃ বাসুর পুরো নাম কি তা গাঁয়ের লোক কেউ জানে না। সকলে শুধু জানে তিনি একজন খামখেয়ালী জমিদার-পুত্র। বিলেত গিয়েছিলেন নিজের টাকায়। ওদেশের বৈজ্ঞানিক মহলে বিরাট সুনাম অর্জন করেছিলেন তিনি। বিদেশ থেকে ফিরে এসে ভারত গভর্নমেন্টের কাছ থেকেও একটা ভাল চাকরীর offer পেয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক মিঃ বাসু এক বিচিত্র ধরণের লোক। শুধু খামখেয়ালী নয়, কল্পনাপ্রবণ। বিজ্ঞানকে তিনি অর্থের মানদণ্ডে স্থাপন করতে চাননি—তিনি বিজ্ঞানকে জীবনের সাধনার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নতুন এক বিচিত্র মারণাস্ত্রের জন্যে সাধনা করছেন তিনি, গ্রামের সকলেই এই কথাই জানে।

দিনের পর রাত নামে—রাতের পর দিন।

গ্রামের লোকের সাম্‌নে মিঃ বাসু কখনও বের হন না। সুদীর্ঘদিন আগে তিনি যে বাংলো তৈরী করে সেখানে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন তারপর বাইরের পৃথিবীর কেউ তাঁর মুখ দেখবারও অবকাশ পায়নি। লোকে শুধু জানে একজন বৈজ্ঞানিক এই বাংলোতে বাস করেন। কিন্তু শুধু মাঝে মাঝে মাঝরাতে গ্রামের লোকে মিঃ বাসুর উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে।

গীটারের আর্তকান্না মাঝরাতে বাতাসকে মথিত করে যখন দিকে দিকে সকরুণ

বিহ্বলতায় মূর্ছিত হয়ে পড়ে তখন গ্রামের কোন কোন জেগে-থাকা লোক হয়ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—লোকটা পাগল হলেও গুণী বটে। আর সত্যিই কি মিষ্টি হাত! কেন যে জীবনটাকে এমনি করে নষ্ট করল তা কে জানে?

মিঃ বাসুর দৈনন্দিন জীবনে সঙ্গী মাত্র দুজন। কিন্তু তারা দুজনও যেন দিবারাত্র গাঁয়ের লোকদের চোখের সাম্‌নে থেকে দূরে থাকতে চায়। তাদের একজন হচ্ছে মিঃ বাসুর বিশ্বাসী ভৃত্য লাউচীন, আর অন্যজন হচ্ছে একটি কুকুর। মিঃ বাসু তার নাম দিয়েছেন Terror। লাউচীন জাতে অ্যাংলো-চাইনিজ। বেঁটে-খাটো চেহারা। কিন্তু দেহের প্রতিটি পেশীতে যেন অসুরের শক্তি স্তরে স্তরে সাজান। আর Terror শুধু নামেই ভীতিজনক নয় তার চেহারা গাঁয়ের লোকদের কাছে ভীতিজনক। মিঃ বাসুর আদেশে দিনের বেলায় টেরারকে লোহার শিকলে বেঁধে রাখা হয়। কেবল মাত্র রাতের বেলায় তার মুক্তি। কিন্তু মিঃ বাসুর বাংলোর আশেপাশে সে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে সশব্দে গর্জন করে বহুদূর দিয়ে গমনশীল লোকদের মনে অহেতুক ভয় জাগায়। তাই রাতের বেলায় পারতপক্ষে কেউ মিঃ বাসুর বাড়ির কাছাকাছি আসতে চায় না। দিনের পর দিন তাই শুধু বিচিত্র একধরণের রহস্যময় অস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিল সকলের মনে। যেমন বিচিত্র মানুষ তেমনি বিচিত্র দুজন সঙ্গী! লাউচীনের চেহারার দিকে চাইলে মনে হয় সে যেন জীবন্ত বিভীষিকা। কপালে বিরাট কাটা দাগ যেন তার অতীতের কোন্ এক দুর্নিবার জীবনের সংকেত বহন করছে। তাই তার সাথে কেউ সাহস করে কথা বলে না। আর সেও বিনা কারণে কারো সাথে কথা বলতে চায় না। এমনি ভাবেই ময়নামতীর মাঠের এক নিরালা কোণে বয়ে চলেছিল প্রখ্যাত এক বৈজ্ঞানিকের অজ্ঞাত জীবনের রহস্যময় প্রহরগুলো।

* * * *

নিমন্ত্রণ রক্ষা করাটা দীপকের চিরদিনের অভ্যাস। দীপককে আপনারা চেনেন ত? প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীকে না চেনে এমন লোক আজকাল কেউ আছে নাকি?

ময়নামতীর মাঠের পাশেই বৈষ্ণবাটী স্টেশন। সেখানে জমিদার দীনবন্ধু মিত্রের কাছ থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল দীপকের—কোনও একটি বিশেষ ফাংশানে যোগ দেবার জন্যে।

দীনবন্ধু মিত্রের চিঠি:

প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী সমীপেষু—

মহাশয়, আমি বাংলার একটি ক্ষুদ্র গ্রামাঞ্চলের দীনদরিদ্র জমিদার। আপনার মতো প্রখ্যাত লোককে আমন্ত্রণ করে ডেকে আনবার মতো যোগ্যতা আমার নেই। আমার ছোট মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে যে উৎসব হচ্ছে তাতে বিশেষ কয়েকজন অতিথিকে আমন্ত্রণ করেছি আমি। কিন্তু সম্প্রতি একখানা বিচিত্র ধরণের ভীতিজনক পত্র পেয়েছি কোন একজন অজ্ঞাত পত্রপ্রেরকের কাছে থেকে। এই বিশেষ উৎসব-রজনী সামান্য দুর্ঘটনার জন্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তা আমি চাই না। তা ছাড়া যদিও একটা কোন দুর্ঘটনা ঘটবে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা কিছু নেই তবুও বিশেষ ভয় পেয়েই আপনাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। এটা শুধু সাধারণ নিমন্ত্রণ নয়, বিশেষ অনুরোধ। এর জন্যে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হবে তা আমি খরচ করতে প্রস্তুত। অবশ্য আপনার fee কত তা আমি জানি না। তবুও সে বিষয়ে নিশ্চয়তা দিয়েই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আশা করি অবশ্যই আসছেন। বৈষ্ণবাটী স্টেশনে আমার গাড়ি তৈরী থাকবে। সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে—

ভবদীয়
দীনবন্ধু মিত্র।

*   *   *   *

শুধুমাত্র নিমন্ত্রণ পেলেই দীপক হয়ত এভাবে দীনবন্ধুবাবুর আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে ততোটা উৎসুক হয়ে উঠত না, যতোটা সে হয়েছিল অন্য আর একটা কারণে। সেই বিশেষ কারণটি হলো একটা বিশেষ ধরণের চিঠি।

যাঁরা সত্যানুসন্ধী দীপক চ্যাটার্জীর কর্মপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত আছেন, তাঁরাই জানেন যে, দীপক চিরদিনই একটু বেশীমাত্রায় কৌতূহলী। যেখানে বিপদের আর রহস্যের গন্ধ, সেখানেই সে-রহস্য ভেদ করবার জন্যে সে তৎপর হয়ে ওঠে। তাই দীনবন্ধুবাবুর আমন্ত্রণকে সে ততোটা উচ্চ স্থান দিত না, যতোটা দিল সেই সঙ্গে সেদিনের ডাকে আগত আর একটা রহস্যপূর্ণ চিঠিকে।

গোটা গোটা হরফে লেখা চিঠিখানা। লেখক যেন ইচ্ছা করেই নিজের হস্তাক্ষরটা বিশেষভাবে গোপন করতে চায়। কিংবা চিঠিটা হয়ত তার বাঁ হাত দিয়ে লেখা।

চিঠিখানাতে লেখা ছিল:

রহস্যানুসন্ধী দীপক চ্যাটার্জী,

আমি বিশেষ সূত্রে জানতে পারলাম, তুমি সম্প্রতি দীনবন্ধু মিত্রের কাছ থেকে একটা আমন্ত্রণ পেয়েছ। এই ধরণের আমন্ত্রণ পাওয়া হয়ত তোমার পক্ষে স্বাভাবিক—আর এই ধরণের আমন্ত্রণকে অবলম্বন করে কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়তেও তুমি অভ্যস্ত। কারণ এটাই হচ্ছে তোমার পেশা।

কিন্তু আজ আমি তোমাকে বিশেষ একটি অনুরোধ করছি। আমি আশা রাখি আমার এ অনুরোধ তুমি রাখবে—আমাকে কিছুতেই বিমুখ হতে হবে না।

শোন দীপক, এ কেসে দীনবন্ধু মিত্রের কাছ থেকে যে অর্থ তুমি আশা কর, তুমি যদি এ কেসে হাত না দিয়ে এ থেকে সরে দাঁড়াও তবে আমি তোমাকে ঠিক ততোটা অর্থ ই দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমার এ প্রতিশ্রুতি তুমি বিশ্বাস করতে পার। কারণ তুমি যদি এ কাজে হাত না দাও, তিন দিনের মধ্যেই আমার প্রেরিত টাকা তোমার হস্তগত হবে।

আর শোন, যদি তুমি আমার এই চিঠিকে অর্থহীন মনে করে থাক, তবে তোমার এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতে হবে। তোমাকে আমি এমন শাস্তি পেতে বাধ্য করব, যা তুমি জীবনে কখনও ভুলতে পারবে না।

বেশী কথা তোমাকে লিখতে চাই না, শুধু শুনে রাখ, অতীত দিনের একটি কাজের দেনা-পাওনার হিসেব মিটিয়ে নিচ্ছি আমি। তাই আমি আশা করি, আমাদের এ হিসেবনিকেশের মধ্যে তুমি অনর্থক নাক গলিয়ে আমার কাজে বাধার সৃষ্টি করবে না।

তাই আমার বিশেষ অনুরোধ, এ কাজ থেকে তুমি সরে দাঁড়াও। তা হলে আগামী পরশু দশ হাজার টাকা তোমার হাতে পৌছুবে যথারীতি।

মনে রেখো ঃ

মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে থেকে তবু কোলে দাও নাই স্থান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। ইতি—

নিয়তি।

* * * *

চিঠিখানা বার বার পড়ে দীপক বেশ সাবধানতার সঙ্গে সেটি তার কাছে রেখে দিল।

তবে একটা বিষয়ে সে স্থিরনিশ্চিত হলো। এই চিঠিটা না পেলে হয়ত সে এ কাজে হাত দিত কিনা তার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু এবারে সে মনস্থির করল, এ কাজ সে গ্রহণ করবেই।

তাই দীনবন্ধু মিত্রের আমন্ত্রণ গ্রহণ করাই দীপক মনে মনে স্থির করে ফেলল।

চার

—জীবনটাই নাটক—

বৈষ্ণবাটী যাবার আগে হঠাৎ একটি খেয়াল হলো দীপকের। স্থানীয় থানায় গিয়ে ও. সি. মিঃ গুপ্তের সঙ্গে এই বিষয়েই একটা প্রাথমিক আলোচনা করতে মনস্থ করল সে। ইন্স্পেক্টর গুপ্ত প্রবীণ লোক। তা ছাড়া নানা ধরণের অজস্র কেস নিয়ে নাড়াচাড়া করে তাঁর বুদ্ধিটা কিঞ্চিৎ বাস্তবপন্থী। তিনি দেখেশুনে বললেন—নিশ্চয় এর মধ্যে মারাত্মক একটা কোন গোলমাল রয়েছে বলে মনে হয় আমার।

—গোলমাল? চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করে দীপক।

—হ্যাঁ, তা না হলে সামান্য একটা চিঠি পেয়ে কেউ কাউকে নিমন্ত্রণ করে বলে মনে করেন?

—কিন্তু নিমন্ত্রণকে দীপক চ্যাটার্জী জীবনে কখনও উপেক্ষা করে না মিঃ গুপ্ত, আপনি তা নিশ্চয়ই ভাল করে জানেন। তা ছাড়া চোখ-কান খোলা রেখে কোন্ পথে এগোন উচিত তাও আমি বেশ ভাল করেই জানি।

—আমার মনে হয় নিশ্চয়ই এর মধ্যে আপনার খোরাক মিলবে।

—আমি তেমন একটা কিছু আশা করি। তবে যাই হোক না কেন দীনব মিত্রকে সব ব্যাপারে সাপোর্ট করবার জন্যে আমি যাচ্ছি না। আমি চাই যাতে কোনও অঘটন না ঘটে।

—সেটা অবশ্য আপনার কর্তব্য।

—Next train হচ্ছে ছটো বেজে পঁচিশ মিনিটে। তার আগে আমাকে স্টেশনে হাজির হতে হবে। এ ট্রেণ মিস্ করলে ঠিক সময়ে সেখানে পৌঁছুতে পারব না।

—Wish you best luck মিঃ চ্যাটার্জী!

—ধন্যবাদ। অবশ্য যদি প্রয়োজন হয় আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী হবো। ওখান থেকে আপনাকে আমি জানাব। I will seek for your help···

ইন্স্পেক্টর গুপ্তের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দীপক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় ছটো পঁচিশের ট্রেণটা ধরবার জন্যে।

* * * *

ট্রেণটা সেদিন একটু লেট ছিল। দীপক যখন বৈদ্যবাটী স্টেশনে পৌঁছুল ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটা।

স্টেশনেই গাড়ি অপেক্ষা করছিল। ফার্স্ট ক্লাস থেকে দীপককে নামতে দেখে একজন গোমস্তাশ্রেণীর লোক এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন—আপনিই কি মিঃ চ্যাটার্জী?

—হ্যাঁ। আপনি?

—আমি দীনবন্ধুবাবুর নায়েব। এখানেই কাজ করি।

—স্টেশন থেকে তাঁর বাড়িটা কত দূর?

—আট ন মাইলের বেশি নয়। ময়নামতীর মাঠের ওপর তাঁর বাড়ি।

—দীনবন্ধুবাবুর গাড়ি আছে না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এ অঞ্চলে খুব বেশী লোকের গাড়ি নেই, তবুও দীনবন্ধুবাবু নিজে কোল্‌কাতা থেকে গাড়ি কিনে আনিয়েছেন।

দীপক কেমন যেন একটু বিস্মিত হয়। কোন জমিদারের নায়েব যে জমিদারের নাম ধরে 'বাবু' বলতে পারে এ ধারণা ছিল না তার। এ থেকেই বোঝা যায়, এ অনেকদিন থেকে কাজ করছে এবং দীনবন্ধুবাবুর ওপর এর যথেষ্ট দখল রয়েছে।

—গাড়িখানা কোথায় অপেক্ষা করছে? দীপক প্রশ্ন করে।

—স্টেশনের বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। আসুন আমার সঙ্গে।

দীপক ভদ্রলোকের সঙ্গে বাইরে এসে গাড়িতে চড়ে বসে।

গাড়ি দ্রুত ছুটে চলে আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে।

কিছুক্ষণ পরেই দীনবন্ধুবাবুর বিরাট প্রাসাদের মতো বাড়ির সাম্‌নে গাড়িখানা এসে দাঁড়ায়।

প্রাসাদখানি যেন সুসজ্জিতা সুন্দরী নারীর মতোই ঝলমল করছে। দীপক গাড়ি থেকে নেমে স্বয়ং দীনবন্ধুবাবুর দ্বারা অভ্যর্থিত হয়। দোহারা চেহারা দীনবন্ধুবাবুর। মোটের ওপর বেশ শক্তিশালী। পরনে দামী তাঁতের ধুতির ওপর সিল্কের পাঞ্জাবি। সোনার বোতাম। সোনার চেন। চোখে রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমা।

—আসুন মিঃ চ্যাটার্জী, so glad to meet you, after all···

—আমিও আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম মিঃ মিত্র। আজকের ফাংশান সাফল্যমণ্ডিত হোক এই আশা করি।

—হ্যাঁ, কোন কিছু নেই হঠাৎ কোত্থেকে একখানা চিঠি এসে হাজির। অবশ্য উড়ো চিঠিকে আমি কোনদিনই গ্রাহ্য করি না। তবু আজ যখন এতগুলি

বিশেষ অতিথি দয়া করে আমার বাড়িতে পদধূলি দিয়েছেন, তখন আজকের উৎসবটি অন্ততঃ যাতে পণ্ড না হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে।

—দেখুন, আমার সাধ্যমত চেষ্টা আমি করব। Protectionএর জন্যে আছে পুলিশ, আমার কাজ কোনও কিছু ঘটলে detection করা। তবু আপনার আমন্ত্রণে যখন উপস্থিত হয়েছি···

—অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে মিঃ চ্যাটার্জী। সত্যি কথা বলতে কি, আপনাকে পেয়ে যেন মনের বল ভরসা অনেকটা বেড়ে গেল।

দীপক কোন কথা বলে না।

দীনবন্ধুবাবু অন্য কাজকর্মের তাড়ায় দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হন।

পাঁচ

—মরণের হাতছানি—

কাছাকাছি শহর থেকে অনেক গণ্যমান্য লোকই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন দীনবন্ধুবাবুর এই ফাংশান উপলক্ষে।

সদর থেকে এস্. ডি. ও., দুজন সাবডেপুটি, স্থানীয় থানার দারোগা এবং আরও কয়েকজন গভর্নমেণ্ট অফিসিয়াল। তাঁদের সঙ্গে দীপক একে একে পরিচিত হলো। বৈজ্ঞানিক মিঃ বাসুও এই ফাংশান উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

সব চেয়ে বেশী আনন্দিত হলো সে স্থানীয় থানার দারোগা মিঃ বটব্যালের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। লম্বা চওড়া বিশালবপু ভদ্রলোক। তার উপর আবার জবরদস্ত পুলিশী পোশাক। মোটামুটি একটা ছোটখাট 'শের-ই-হিন্দ্'এর মত দেখায়।

—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই আনন্দিত হলাম মিঃ বটব্যাল। দীপক সুরু করে।

—হ্যাঁ, আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হয় না কে তাই বলুন ত? যে সব চোর ডাকাত পকেটমারদের ধরে হাজতে পুরি তারা পর্যন্ত বলে, সত্যি দারোগাবাবু, আপনার মধ্যে 'হিউমার' আছে।

ভদ্রলোকের অদ্ভুত ধরণের কথা দীপকের বেশ ভাল লাগে। দীপক ভদ্রলোকের দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে ধীরে ধীরে বলে—যাদের মধ্যে হিউমার নেই, তারা মানুষই নয় মিঃ বটব্যাল। তা ছাড়া যার sense of humour নেই তার ত বুদ্ধিই নেই। আর যার বুদ্ধি নেই, সে কম্প্লিকেটেড্ কেস্ সল্ভ্ করবে কেমন করে?

মিঃ বটব্যাল সুরু করেন—এই যে সারা বছরে একশো আটচল্লিশটা কেস্ সল্ভ্ করেছি, কেউ বলুক দেখি, তার মধ্যে কোথাও এতটুকু ত্রুটি আছে কিনা! আমার কথা হচ্ছে আগে কাজ তারপর অন্য কথা। কিন্তু কাজও আমি করব এমন ভাবে মনে হবে একটা হিউমার। আসলে সবকিছুই করব, অথচ মনে হবে কিছুই করছি না। তাহলে কাল্প্রিট্রা বুঝতেই পারবে না আমি তাদের সন্দেহ করেছি।

—তা ত বটেই। দীপক হাসিমুখে উত্তর দেয়।

—হ্যাঁ, দেখুন না, এই আপনার মতো লোক বলেই ঠিক বুঝতে পেরেছেন। সাধারণ লোকে এসব কি বুঝবে? তারা বলে, বটব্যাল শুধু খায় আর ঘুমোয়। আপনিই বলুন তো, তাদের কথা কি সত্যি? আরে বাবা, একটু বেশী খাই বলে ত আর এমন মারাত্মক কিছু অন্যায় করিনি! আমার কাজ দেখে বিচার কর, আমি কাজের লোক কিনা! তা নয় যতো সব বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান···

—সত্যি আপনি কাজের লোক মিঃ বটব্যাল। আপনার কথার ধরণ দেখেই তা বুঝতে পারছি।

—তা বুঝবেন না? এই দেখুন না, সেবার সেই স্মাগ্‌লিংএর কেস্‌টা…গল্প বলবার জন্যে মিঃ বটব্যাল নড়েচড়ে বসেন। কিন্তু তার আগেই একজন এসে বলে—আপনাদের খাবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে—ওপাশের বাগানে। আপনারা দয়া করে আসুন।

মিঃ বটব্যালের আর গল্প বলা হয় না।

দীপক বলে—আচ্ছা মিঃ বটব্যাল, খাওয়াদাওয়ার পর আপনার সেই ইনটারেস্টিং স্মাগ্‌লিং কেসের গল্পটা শুনব।

খাওয়ার নামে মিঃ বটব্যাল উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন—সেই ভাল। সবার আগে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার। কি বলেন? নিজের রসিকতায় তিনি নিজেই হো হো করে হেসে ওঠেন।

* * * *

খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাটা হয়েছিল অনেকটা বিলিতী ধরণে। সবুজ ঘাসের আস্তরণে ঘেরা মাঠের মধ্যে সার সার সবুজ রঙের বেতের তৈরী চেয়ার পাতা হয়েছিল। চার পাঁচটি চেয়ার এক একটি টেবিলকে ঘিরে। বড় বড় অনেক কটা ডে-লাইট জ্বলছিল—আলোর প্রাচুর্য যেন রাত্রির আঁধারকে বিদ্রূপ করছিল। সবুজ মাঠের চারধার ঘিরে পাতাবাহারের গাছ। আশেপাশে মৌসুমী ফুলের দু চারটি চারা। গাঁদা ফুলের গাছ মাঝে মাঝে। সুগন্ধ ভেসে আসছে প্রবহমান বাতাসে।

পরিবেশটা দীপকের মন্দ লাগল না। আর যাই হোক দীনবন্ধুবাবুর taste আছে বলতে হবে। খাওয়াদাওয়ার আয়োজনও চমৎকার। সবকিছু মিলিয়ে দীপকের বেশ ভালই লাগল।

দীনবন্ধুবাবুর ছোট মেয়ে মিতা এসে হাসিমুখে সকলকে নমস্কার করে দাঁড়াল। তারই জন্মতিথি উৎসব। সকলেই কিছু কিছু presentation এনেছিলেন—সকলের হাত থেকে হাসিমুখে উপহারগুলো নিয়ে নমস্কার জানাল সে। দীপকও এনেছিল ছোট ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত দুখানা বই। তার হাত থেকে বই দুখানা নিয়ে মিতার মুখ খুসীতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

এরপরেই সুরু হলো খাওয়াদাওয়ার পালা। দীনবন্ধুবাবু, তাঁর বড় মেয়ে লীনা, নায়েব বিনয় মল্লিক ইত্যাদি সকলেই অতিথিদের সাথেই খেতে বসেছিলেন—বিলিতী প্রথায় অতিথিদের সাথে গৃহস্বামীকেও খেতে হয়।

খাওয়াদাওয়া প্রায় শেষ হতে চলেছে, এমন সময় একটা অস্ফুট শব্দ শুনে সকলেই চম্‌কে ওঠে। দীপকও মুখ তুলে তাকায় সেদিকে। দীনবন্ধুবাবুর নায়েব বিনয় মল্লিক হঠাৎ আর্ত চীৎকার করে চেয়ারের ওপর লুটিয়ে পড়েন। বারকয়েক অস্ফুট শব্দ করেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি।

সকলে ছুটে এসে তাঁর দেহটা তুলে নেয়। দীপকও ছুটে এসেছিল। সে দ্রুতপায়ে এসে পাল্‌স ফীল্‌ করে দেখে আপন মনেই বলে—ভেরী ফীব্‌ল্‌ পাল্‌স্‌…এক্ষুণি একজন ডাক্তারকে ডাকা উচিত। এ ধরণের আকস্মিক ঘটনায় সকলেই কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে।

আজকের এই আনন্দপূর্ণ পরিবেশে এ ধরণের ঘটনার জন্যে যেন তৈরী ছিল না কেউ। কারও মুখ দিয়ে কোনও কথা বের হয় না। দীপক সোজা উঠে দাঁড়িয়ে বলে—এঁর মৃত্যুর কারণ হার্টফেল। কোনও কারণে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েছে—আমার মনে হয় এটা কোনও বিষের প্রক্রিয়া।

কেউ কোনও কথা বলে না। শুধু দীনবন্ধুবাবু পাংশুমুখে বলেন—কি করে এটা সম্ভব হলো?

দীপক বলে—কাছাকাছি কোনও একজন ডাক্তার পাওয়া যায় কোথায় বলুন ত?

দীনবন্ধুবাবু একজন গোমস্তার দিকে চেয়ে বলেন—দীনেশ ডাক্তারকে শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে আসুন। বলবেন আমি জরুরী কল্‌ দিয়েছি।

—আচ্ছা, আমি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। গোমস্তাটি দ্রুত প্রস্থান করে।

মিঃ বাসু যে বৈজ্ঞানিক তা সকলেই জানত—কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানেও যে তাঁর জ্ঞান আছে এ কথা জানা ছিল না কারও। তিনি এবার এগিয়ে এসে ভাল করে পরীক্ষা

…আমার মনে হয় কোন বিষের প্রক্রিয়া। (পৃষ্ঠা ২৭)

করে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন—এটা হচ্ছে strychnine poisonএর কেস্‌।

যে কোন ভাবেই হোক, strychnine এঁর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেছে বলে মনে হয় আমার।

—কিন্তু কি করে তা সম্ভব? দীনবন্ধুবাবু প্রশ্ন করলেন।

—সেটা আপনারাই আমার চেয়ে ভাল বলতে পারেন।

রুক্ষকণ্ঠে বলে ওঠেন মিঃ বাসু।

দীপক এতক্ষণে কথা বলে—আমার মতে এটা অবশ্যই একটা খুনের কেস্‌—আর এ ধরণের জরুরী একটা কেসের খুব ভাল তদন্ত হওয়া উচিত। মিঃ বটব্যাল, আপনি দেখুন অতিথিরা যেন কেউ এখান থেকে কোথাও না যান। মৃত্যুটা ঠিক বিষের ক্রিয়ায় ঘটেছে কিনা সে বিষয়ে মোটামুটি নিঃসন্দেহ না হলেও আমি সেটাই সন্দেহ করি। কাজেই you are expected to be a bit strict…

—নিশ্চয়ই। মিঃ বটব্যাল যেন হঠাৎ কর্ম্মমুখর হয়ে ওঠেন।

—জিনিসপত্রগুলো যেন নাড়াচাড়া করা না হয়। আর দেখুন এই সব utensilগুলোতেও বিষ থাকতে পারে। কাজেই একটু ভাল করে এগুলো chemical analysis করে দেখতে হবে। দেখবেন এগুলো যেন স্থানচ্যুত না হয়।

অতিথিদের মধ্যে ইতিমধ্যেই কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

দীপক এবার তাই বলে—আপনারা সব দয়া করে আপন আপন জায়গায় বসুন। এভাবে এঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকলে এঁর অবস্থা আরও সংকটজনক হয়ে উঠবে। He should inhale more fresh air…

সকলেই আপন আপন চেয়ারে গিয়ে বসে পড়েন।

ছয়

—চক্র ও চক্রী—

দশ মিনিটের মধ্যে ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন। এর মধ্যে সকলেই একে একে ভিড় ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছিল। নায়েব বিনয় মল্লিককে ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটা বিছানায় শোয়ান হয়েছিল। দীপকের সঙ্গে দারোগা মিঃ বটব্যাল ও ডাক্তার ভদ্রলোকও ভেতরে গেলেন। ভাল করে বিনয় মল্লিককে পরীক্ষা করে গম্ভীরমুখে মাথা নেড়ে তিনি বললেন—আর কোন আশা নেই। তীব্র strychnine poison এঁর শরীরে প্রবেশ করে এঁর মৃত্যু ঘটিয়েছে। তা ছাড়া বিষের পরিমাণ ছিল অনেক বেশী—lethal doseএর চেয়ে অনেক বেশী strychnine এঁর শরীরে প্রবেশ করেছিল। তাই fatal periodএর প্রারম্ভেই মৃত্যু ঘটেছে।

সকলে বাগানে ফিরে আসে।

সেখানে পাংশুমুখে অতিথিরা সব বসে ছিলেন। তাঁদের দিকে চেয়ে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল কি নিদারুণভাবে আঘাত পেয়েছিলেন তাঁরা। এরকম একটা আনন্দ-উৎসব যে এভাবে শেষ হয়ে যাবে তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না কেউই।

দারোগা মিঃ বটব্যাল বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—অজ্ঞান হবার পূর্বে উনি যে সব পাত্রে খাবার খেয়েছিলেন সেগুলো আমাকে সঙ্গে নিতে হবে chemical examinationএর জন্যে। আমার মনে হয় তাতে বিষের trace পাওয়া যাবে।

কেউ কোনও উত্তর দেয় না।

—আর dead bodyও পোস্ট মর্টেমে পাঠাতে হবে। কারণ এটা যে স্বাভাবিক মৃত্যু নয় সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছি।

দীপক উঠে দাঁড়িয়ে বটব্যালের কানে কানে কি যেন কথা বলে।

তিনি বলেন—আপনাদের মধ্যে যাঁদের নাম আমি বলব তাঁরা ছাড়া অন্য সকলেই এখন চলে যেতে পারেন। শুধু তাঁদের আমি গোটাকয়েক প্রশ্ন করব। আর বাড়ির সমস্ত লোকদেরই প্রশ্ন করে দেখতে হবে আমাকে। আশা করি আপনার তাতে কোন আপত্তি হবে না দীনবন্ধুবাবু?

দীনবন্ধুবাবু পাংশুমুখে বলেন—না না, আমার আর তাতে আপত্তি করবার কি আছে?

দীপক বলে—বিনয় মল্লিক যে টেবিলের সাম্‌নে বসে খাবার খাচ্ছিলেন, সেখানে কে কে বসেছিলেন সেটা আমাদের দেখতে হবে। তাঁদের সকলের সম্বন্ধেই মোটামুটি জানতে হবে আমাদের।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল সেই টেবিলেই বিনয় মল্লিকের সঙ্গে খাচ্ছিলেন ঐ অঞ্চলেরই দুজন ভদ্রলোক। এই গ্রাম্য ভদ্রলোক দুজনের নাম কালিপদ মিত্র এবং অপরেশ বসু। তাঁরা দুজনেই এ অঞ্চলের লোক। দীর্ঘদিন ধরে বিনয় মল্লিকের সঙ্গে পরিচয় আছে। আজকের উৎসবের দিনে তাই তাঁরা দুজন বিনয় মল্লিকের সঙ্গে সবচেয়ে কোণের দিকের একটা টেবিলে বসে খাওয়াদাওয়া করছিলেন।

দীপক তাঁদের দুজনের দিকে চেয়ে বলল—আপনারা দুজন ছাড়া অন্যান্য সব অতিথি চলে যেতে পারেন। আপনাদের দুজনকে আমরা গোটাকয়েক প্রশ্ন করব।

অতিথিরা একে একে বিদায় নিলে দীপক দীনবন্ধুবাবুর দিকে চেয়ে বলে—আচ্ছা দীনবন্ধুবাবু, আজকের দিনে রান্নার ভার কার ওপর ছিল?

দীনবন্ধুবাবু বলেন—আজকের সমস্ত রান্না ইত্যাদির ভার ছিল দুজন চাকরের ওপর। তারা দুজনেই রান্না থেকে পরিবেশনের সমস্ত কাজ করেছিল।

—তাদের নাম?

—পঞ্চু আর দীনদয়াল।

—এরা কতদিন আপনার এখানে কাজ করছে ?

—দীনদয়াল কাজ করছে বছর চার পাঁচ হবে। পঞ্চুকে আমি মাত্র চার পাঁচ দিন আগে appoint করেছি। বিশেষ করে আজকের এই ফাংশানের জন্যেই ওকে নিযুক্ত করেছি আমি।

—খুব ভাল। দীপক বলে—ওদের মোটামুটি cross examine করলেই চলবে এখনকার মত। Chemical analysis আর পোস্ট মর্টেম না হওয়া পর্যন্ত এর বেশী এগুনো যাবে না।

—তাহলে আপনারা কি করবেন এখন ? দীনবন্ধুবাবু প্রশ্ন করেন।

—আমরা ওপাশের একটা ঘরে বসছি। আগে এই ভদ্রলোক দুজনকে গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করব—তারপর অন্যদের প্রশ্ন করা যাবে।

—ধন্যবাদ। যেমন করে হোক চেষ্টা করুন তাড়াতাড়ি আসল কাল্‌প্রিটকে যাতে ধরা যায়। আমি কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়েছি—দীনবন্ধুবাবু আপন মনেই বলেন।

দীপক দীনবন্ধুবাবুর দিকে চেয়ে বুঝতে পারে তিনি ভীষণভাবে ভয় পেয়েছেন।

—আমি বিশেষভাবে চেষ্টা করব দীনবন্ধুবাবু, দীপক বলে—আপনি যখন আমাকে এখানে invite করে এনেছেন, তখন আমার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত, and I will try my best. কিন্তু আর যাই হোক, আমি ত আর দেবতা নই। আমাকেও প্রমাণের ওপর এগোতে হয়।

দীপক মিঃ বটব্যালের সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে বসে উপস্থিত অতিথি দুজন এবং অন্য সকলকে প্রশ্ন করবার জন্যে।

* * * *

কালিপদ মিত্র হচ্ছেন স্থানীয় স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার। মাঝারি চেহারা

ভদ্রলোকের। দোহারা। গায়ের রং ঘন কালো। মুখের দিকে চাইলেই মনে হয় তিনি দিবারাত্র কি যেন ভাবছেন।

দীপক এবং মিঃ বটব্যালকে নমস্কার করে তিনি এসে দাঁড়ান পাংশুমুখে।

—বিনয় মল্লিকের সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয় ? দীপক প্রথম প্রশ্ন করে।

—প্রায় বছর চার পাঁচ হবে।

—কি ভাবে আপনার পরিচয় হলো তাঁর সাথে ?

—দীনবন্ধুবাবু স্কুলের সেক্রেটারী। স্কুলের ছোটখাট ব্যাপারে তাঁর দেখা পাওয়া যায় না—সে সব কাজকর্ম আমরা বিনয়বাবুর সাহায্যেই করতাম। বিনয়বাবু শুধু মাত্র নায়েবই ছিলেন না, তিনি ছিলেন দীনবন্ধুবাবুর ডান হাত।

—দীনবন্ধুবাবু কি ধরণের লোক বলে মনে হয় আপনার ?

—মোটামুটি ভাল বলেই মনে হয়। অল্পদিন আমি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তার মধ্যে অবশ্য বিশেষ কিছু···

কালিপদবাবু থেমে যান।

—চুপ করে রইলেন যে ? আপনার উত্তরটা সম্পূর্ণ হলো না।

—সবটুকু না শুনে কোনও বিষয়ে মত প্রকাশ করা উচিত নয়। তা ছাড়া সাধারণ লোকে যা বলে তা যে সব সময় সবটুকু ঠিক তা আমি স্বীকার করি না।

—বিনয় মল্লিককে আপনার কি রকম মনে হয় ?

—খুব চাপা। মনের সব কথা ধরা যেত না। তবে একমাত্র উনিই ছিলেন দীনবন্ধুবাবুর সবচেয়ে পুরোনো কর্মচারী।

—আচ্ছা, সম্প্রতি দীনবন্ধুবাবু একখানা ভয়-দেখানো চিঠি পেয়েছিলেন বলে শুনেছি। সে সম্বন্ধে বিনয়বাবু কি আপনাকে কিছু জানিয়েছিলেন ?

—কিছুমাত্র না। সত্যি কথা বলতে কি বিনয়বাবু, দীনবন্ধুবাবু কেউ এবিষয়ে কোনও গুরুত্ব দেননি। কিন্তু···

—আচ্ছা, আপনি ত বিনয়বাবুর সঙ্গে একই টেবিলে বসে খাচ্ছিলেন। খাবারের সঙ্গে কেউ কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল এমন কিছু আপনার চোখে পড়েছে কি ?

—আমার মনে হয় সরবতের মধ্যেই বোধ হয় কিছু ছিল। কারণ সরবতের গ্লাসে চুমুক দেবার পরেই হঠাৎ উনি অস্ফুট শব্দ করে লুটিয়ে পড়েন।

—সে সমস্তই পরীক্ষা করে দেখব আমরা। আচ্ছা আপনি এখন যেতে পারেন। অপরেশবাবুকে একবার পাঠিয়ে দিন। তাঁকেও কয়েকটা প্রশ্ন করব আমরা।

* * * *

অপরেশবাবুর সাথে বিনয় মল্লিকের পরিচয় দীর্ঘদিনের। তাঁর কাছ থেকেই দীপক পুরোনো দিনের মোটামুটি পরিচয় জানতে পারে—জানতে পারে দীনবন্ধু মিত্রের পরিচয়। অতীত ইতিহাস। জমিদার-পুত্র রণেন্দ্রনাথের কাহিনী। সমস্ত বিষয়টা মিঃ বটব্যালকেও যথেষ্ট পরিমাণে কৌতূহলী করে তোলে। সব শুনে তিনি বলেন—পুরোনো দিনের সাথে বর্তমানের যথেষ্ট সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় আমার।

—কিন্তু কি সম্পর্ক তা আমি ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না। দীপক বলে। কে এই ছদ্মবেশী রহস্যের মেঘনাদ ?

—That's the thing which we will have to find out—সেই জিনিসটাই আমাদের ঠিক খুঁজে বের করতে হবে! কিন্তু আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।—মিঃ বটব্যালের চোখে-মুখে চিন্তার ছায়া ঘনায়।

সাত

—ছদ্মবেশী মেঘনাদ—

রান্নার ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল দুজন চাকর—পঞ্চু আর দীনদয়াল। পঞ্চু সম্প্রতি কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। দীনদয়াল দীর্ঘদিনের পাচক। পঞ্চুকেই প্রথম জেরা করবার জন্যে ডেকে পাঠালেন মিঃ বটব্যাল।

পঞ্চুর চেহারা রোগা। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। একটা রুক্ষ বিবর্ণতা তার সারা দেহে।

—কতদিন এখানে কাজ করছ ? মিঃ বটব্যাল প্রশ্ন সুরু করেন।

—পাঁচ ছ দিন হলো হুজুর। আজকের উৎসবের জন্যেই বিশেষভাবে আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

—দীনবন্ধুবাবুকে তুমি কি আগে থেকে চিনতে ?

—না হুজুর। অনুরাধা মা আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

—এর আগে কাজ করতে কোথায় ?

—অপরেশবাবুর বাড়িতে।

—সেখানে কতদিন ছিলে ?

—দু বছর হবে।

—বিনয় মল্লিককে তোমার কি রকম মনে হয় ?

—অল্পদিন হলো তাঁর সঙ্গে পরিচয়। মোটামুটি লোক ভাল বলেই মনে হয় হুজুর। তবে ভেতরে ভেতরে তিনি একটু ফন্দিবাজ ধরণের লোক ছিলেন বলে মনে হয় আমার।

—তোমার এই রকম ধারণার কারণ ?

—দিন দুয়েক আগে তিনি ইস্‌মাইল সর্দারের সঙ্গে গোপনে কি যেন কথা-বার্তা বলছিলেন বলে মনে হলো আমার। তা ছাড়া এই গাঁয়েরই ভজহরি পাগলের

সঙ্গে মাঝে মাঝে উনি গোপনে নানা ধরণের কথাবার্তা বলতেন দেখে
অবশ্য তা থেকেই কোন কিছু একটা ধারণা করতে পারিনি আমি।

—ভজহরি পাগলের সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা ?

—গত দু বছর ধরেই ওকে এই গাঁয়ে দেখছি আমি। গান গেয়ে গে
পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

—ভজহরির আগের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন কিছু জান ?

—না হুজুর। গত দু বছরই আমি ওকে এমনি পাগল অবস্থাতেই দেখছি
তবে মিঃ বাসুর বাড়ির সামনে ওকে বেশী ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়।

—বৈজ্ঞানিক মিঃ বাসুর সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা ?

—গ্রামের কোন লোকেরই তাঁর সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট ধারণা নেই—ক
গ্রামের কোন লোকের সঙ্গে তিনি খুব বেশী মিশতে ভালবাসেন না। লো
বলে উনি নিরালায় কি যেন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করে
তবে ময়নামতীর মাঠের ধারে তিনি কেন যে তাঁর বাংলো তৈরী করে
করছেন এ বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না।

মৃদু হেসে মিঃ বটব্যাল বলেন—এ ধরণের রহস্যময় লোকদের সম্বন্ধে অনে
কিছুই রটতে পারে। But I don't believe in all these মিঃ চ্যাটার্জী

দীপক এ কথার কোনও উত্তর দেয় না।

* * * *

দীনদয়ালকে খুব বেশী প্রশ্ন করা হয় না। দীপক শুধু খাবার সার্ভ ক
নিয়ে তাকে ছোটখাট কতকগুলি প্রশ্ন করে।

তার কথা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় খাবারের সঙ্গে strychnine মে
ত দূরের কথা, বিষটার নাম পর্যন্ত সে শোনেনি। হাঁউমাঁউ করে কাঁদ
কাঁদতে সে যা জানাল তার অর্থ হচ্ছে, গত দশ বছরের মধ্যে সে কোন অন
কাজ করেনি। অতএব পুলিশ যেন হত্যাব্যাপারে তার ওপর সন্দেহ না করে

মিঃ বটব্যাল চিরদিন একটু রসিক প্রকৃতির লোক। তিনি হেসে বললেন—একে থানায় নিয়ে গিয়ে কিছুটা ঠাণ্ডি দাওয়াই দেওয়া যাক, কি বলেন মিঃ চ্যাটার্জী ?

দীপক হেসে উত্তর দেয়—তাহলে বাড়িশুদ্ধ সবাইকেই আপনার দাওয়াইয়ের জন্যে ধরে নিয়ে যাওয়া উচিত মিঃ বটব্যাল। এই সমস্ত আমাদের মিথ্যা চেষ্টা বলে প্রতীয়মান হবে, যতক্ষণ chemical analysis-এর রিপোর্ট না পাওয়া যাচ্ছে। কোথা দিয়ে শরীরের মধ্যে poison প্রবেশ করেছে তা না জেনে কোন কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছতে রাজী নই আমি।

দীনদয়ালকে আর কোন প্রশ্ন না করেই ছেড়ে দেওয়া হলো।

সবার শেষে আহ্বান করা হলো দীনবন্ধুবাবুকে। মিঃ বটব্যাল কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই দীপক বলল—আপনাকে যে কটা প্রশ্ন আমি করব তার প্রত্যেকটি essential—আশা করি কোন মিথ্যা উত্তর দেবেন না। আপনার কথার ওপরেই সমস্ত কেস্‌টা balance করছে।

—আমার যতোটা জানা আছে সত্যি কথাই বলব আমি। উত্তর দিলেন দীনবন্ধু মিত্র।

—যে ভয়-দেখান চিঠিটা আপনি সর্বপ্রথম পেয়েছিলেন তার হাতের লেখাটা কি আপনার পরিচিত বলে মনে হয়নি ?

—সত্যি কথা বলতে কি, লেখাটা বহুদিন আগে কোথায় যেন দেখেছিলাম বলে বার বার মনে হচ্ছিল আমার। কিন্তু সঠিক কোথায় যে দেখেছি তা মনে করে উঠতে পারছিলাম না।

—আচ্ছা, মৃদু হেসে দীপক বলে—সে লেখাটা কি আপনার কাছে আছে ?

—হাঁ, যদি কোন কাজে লাগে এই ভেবে আমি রেখে দিয়েছি। যদি আপনারা বলেন তবে দিতে পারি সেটা।

—আচ্ছা ওটা আমরা নেব। এখন আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে আ-
দের নব-নিযুক্ত চাকর পঞ্চানন সম্বন্ধে। এই পঞ্চানন ওরফে পঞ্চু লোক
সুবিধের বলে মনে হলো না আমাদের। ওর প্রত্যেকটি কথার মধ্যেই এ
না-একটা ইঙ্গিত আছে, আর সেগুলো খুব ভাল বলে মনে হয় না।

—সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারি না কারণ ওকে মাত্র কিছুদিন আ
নিযুক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া চাকর বা পাচককে খুব বেশী পরীক্ষা ক
দেখা হয় তখনই যখন তাকে দীর্ঘদিন ধরে রাখা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু
আজকের ফাংশানের জন্যেই পঞ্চাননকে নিযুক্ত করা হয়েছিল অস্থায়ীভা
কাজেই ওর সম্বন্ধে খুব বেশী পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজনীয়তা আমার
আসেনি।

—ভাল কথা, ভজহরি বলে এ গ্রামে একজন পাগল আছে?

—হ্যাঁ।

—তার সম্বন্ধে কি ধারণা আপনার?

—বিশেষ কিছু নয়। মাথার গোলমাল হয়েছে অনেকদিন। খুব
পয়সাকড়ি নেই ওদের। তাই খুব ভাল চিকিৎসাপত্রও হয়নি। তবে মনে
তার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোনও যোগাযোগ নেই।

—আচ্ছা, বৈজ্ঞানিক মিঃ বাসু সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?

—তিনি একজন মিস্‌টিরিয়াস্ ম্যান্, বিচিত্র তাঁর প্রকৃতি। অদ্ভুত খ
খেয়ালী। কাজেই তাঁর সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব
তিনি নিজেকে যেন কিছুটা রহস্যের আড়ালে রাখতে ভালবাসেন বলে মনে
আমার। কিন্তু কেন তা জানি না। After all, আমার মনে হয় এ কে
তিনি অপ্রয়োজনীয়।

মৃদু হেসে দীপক বলে—কে কতটা প্রয়োজনীয় আর কে অপ্রয়োজনীয়

ধারণা আপনার নেই মিঃ মিত্র। আমি অবশ্য মিঃ বাসুর কথাই বিশেষভাবে বলছি না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আগে থাকতেই কোনও বিষয়ে কিছু ধারণা করতে চাই না আমি। যাক, কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত আমি আর কিছু বলতে পারি না। আপনাকে আর অনর্থক কতকগুলো প্রশ্ন করে লাভ নেই। আপনি দয়া করে আপনার সেই ভয়-দেখান চিঠিটা আমাদের একটু দেখান। যদি আপনার আপত্তি না থাকে আমরা ওটা নিয়ে যেতে চাই।

—না না, এতে আর আপত্তি কি আছে! আমি এক্ষুণি ওটা এনে দিচ্ছি।

মিঃ মিত্র চিঠিটা আনবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

আট

—মৃত্যু-উৎসব—

পোস্ট মর্টেম আর কেমিক্যাল অ্যানালিসিস্ রিপোর্টটা ঠিক যে ধরণের হবে বলে আশা করেছিলেন মিঃ বটব্যাল, সেটা আদৌ সে রকম না হওয়াতে তিনি শুধু বিস্মিত হন না, কিছুটা যেন বিরক্তও হয়ে ওঠেন নিজের ওপর।

পোস্ট মর্টেম লিখছে strychnine poisonএর ফলে মৃত্যু। সেই সঙ্গে কতকগুলি গৎ লেখা—cyanosis, palors, death due to sudden failure of the heart ইত্যাদি। কিন্তু সেই বিষটা যে কোন্ দিক দিয়ে শরীরে প্রবেশ করেছে সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছুই লেখা ছিল না। মিঃ বটব্যাল সেটা পড়ে মুখ বিকৃত করে বললেন—all bogus. এ রকম রিপোর্টের কোন অর্থ হয়! এর থেকে এমন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না যাতে রহস্যের কোনও সমাধান করা যেতে পারে।

দীপক মৃদু হেসে বলে—এত উত্তেজিত হয়ে উঠছেন কেন মিঃ বটব্যাল! আপনি আমাকে দু দিন বৈদ্যবাটিতে আটকে রেখেছেন কেস্‌টা সল্‌ভ্‌ করার জন্যে। আপনি কি ভাবেন আমি শুধু এই রিপোর্টের ভরসাতেই বসে আছি।

—সেকি, আপনি কি তবে আরও কোন ক্লু সংগ্রহ করেছেন নাকি?

—নিশ্চয়ই।

—সেটা কি?

—যথাসময়ে বলব। আপনি আগে কেমিক্যাল অ্যানালিসিস রিপোর্টটা পড়ে ফেলুন দেখি। আমার মনে হয় এর থেকেও কোন ক্লু নিশ্চয়ই মিলবে।

কেমিক্যাল অ্যানালিসিস্‌ রিপোর্টটা আগাগোড়া পড়ে মিঃ বটব্যাল যেন আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাতে লেখা আছে—সমস্ত জিনিষপত্র, utensils সব কিছু পরীক্ষা করে কোনও বিষ পাওয়া যায়নি।

—অসম্ভব! মিঃ বটব্যাল যেন গর্জে ওঠেন। অমনি তাঁর শরীর এবং মোটা মতো, তার ওপর এসব ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে তিনি যেন হাঁপাতে সুরু করে দেন।

—কি অসম্ভব মিঃ বটব্যাল?

—এই রিপোর্টে যা বের হয়েছে।

—তার মানে?

—মানে অতি পরিষ্কার। তাঁরা একটু কষ্ট করে ভালভাবে পরীক্ষা করেননি। তা নইলে লোকটা মরল বিষের ক্রিয়ায় আর কোথায়ও একটু বিষ পাওয়া গেল না! খাবারের মধ্যে বিষ না থাকলে…

—পৃথিবীতে অনেক সম্ভবই আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয় মিঃ বটব্যাল। এর জন্যে আপনার দুঃখ করবার কিছুই নেই। দীপক যেন মিঃ বটব্যালকে সান্ত্বনা দেয়।

—তাদের সাথে আপনিও বিশ্বাস করেন খাবারের মধ্যে কোন বিষ ছিল না?

—নিশ্চয়ই করি।

—তবে বিষটা এলো কোত্থেকে বলতে পারেন?

—সেটা ক্রমশ বের হবে, কিংবা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।

—কি করে এমন অসম্ভব সম্ভব হলো? আশ্চর্য! আচ্ছা, আপনার এ ধারণার কারণ?

মিঃ বটব্যাল যেন আরও উত্তেজিত হয়ে উঠেন। (পৃষ্ঠা ৪০)

—কারণ পঞ্চু আর দীনদয়ালকে জেরা করে আমি বুঝতে পেরেছি ওরা খাবারের সঙ্গে বিষ মেশায়নি।

—Then how is it possible ? And who is the culprit ? মিঃ বটব্যাল জোরে কথাগুলো বললেন। মনে হলো তিনি কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়েছেন। দীপক শুধু মৃদু হেসে তাঁর এই অবস্থা লক্ষ্য করে।

* * * *

সেই দিনই রাত প্রায় সাড়ে বারোটা কি একটা।

দীপক সন্ধ্যার পরেই কোথায় বেরিয়ে গিয়েছিল। মিঃ বটব্যাল তা জানতেন না। তিনি নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছিলেন, এমন সময় বার বার কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল তাঁর।

তিনি সোজা উঠে দরজা খুলে দিলেন। একজন কনস্টেবল এসে সেলাম ঠুকে বলল—স্যর, আপনাকে কে যেন নিচে খুঁজছেন।

—সেকি ? কে খুঁজবে আমাকে ?

—জানি না। বললেন দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ি থেকে এসেছেন।

—চল দেখি।

মিঃ বটব্যাল সোজা নিচে নেমে এসে দেখেন একজন গোমস্তাশ্রেণীর লোক বসে। চুল উস্কোখুস্কো। সারা ভঙ্গীর মধ্যে একটা আতঙ্কজনক ভাব।

—কি ব্যাপার বলুন ত ? মিঃ বটব্যাল প্রশ্ন করেন।

—মারাত্মক ব্যাপার হুজুর। জমিদারবাবু আমাকে পাঠালেন। আজ রাত সাড়ে দশটার সময় ময়নামতীর মাঠের ধারে ইস্‌মাইল সর্দারকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

—সেকি ? ইস্‌মাইল সর্দার মানে জমিদারবাবুর লাঠিয়ালদের সর্দার ত ?

—হ্যাঁ। সাধারণত সেই ওধারে যায় খাজনা আদায় করবার জন্যে। আজ

কি একটা কাজে একা যাচ্ছিল ওধার দিয়ে। হাতে লাঠি নিয়ে সে এবা চলাফেরা করতেই অভ্যস্ত। কাউকে বিশেষ ভয় করে না—গ্রামের মধ্যেও বিশেষ আসে না। সত্যি কথা বলতে কি হুজুর লাঠি হাতে থাকলে ও একাই একশো। কিন্তু তার মত জবরদস্ত পালোয়ানকে যে কে হত্যা করতে পারে ভাবতেই পারি না।

মিঃ বটব্যাল আপন মনেই বিড়বিড় করে বলেন—অভিশপ্ত ময়নামতীর মাঠ ! কি কুক্ষণে যে এখানে বদলী হয়ে এসেছিলাম ! এখন চাকরী রক্ষা করতেই প্রাণান্ত আর কি !

—একবার দেখবেন স্যর ? গোমস্তাটি মুখ কাঁচুমাচু করে প্রশ্ন করেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম একটা কেস যখন ঘটেছে আমার এলাকায় তখন দেখতেই হবে আমাকে। কিন্তু আমি শুধু ভাবছি, কে সেই ছদ্মবেশী মেঘনাদ যে মেঘের আড়াল থেকে এভাবে একের পর এক সাংঘাতিক কাজগুলো করে চলেছে !

মিঃ বটব্যাল বেশভূষা পরে তৈরী হয়ে রওনা হন। কিন্তু সেখানে একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্যে। কোথা থেকে যেন দীপক এত রাতে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

—কোথায় চলেছেন মিঃ বটব্যাল ? দীপক প্রশ্ন করে।

—ইস্‌মাইল সর্দারের মৃত্যুর তদন্ত করতে। উঃ, ভাগ্যে এ কি দুর্ভোগ এসে জুটল বলুন দেখি মিঃ চ্যাটার্জী !

—আমিও ভাবছি সে কথা। ইস্‌মাইল সর্দার আর বিনয় মল্লিকের পর পর মৃত্যু। এ যে একটা অদৃশ্য যোগাযোগ। আর তার লিঙ্ক মিলতে পারে মাত্র একটি সূত্র ধরে ভাবলে।

—আপনি যাবেন আমার সঙ্গে ?

—আপত্তি নেই, চলুন I am ready…

দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে।

নয়

—অদৃশ্য সংকেত—

অভিশপ্ত ময়নামতীর মাঠ। পনের বছর আগে একদিন তার বুকে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, সেদিন যদি সেখানেই তা থেমে যেত তবু সে অভিশাপ হয়ত ধীরে ধীরে মানুষের মন থেকে মুছে যেতে দেরী হতো না।

কিন্তু আজ, এই দীর্ঘদিন পরে আবার যে মৃত্যুর উৎসব ঘটল তার বুকে তার জন্যে দায়ী কে? কে প্রকৃত অপরাধী? সে সব কথা নিয়ে চিন্তা করবার মতো মনের অবস্থা একমাত্র দীপক ছাড়া আর কারও ছিল না। মাঠের একদিক ঘেঁসে সেই ছোট জলা। এককালে সেখানে শালুক শোভা পেত, আজ তা যেন কোন্ পেত্নীর বিষাক্ত নিশ্বাসে উধাও হয়ে গেছে। আজ সেখানে শুধু শোভা পাচ্ছে একটি মৃতদেহ। গলায় গভীর ক্ষত। সেখান থেকে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে বিলের জল স্পর্শ করেছে। চোখ মুখ বসে গেছে। সারা দেহ জুড়ে মৃত্যুর ভয়াবহ কালিমা। সব কিছু মিশে যেন কোন অদৃশ্য অভিশাপের সংকেত।

গাড়ি এসে দাঁড়াল সেই জায়গাটা থেকে কিছুটা দূরে। গাড়ি থেকে নামলেন মিঃ বটব্যাল, দীপক আর জমিদারবাড়ির সেই গোমস্তাটি। টর্চলাইটের আলো ফেলে মৃতদেহটির কাছাকাছি এগিয়ে গেলেন তাঁরা। সমস্ত জায়গাটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে দীপক মৃদু হেসে বলে—বুদ্ধিমানের সঙ্গে বুদ্ধিহীনের পার্থক্য কতটা এবারকার হত্যাকাণ্ডটাই তার প্রমাণ।

—তার মানেটা? মিঃ বটব্যাল প্রশ্ন করেন।

—মানে অতি সোজা। আপনি সেটা ঠিক খুঁজে না পেলেও আমার চোখে এবার অনেকগুলো ক্লু বেশ স্পষ্টই ভেসে উঠেছে। তাই মনে হচ্ছে গতবার খুনী যেমন কোন ক্লু না রেখে বুদ্ধিমানের মত মার্ডার করেছিল এবারে তা পারেনি।

—তার মানে গতবারের খুনী আর এবারের খুনী কি এক লোক নয়?

—অবশ্যই নয়। হয়ত brain এক হতে পারে, কিন্তু…

—এবারের খুনী সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?

—এই দেখুন ভিজে মাটির ওপর তার পায়ের ছাপ বেশ স্পষ্ট। ঠিক পায়ের নয়, মৃত্যুর ছাপ। আর তাই দেখুন একটু দূরে হত্যা করে দেহটাকে এখানে টেনে আনা হয়েছে।

—কই দেখি, তাই ত!

—এই দেখুন গলার wound দেখে বোঝা যায় কি ধরণের অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। It's a sort of perforating weapon কোনও ধারাল অস্ত্র দিয়ে সোজা ছিদ্র হবার চিহ্ন বেশ স্পষ্ট।

—So nice…এবার বাছাধন হাড়ে হাড়ে টের পাবেন কিভাবে তাঁকে খুঁজে বের করে কাঠগড়ায় হাজির করতে হয়। যখন এত বড় important ক্লুগুলো খুঁজে পাচ্ছি, তখন আসামীকে খুঁজে পেতেও দেরী হবে না।

—তা না হয় হলো, কিন্তু একটা বিষয়ে বেশ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে ক্রিমিন্যাল। যে অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে সেটা সে চালাকি করে সরিয়ে ফেলেছে। Here I admire him—তাকে সত্যিই প্রশংসা করি আমি। সেটা থাকলে তার আঙুলের ছাপটা পাওয়া যেত, আর তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে detect করতেও অসুবিধে হতো না আমার।

—যাক, এখন মৃতদেহটা কি এক্ষুণি পোস্ট মর্টেমে পাঠান উচিত মিঃ চ্যাটার্জী?

—তা ত বটেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন হত্যা করে দেহটা জলার ধার পর্যন্ত টেনে আনা হলো। আর কি করে ইস্‌মাইল সর্দারের মতো বলবান লোককে মাত্র একজন লোকই হত্যা করল।

—মাত্র একজন তা কি করে বলছেন? মিঃ বটব্যাল প্রশ্ন করেন।

—That's easy to think মিঃ বটব্যাল। এই দেখুন না মাত্র এক জোড়া পায়ের দাগ। বেশী লোক থাকলে আরও বেশী দাগ আমরা নিশ্চয়ই

পেতাম। যদিও আর বেশী কিছু আপাতত বোঝা যাচ্ছে না, শুধু এখন খুঁজে বের করতে হবে অপরাধীর মোডাস্ অপারেণ্ডি—অর্থাৎ পর পর দুটো খুনের উদ্দেশ্য কি ?

*　　*　　*　　*

আবার জমিদার দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ির সাম্‌নে এসে দাঁড়াল পুলিশের গাড়ি। এর আগেই অবশ্য লাসটা চালান করে দেওয়া হয়েছিল পোস্ট মর্টেমের জন্যে।

গাড়ি থেকে নেমেই দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি উদ্বিগ্ন মনে পায়চারি করছিলেন। কি যেন একটা অদ্ভুত চিন্তা সারা মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

—আসুন মিঃ চ্যাটার্জী! গুড্ ইভনিং মিঃ বটব্যাল! সত্যি আমি ধারণা পর্যন্ত করতে পারছি না, কি করে অদৃশ্য আততায়ীর পক্ষে একের পর এক এই ধরণের কাজগুলি করা সম্ভব হচ্ছে।

—আমিও না, বললেন মিঃ বটব্যাল। সত্যি বলতে কি, আমার মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই আপনার বাড়িতে এমন কোনও hidden treasure আছে যার জন্যে ওদের এমনি একটা হত্যালোলুপতা।

দীপক কোন কথা বলে না।

দীনবন্ধু মিত্র সুরু করেন—সত্যি কথা বলতে গেলে, আমি যেন কেমন পার্টার্বড্ হয়ে পড়েছি মিঃ বটব্যাল। আমার মনে হয় ওরা যেন কোনও প্রতারিত দীর্ঘশ্বাস। অভিশাপের মতো আমাকে দিবারাত্র অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে।

দীপক এবার বলে—আপনি কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি করছেন বলে মনে হচ্ছে মিঃ মিত্র!

—তার মানে ? ভ্রূ কুঁচকে মিঃ মিত্র প্রশ্ন করেন। একের পর এক এই

ধরণের ঘটনায় আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি, আর এ সময় আপনি এমন কথা ভাবতে পারলেন ? আমি মনে প্রাণে বুঝতে পারছি, সেই অদৃশ্য শত্রুর দল কি ভয়ানক ভাবে আমার ক্ষতি করতে প্রবৃত্ত হয়েছে।

—তার মানে ? মিঃ বটব্যাল একটু যেন ঘাবড়ে যান।

—মানে অতি সহজ। আমার জীবনে যেন মস্ত বড় একটা কালরাত্রি ঘনিয়ে এসেছে। তার ছায়া আমার জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে গ্রাস করতে উদ্যত। It is terrible, I understand—দীনবন্ধু মিত্র অবশ্য তাতে ভয় পায় না। কিন্তু তবু শয়তানের দল মনে করে আমি তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করব। বিনয় মল্লিক মরেছে ক্ষতি নেই, সর্দার গেলে আমার লাঠির জোর কমে যেতে পারে, কিন্তু এখনও রয়েছে আমার লাইসেন্স-করা বন্দুক···

বাধা দিয়ে দীপক বলে—আপনি এত নার্ভাস হয়ে পড়ছেন কেন মিঃ মিত্র ? দুজন লোককে হত্যা করেছে বলে ওরা আপনাকেও হত্যা করবার চেষ্টা করবে এ রকম ধারণার কারণ কি ?

—শুধু আমার ওপর নয় মিঃ চ্যাটার্জী, ওরা চায় আমার পরিবারকে নিঃশেষে ধ্বংস করতে। They want to ruin my entire tradition—কিন্তু তা হয় না, হতে পারে না, আমি তা হতে দেব না!

—কিন্তু আপনি কি এ সবের উৎস জানেন না মিঃ মিত্র ?

—জানব না কেন! একটু ভুল বোঝবার ফলেই এটা হচ্ছে। কিন্তু কে যে সেই ছদ্মবেশী আততায়ী তা বুঝতে পারলে কি আর আমি চুপচাপ বসে থাকতাম! যাক, আপনি আমাকে আর বিরক্ত করবেন না মিঃ বটব্যাল। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। আমি আর বেশী জেরা সহ্য করতে পারব না। আমি চাই না আর এগিয়ে যেতে। প্রতিহিংসা আমি চাই না, আমি চাই ওদের কর্মপদ্ধতি বন্ধ করতে। সেজন্য যেটুকু করা প্রয়োজন আমি তাই করতে চাই।

—কিন্তু ওরা ধরা না পড়লে ওদের কাজ বন্ধ করতে আপনি পারবেন না মিঃ মিত্র। দীপক বলে।

—তাহলে আপনি আমাকে কি করতে বলেন ? দীনবন্ধু মিত্র প্রশ্ন করেন।

—আমি বলি আপনি আপনার বাড়িতেই থাকুন। আমাদের তরফ থেকে যাতে আপনাকে ভালভাবে পাহারা দিয়ে নিরাপদ রাখা হয় সে চেষ্টা আমরা অতি অবশ্য করব।

—বেশ, এতে আমার আপত্তি কিছু নেই।

—আর একটা কথা···

—বলুন।

—আমরা আপনার এবং আপনার পরিবারকে save করবার জন্যে যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চাইব আপনি তাতে বাধা দিতে পারবেন না।

একটু ভেবে মিঃ মিত্র বলেন—কিন্তু এভাবে unconditionally surrender করবার আগে কি আপনি আমাকে একটু ভাববার সময় দিতেও রাজী নন মিঃ চ্যাটার্জী ?

—সে সময় দিতে আমি নিশ্চয়ই রাজী আছি। বেশ তাহলে কালকেই আপনি কথা দেবেন। আশা করি এর মধ্যে নিশ্চয়ই আপনার বা আপনার পরিবারের কোন অমঙ্গল ঘটবে না।

—সে রকম অবশ্যই আশা করি।

—তাহলে আপনার নিশ্চয়ই আর ভয় করবার কিছু নেই মিঃ মিত্র। আমরা যখন আছি, তখন···মিঃ বটব্যাল যেন আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে ওঠেন।

মিঃ মিত্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুজনেই গাড়ীতে উঠে বসে।

দশ

—ভজহরি কে ?—

গান গেয়ে ফেরে পাগল ভজহরি। গাঁয়ের লোক বলে ভজা পাগ্‌লা। হ্যাঁ, ভজহরি আজ সত্যিই পাগল। অন্ততঃ সাধারণ মানুষের যতটা বুদ্ধিশুদ্ধি জ্ঞানগম্যি থাকে তা তার নেই।

কিন্তু সত্যিই কি সে চিরদিন এমন ছিল ? না, অল্প কিছুদিন আগেও সে পাগল ছিল না। তার বুদ্ধির কোনও আড়ষ্টতা ছিল না। সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের ছেলে ছিল সে ; লেখাপড়াও জানত কিছুটা।

সে আজ বহুদিন আগেকার কথা। জমিদার-পুত্র রণেন্দ্র তখন স্কুলে পড়ত। ভজহরি সেই সময় থেকেই ছিল তার সহপাঠী বন্ধু। দুজনের মধ্যে খুবই অন্তরঙ্গতা ছিল।

কিন্তু খুব বেশী উচ্চশিক্ষা ভজহরি পায়নি। তাই রণেন্দ্র যখন কোল্‌কাতায় গেল উচ্চশিক্ষা পাবার জন্যে, তখন থেকেই ভজহরির সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি। তবে সাময়িকভাবে ছাড়াছাড়ি হলেও তা ভজহরির মনের ওপর রেখা ফেলতে পারেনি। চিঠিপত্র চলত দুজনের মধ্যে।

তারপর কেটে গেল সেই অভিশপ্ত কালরাত্রি।

রণেন্দ্র প্রেরিত হলো কারাগারে। ভজহরির সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক ছিল না তার। দীর্ঘদিন দুজনের কাটল এমনি বিচ্ছেদের মধ্য দিয়েই।

অবশেষে হঠাৎ কি যেন মাথার গোলমাল সুরু হলো ভজহরির। ডাক্তারেরা দেখে মত দিলেন, পাগল হয়ে গেছে সে। তার চিকিৎসা করতে হলে তাকে কোল্‌কাতায় নিয়ে যাওয়া উচিত।

কিন্তু ভজহরিকে কোল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে অর্থব্যয় করে চিকিৎসা করবার

মতো প্রচুর অর্থ ভজহরির বাবার ছিল না। তাই সে যথারীতি গাঁয়েই বা করতে লাগল। তা ছাড়া তার পাগলামির লক্ষণও এমন কিছু উৎকট ছি না। তাই সুদূর কোল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করবার প্রয়োজনও অনুভ করল না কেউ।

এমনি ভাবেই দিন কাটছিল।

ইতিমধ্যে গাঁয়ের বুকে ঘটল দারুণ দুর্ঘটনা। পর পর দুটি হত্যা সংঘটি হলো গাঁয়ের বুকে। আর সেই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন লোকের সঙ্গে ভজহরির ঘনিষ্ঠতা প্রমাণিত হলো। তাই গাঁয়ের লোক ভজহরি সম্পর্কে বিশে কোনও সন্দেহ পোষণ না করলেও পুলিশমহল যে তার ব্যাপার নিয়ে যথে কৌতূহলী হয়ে উঠল তা বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল।

আর ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর চোখও যে হঠাৎ কেন ভজহরির ওপর গিয়ে পড়েছিল তা বোধ হয় সে নিজেও ভাল করে জানত না। সেদিন সকালে হঠাৎ দেখা গেল ভজহরিকে ময়নামতীর মাঠ থেকে কিছু দূরে একটা বটগাছের ছায়ায় বসে গান করতে। বেলা তখন সাড়ে আটটা কি নটা হবে।

ভজহরি বসে বসে আপন মনে গুন্ গুন্ করে কি যেন গান গাইছিল। তার পায়ে কতকগুলো কাপড়ের পট্টি বাঁধা ছিল। সাধারণত এই গান গাওয়ার দিকে ভজহরির বিপুল ঝোঁক। কিন্তু কখনও একটা নির্দিষ্ট গান সে গায় না। এ গানের এক লাইনের সঙ্গে আর এক গানের এক লাইন মিশিয়ে অদ্ভুতভাবে গাইতে থাকে সে।

শ্যামা মা তোর রাঙা পায়ে রাঙা জবা মানায় ভাল।
কেন মা তুই ফিরিস্ মিছে সন্তানে না দিয়ে কোল।
সন্তানে দিতে কোল ত্যজি সুখ কৈলাস,
দয়াময়ী মা আমার, শ্মশানে করেন বাস।
শ্মশানে জাগিছে শ্যামা, অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে।

বেশ কিছুক্ষণ দীপক ভজহরিকে লক্ষ্য করল। সবার অলক্ষ্যে এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল সে যে সেখানে তার অস্তিত্বও অন্য কেউ কল্পনা করতে পারত না।

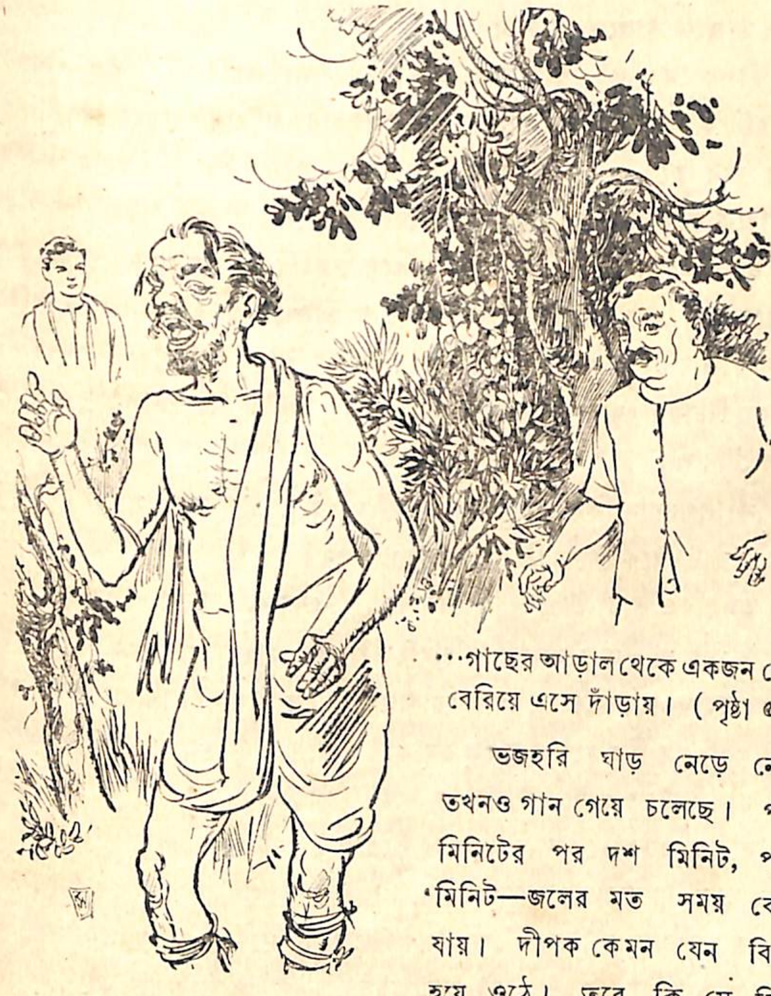

…গাছের আড়াল থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়। (পৃষ্ঠা ৫২)

ভজহরি ঘাড় নেড়ে নেড়ে তখনও গান গেয়ে চলেছে। পাঁচ মিনিটের পর দশ মিনিট, পনর মিনিট—জলের মত সময় কেটে যায়। দীপক কেমন যেন বিরক্ত হয়ে ওঠে। তবে কি সে বিনা কারণে ভজহরিকে ফলো করছে? তার এ প্রচেষ্টা শুধু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে?

দীপককে কিন্তু বেশীক্ষণ চিন্তা করতে হয় না। ধীরে ধীরে ভজহরি উ
দাঁড়ায়। চারধারে বেশ ভাল করে দেখে। তারপর আস্তে আস্তে গানের দু
কলি ভাঁজতে ভাঁজতে হেঁটে চলে।

দীপক যেন এই সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সেও ধীরপা
ভজহরিকে অনুসরণ করে চলে। কিন্তু ভজহরির গতিবিধি কেমন যেন বি
বলে মনে হতে থাকে—অন্ততঃ দীপকের মনে সন্দেহ হয়। ভজহরি ঘন
চারদিকে তাকাচ্ছে, যেন কেউ তাকে দেখে এটা সে চায় না। কিন্তু কেন?

হঠাৎ একটা জংলা মতো জায়গায় এসে ভজহরি দাঁড়িয়ে পড়ে। দুবার জো
জোরে গান গেয়ে উঠতেই একটা গাছের আড়াল থেকে একজন লোক বেরি
এসে দাঁড়ায়। দীপক অবাক হয়ে যায়। আশ্চর্য, এ যে কালিপদ মিত্র—স্থানী
স্কুলের টীচার। যেদিন বিনয় মল্লিক নিহত হয়, সেদিন এ লোকটিও বসেছি
তার টেবিলে।

কালিপদবাবু কিন্তু ভজা পাগ্‌লাকে দেখেই চুপচাপ তার সাম্‌নে দাঁড়ি
যান। তার দিকে চেয়ে কি একটা কথা বলেন।

ভজহরিও তার উত্তরে কি যেন বলে। এসব কথা অবশ্য দীপক দূর থেকে
শুনতে পায় না—তবে তাদের গতিবিধি দীপকের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হয়
এ ধরণের ঘটনার জন্যে সে বোধ হয় আদৌ প্রস্তুত ছিল না। মিনিট দুয়েক ক
বলে কালিপদ মিত্র চলে যান হন্‌ হন্‌ করে হাঁটতে হাঁটতে। ভজহরিও আপ
মনে গান গাইতে গাইতে উল্টো পথ ধরে।

দীপক ভজহরিকে আর অনুসরণ করে লাভ নেই মনে করে দুপা এগো
এমন সময় মিঃ বাসুর চাকর লাউচীনকে দেখা যায় সেখানে। দীপক আপনমনে
এগিয়ে চলে থানার দিকে—যেন এসব কিছুই সে দেখেনি। কিন্তু তার সারা ম
জুড়ে তখন বিরাজ করছিল এই ছোট্ট ঘটনাটি। সে শুধু ভাবছিল, এই ঘটনাটি
সঙ্গে হত্যারহস্যের সম্পর্ক কি?

এগারো

—ব্যর্থ অভিযান—

সকাল থেকেই সাজ সাজ রবে অভিযান সুরু করে দিয়েছিলেন মিঃ বটব্যাল। তিনি বিশেষভাবে তৈরী হয়েই কাজ সুরু করেছিলেন এবার যাতে শুধু তাঁর নিজের সুনামই হয় তা নয়, ময়নামতীর মাঠের দুর্নামও চাপা পড়ে।

দিনের পর দিন সাধারণ লোকের মনে একটা কি যেন ভয়ের ছায়া এসে জমতে সুরু করেছিল। কেমন যেন একটা দুশ্চিন্তার ছায়া এসে আচ্ছন্ন করেছিল সারা গ্রামের পরিবেশ। গ্রামের প্রত্যেকটি লোক শুধু চিন্তা করছিল, পর পর এখানে এ ধরণের ঘটনা ঘটছে কি করে?

মিঃ বটব্যালের নিজস্ব ধারণা হচ্ছে, বাংলাদেশে তাঁর মত পুলিশ অফিসার বিশেষ জন্মগ্রহণ করেনি বললেই হয়। যা দু পাঁচজন আছে তার মধ্যে সবার চেয়ে বড়ো যে তিনি এবার তেমন একটা সুযোগ এসেছে হাতে হাতে অপরাধীকে ধরে তা প্রমাণ করবার। তাঁর মতো কর্মক্ষম অফিসার সত্যিই দুর্লভ! বিনয় মল্লিক আর ইস্‌মাইল সর্দারের হত্যাকারী যে দীনবন্ধুবাবুর জীবনের ওপরেও একবার আঘাত হানবে, এটা তিনি কল্পনা করতে পেরেছিলেন। তাই এখন যদি ভালভাবে দীনবন্ধুবাবুর বাড়ি পাহারার ব্যবস্থা করা যায় তবে আসল আসামীকে গ্রেপ্তার করার পথে কোনও বাধার সৃষ্টি নিশ্চয়ই হবে না। এখানে তার আগমন ঘটবেই। তাঁর কাজ শুধু সুযোগমত সেই ক্রিমিন্যালকে গ্রেপ্তার করা।

তাই খুব বেশী চিন্তা ছিল না তাঁর। এমন কি যে দীপক তাঁকে এতটা সাহায্য

করল, সেই দীপকও বর্তমানে কোথায় আছে তা নিয়ে তিনি নিজেকে অব্য-
বিব্রত করলেন না। তাঁর লক্ষ্য শুধু প্রমাণ সমেত আসামীকে গ্রেপ্তার করা।

সেদিন বিকেল থেকেই তিনি রীতিমত কড়াকড়ি সুরু করে দিলেন। পুলিশের
হুকুম ছাড়া কোনও লোক বেরোতে বা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।
এমন কি বাড়ির কোন অজ্ঞাত পথ দিয়ে যদি কেউ যাতায়াত করে, সেখানে
তাদের যাতায়াত বন্ধ করবার জন্যে গোপনে স্পেশ্যাল পাহারার ব্যবস্থা পর্যন্ত
করে দেওয়া হলো। পুরো পুলিশ জুরিস্‌ডিকশনে গিয়ে পড়ল সারা বাড়িটা।
দেখে মনে হয় মৃত্যুর এই অপ্রতিহত অভিযানকে বাধা দেবার জন্যে মিঃ
বটব্যাল যেন একেবারে বদ্ধপরিকর।

বেলা বারোটা একটার সময় দীপককে দেখা গেল সেখানে। সবকিছু
দেখে শুনে সে শুধু বলল—দেখবেন মিঃ বটব্যাল, শেষ পর্যন্ত সবকিছু যেন
সেই বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো না হয়ে যায়!

মিঃ বটব্যাল আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন—তা হতে দিচ্ছি না মিঃ
চ্যাটার্জী। যদি সত্যিই খুনী এবার এদিকে ঘেঁসবার চেষ্টা করে তবে তাকে
মারাত্মকভাবে আফশোষ করতে হবে।

হেসে দীপক বলল—দেখা যাক! আই উইশ ইউ সাক্‌সেস্‌।

—আপনি কি এখানে থাকছেন না মিঃ চ্যাটার্জী?

—না, আমাকে যেতে হবে একবার। আমার শেষ ক্লুর সমাধান না হওয়া
পর্যন্ত আমি আপনাকে সাহায্য করবার জন্যে এখানে থাকতে পারি না। আশা
করি সেটা অবশ্যই হবে। কালকের মধ্যেই আপনার কাল্‌প্রিট্‌কে আপনার
হাতে তুলে দেবার আশা রাখি।

মিঃ বটব্যাল এ কথার কোন উত্তর দেন না।

* * * *

রাত তখন সাড়ে আটটা কি নটা।

সারাদিন অবিশ্রান্ত খাটুনির পর মিঃ বটব্যাল কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে-
ছিলেন। তা ছাড়া পুলিশবাহিনীর যে ছ সাত জন লোককে পাহারায় রাখা
হয়েছিল তারাও সারাদিন কোনও কিছু ঘটতে না দেখে একটু বিমর্ষ ও
অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

রাত সাড়ে আটটা পৌনে নটায় হঠাৎ তাদের অন্যমনস্কতার কুফল হাতে
হাতে প্রমাণিত হলো।

বাড়ির লোকজন সব কাজকর্মে ব্যস্ত ছিল। অনুরাধা দেবীও মেয়েদের নিয়ে
নিজের ঘরে বসে বিশ্রাম করছিলেন। দীনবন্ধুবাবু ছিলেন কোণের ঘরে একটা
ইজিচেয়ারে বসে। তিনি শশধর দত্তের লেখা কি একটা সস্তা গোয়েন্দা-কাহিনী
পড়ছিলেন গভীর মনোযোগ দিয়ে।

বুম্‌, বুম্‌…

হঠাৎ সারা বাড়ি প্রচণ্ড শব্দে থর থর করে কেঁপে উঠল।

মিঃ বটব্যাল থেকে আরম্ভ করে সমস্ত পুলিশবাহিনী এ ধরণের আকস্মিক
দুর্ঘটনায় কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

এভাবে বোমা ফাটল কোথায়? কোথেকে ভেসে এলো এই প্রচণ্ড
শব্দ? তবে কি তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো?

কোণের ঘরের দিক থেকেই শব্দটা ভেসে এসেছিল। সকলে তাই সেদিকেই
দৌড়ে যায়।

দরজা বন্ধ। দীনবন্ধুবাবু ঘরের ভেতরে বসে বই পড়ছিলেন। এই ঘরের
মধ্যেই বোধ হয় বোমাটা ফেটেছে। অনুরাধা দেবী দরজার keyholeএ
চোখ রেখে ঘরের ভেতরটা দেখেই আঁতকে উঠলেন ভয়ে আর বিস্ময়ে।

দীনবন্ধুবাবু চেয়ারের ওপরে কাত হয়ে পড়ে আছেন। সারা ঘর ধোঁয়ায়

আচ্ছন্ন। অনুরাধা দেবীর মুখ দিয়ে শুধু একটা আর্ত চীৎকার বেরিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়। তিনি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন।

পুলিশবাহিনী ছুটে আসে। ছুটে আসেন মিঃ বটব্যাল। কিন্তু কোণের ঘরের দরজাটা তখনও বন্ধ।

সজোরে দরজার ওপর আঘাত করা হয়। একবার—দুবার—তিনবার—

জীর্ণ দরজাটা সে আঘাতের চাপ সহ্য করতে পারে না। সশব্দে দরজার অর্গল ভেঙে যায়। সারা ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি। ঘরের এক কোণে অবসন্ন অবস্থায় পড়ে আছেন দীনবন্ধু মিত্র। চেয়ারের ওপর তাঁর দেহটা কাত হয়ে পড়ে।

দীনবন্ধুবাবুর দেহে দুবার নাড়া দেন মিঃ বটব্যাল। কিন্তু দীনবন্ধুবাবুর জ্ঞান ফিরে আসে না। তিনি বুঝতে পারেন ইতিপূর্বেই দীনবন্ধুবাবু জ্ঞান হারিয়েছেন।

কিন্তু কি করে এত বড় একটা মারাত্মক ঘটনা সংঘটিত হলো? ঘরের মধ্যে এভাবে বোমা নিক্ষেপ করল কে? পুলিশের কঠিন বেষ্টনী পার হয়ে কে সক্ষম হলো ঘরের মধ্যে বোমা ফেলতে?

ভাল করে বোমার টুকরোগুলো পরীক্ষা করলেন মিঃ বটব্যাল। তিনি নিঃসন্দেহ হলেন, কোনও সাধারণ বোমা এটি নয়। ঘরের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ টাইম্ বোম রেখে গিয়েছিল অনেক আগে। কিন্তু কে সেই অজ্ঞাত লোক যে প্ল্যান করে এতবড় একটা মার্ডার করেছে?

মিঃ বটব্যাল এসব কথার কোনও উত্তরই খুজে পান না। তিনি তক্ষুণি একজন লোক পাঠান থানায় দীপকের খোঁজে। আর একজন ছুটে যায় স্থানীয় ডাক্তারখানায় দীনবন্ধুবাবুর আঘাতের গুরুত্বটা বোঝাবার জন্যে।

দীপক আধঘন্টার মধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ভাল করে দীনবন্ধুবাবুর ক্ষতটা পরীক্ষা করে সে মন্তব্য করে, আঘাতটা অত্যন্ত গুরুতর। এখন প্রাণের

কোনও আশা আছে বলে মনে হচ্ছে না আমার। সামান্য কিছুক্ষণ বেঁচে থাকতে পারেন। কিন্তু আমি তেমন আশার কিছু দেখছি না।

একটু পরেই স্থানীয় ডাক্তার এসে দেখে বলেন—হি ইজ্ এক্সপায়ার্ড জাস্ট নাউ! এক্ষুণি ওঁর মৃত্যু হয়েছে।

আবার আর একটি মৃত্যু!

মিঃ বটব্যাল যেন অপরিসীম ব্যর্থতায় ভেঙে পড়েন। এতক্ষণ ধরে এত চিন্তা করে তিনি যে আয়োজন করেছিলেন তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে আততায়ী দীনবন্ধুবাবুকে হত্যা করেছে।

দীপকের দিকে চেয়ে মিঃ বটব্যাল বলেন—যদি এখনই আততায়ীকে গ্রেপ্তার করা না হয়, তবে আমার মনে হচ্ছে আরও অনেক লোকের জীবন বিপন্ন হতে পারে।

দীপক প্রশ্ন করে—কেন, আপনি কি এখনও প্রকৃত অপরাধী কে এবং কি ভাবে এগুলো ঘটেছে সে বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি?

—তা কিছুটা পেরেছি। আমার মনে হয় কোনও একজন ক্রিমিন্যাল একের পর এক এই হত্যাগুলো করে চলেছে। আর শুধু সাধারণ একজন ক্রিমিন্যাল নয়, বিজ্ঞানের বিষয়েও তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। কিন্তু সে যে কে…

দীপক বলে—আপনি এখনও সত্যি অনেকটা অন্ধকারে মিঃ বটব্যাল। যাক, এখানকার বিষয়টা ইন্‌ভেস্টিগেট করে নিন। তারপর আমি আপনাকে সাহায্য করব এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আজই আমি আসল ক্রিমিন্যালকে আপনার হাতে তুলে দেব আশা করি।

বারো

—সফল্ প্রচেষ্টা—

মিঃ বটব্যাল বার বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও দীপক কিন্তু জানত, যে পথ ধরে সে সূত্রসন্ধান করে চলেছিল, সেই পথেই সফল হতে পারবে সে।

ময়নামতীর মাঠের ওপরে ঘটে-যাওয়া পুরোনো সব ঘটনার ইতিবৃত্ত দীপকের জানা ছিল। তাই দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু তার সাম্‌নে একটা নতুন আলোকপাত করল। আর সেই সূত্রের সঙ্গে ইস্‌মাইল সর্দারের মৃত্যুও জড়িয়ে ছিল। দীপক বুঝতে পারল যে অতীতে একদিন দীনবন্ধু মিত্র বা ইস্‌মাইল সর্দার যে অন্যায় কাজ করেছিল, তারই প্রায়শ্চিত্ত আজ তাদের করতে হচ্ছে। কিন্তু পুরোনো ঘটনার সঙ্গে বর্তমান ঘটনার সাদৃশ্য কোথায়! এটুকুই দীপক বের করতে সক্ষম হচ্ছিল না।

তবে একটা পয়েন্ট বার বার দীপকের চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিল। ধীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁকে হত্যার দোষটা তাঁর পুত্র রণেন্দ্রের ওপর চাপিয়ে তাকে দশ বছরের জন্যে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু এতদিন অতীত হবার পরও সে আর ফিরে আসেনি। শুধু তাই নয়, সে জেলে যাবার ছ মাস পরেই একবার সেখানে গোলযোগ হয়ে বহুসংখ্যক কয়েদী পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল। শোনা যায় রণেন্দ্রও নাকি ছিল তাদের মধ্যে একজন। তার পর থেকেই রণেন্দ্রের আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

দীপক বার বার শুধু এ কথাই ভাবছিল যে, সত্যি যদি রণেন্দ্রের সঙ্গে এ ব্যাপারের কোনও যোগাযোগ থাকে, তবে সে এখানে এলো কোন্ পথে? আর কোথায় কিভাবেই বা অবস্থান করছে সে!

সবটুকু মিলিয়ে ব্যাপারটা যে বেশ জটিল এ বিষয়ে দীপকের এতটুকু সন্দেহ ছিল না। তবে সে জটের একটি গ্রন্থি উন্মোচিত হয়ে গেলেই যে সব রহস্যের সমাধান হবে, এটাও দীপক বেশ ভাল করে জানত।

আর একটা কথাও দীপক বুঝতে পেরেছিল—সেটা হচ্ছে এই কেসের সঙ্গে পাগল ভজহরির সম্পর্ক। কিন্তু সেটা কোন্ পথে তা বের করবার জন্যেই চলেছিল তার ওই গোপন প্রচেষ্টা।

দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যুর পরও সে বাধ্য হয়ে সেই একই পথ অবলম্বন করল। সেদিনও সন্ধ্যার পর সে তাই পাগল ভজহরিকে অনুসরণ করতে মনস্থ করল।

নানা যায়গায় খুঁজে অবশেষে পাগল ভজহরির দেখা পেলো সে বৈজ্ঞানিক মিঃ বাসুর বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটা ঝোপের ধারে। অবশ্য তার পেছনে যে কেউ অনুসরণ করেছে তা ভজহরি বুঝতে পারেনি। তবুও সে নিজের ইচ্ছামত বা দীর্ঘদিনের অভ্যাস অনুযায়ী গান গেয়ে চলেছিল :

নব বিনোদিনী রাই
কোথা গেলে তারে পাই
বলিতে না পারি ভাই
শোনো সখা, শোনো শোনো···

এমন ভাবে ঘাড় মাথা নেড়ে মুখভঙ্গী করে সে গান গাইছিল যে তাকে দেখে বোঝা কঠিন যে সে পাগল। কিন্তু তার বেশভূষা নেহাৎ জীর্ণ, যা থেকে তাকে পাগল বলে সকলে ভাবতে শুরু করেছিল।

দীপক মিনিট পনেরো চুপ করে অপেক্ষা করল। কিন্তু তখনও ভজহরির গতিবিধির মধ্যে এমন কিছু দেখা গেল না, যা থেকে বোঝা যায়, এই নাটকে সে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করছে।

কিন্তু বোঝা গেল মিনিট কুড়ি পর।

হঠাৎ মিঃ বাসুর অ্যাংলো-চাইনীজ ভৃত্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল—বাবু, আপকো অন্দরমে বোলাতা হ্যায়।

ভজহরি এবার তার দিকে চেয়ে বলল—আমার টাকা?

—ভেতরে গেলেই পাবেন।

—ঠিক ত?

—হ্যাঁ বাবু।

—বেশ চল তাহলে। কিন্তু আজ আমার টাকা অবশ্যই চাই। যেন ঘুরতে না হয়।

কথাটা শেষ করেই ভজহরি লাউচীনের সঙ্গে হন্ হন্ করে মিঃ বাসুর বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। তখন তার ভাবভঙ্গী দেখলে এটা অনুমান করা শক্ত যে সে এমন একটা বদ্ধ পাগল!

দীপকও দূর থেকে তাদের অনুসরণ করে চলল। কিন্তু বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো না সে। বাধ্য হয়ে সে দরজার একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভেতরের দিকে দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগল।

ভাল করে তাকিয়ে সে দেখতে পেল ভজহরি লাউচীনের সঙ্গে ভেতরে ঢুকতেই বৈজ্ঞানিক মিঃ বাসু এবং অন্য একজন লোক ঘরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেল।

দীপকের কাছে সব ব্যাপারটাই যেমন আকস্মিক তেমনি অভিনব বলে মনে হলো। তবে এ থেকে নতুন একটা জগতের দ্বার খুলে গেল তার সামনে। বিরাট একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল তার মনে।

তার ঠিক মিনিট কুড়ি পঁচিশ পরেই দেখা গেল পাগল ভজহরি আবার গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে আসছে মিঃ বাসুর বাড়ি থেকে।

ভজহরির হাতে কতকগুলো খুচরো নোট। দূর থেকে দেখে দীপক বুঝতে

পারল না, তাতে কত টাকা আছে, তবে প্রায় দু তিনশো টাকার কম যে হবে না, তা আন্দাজ করতে পারা যায়।

ভজহরি তারপর জংলা জায়গাটা পার হয়ে হঠাৎ প্রাণপণ জোরে ছুটতে সুরু করল।

দীপক বুঝতে পারল ভজহরি বোধ হয় তাকে দেখতে পেয়েছে—তাই ভয় পেয়ে তার ঐ ছোটবার প্রয়াস।

দীপক দেখল আর অনুসরণ করা বৃথা। সে তাই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে থানার দিকে এগিয়ে চলল।

তেরো

—সর্পিল পথরেখা—

মিনিট কুড়ি পরে।

থানার একটা সিক্রেট চেম্বারে বসে কথা হচ্ছিল ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী আর মিঃ বটব্যালের মধ্যে।

দীপক সিগারেটে একটা সুদীর্ঘ টান দিয়ে সুরু করে:

যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এ ঘটনাটির রহস্যভেদ প্রায় অসম্ভব, তবু একটু চিন্তা করলেই প্রত্যেকটি রহস্য খুবই সহজ হয়ে আসে।

প্রথমেই দেখা যাচ্ছে, এই সব হত্যাকাণ্ডের যে নায়ক, তার বিশেষ একটা ক্রোধ কতকগুলি লোকের প্রতি। তারা হচ্ছে বিনয় মল্লিক, ইস্মাইল সর্দার, দীনবন্ধু মিত্র ইত্যাদি।

কিন্তু এদের ওপর তার এত রাগ কেন? কেন সে বেছে বেছে এই সব লোকগুলোকেই হত্যা করতে চায়?

ব্যাপারটা খুবই সহজ। বিগত দিনের জমিদার-পুত্র রণেন্দ্র—যে একদিন

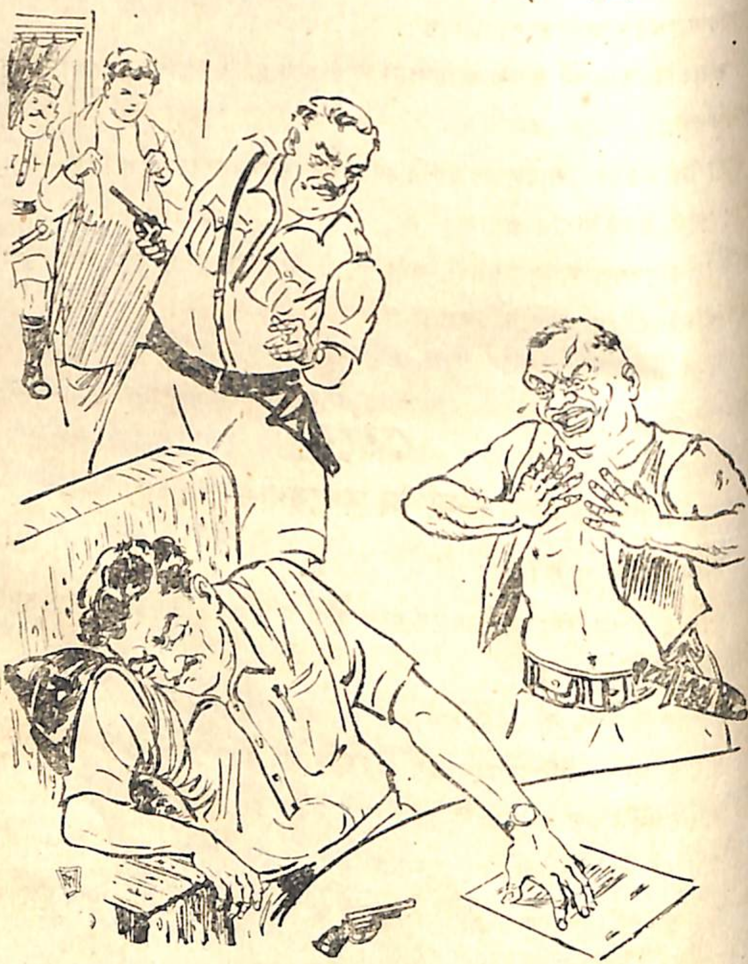

···বুক চাপড়ে কাঁদছে প্রিয় ভৃত্য লাউচীন। (পৃষ্ঠা ৬৪)

বিনা কারণে বিনয় মল্লিক, দীনবন্ধু মিত্র ইত্যাদি লোকেদের চক্রান্তে পড়ে অজস্র নির্যাতন ভোগ করেছিল সেই বর্তমানে এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক। সুদীর্ঘ

পনেরো বছর পরে সে এই সব ক্রাইমগুলি করছে এক অভিনব ছদ্মবেশে। তার আগে কয়েকটা কথা বলি।

বিনয় মল্লিক যখন টেবিলে বসে ডিনার খাচ্ছিল, তখন কালিপদ মিত্র নামক লোকটি একই টেবিলে বসেছিল। সে তাকে একটা সিগারেট অফার করে। সিগারেটের মধ্যে হাই ডোজ্ স্ট্রিক্নাইন ছিল। তার ফলেই বিনয় মল্লিকের মৃত্যু হয়। তাই কেমিক্যাল অ্যানালিসিস্ করে খাবারের মধ্যে কোনও বিষ পাওয়া যায়নি। আসলে কালিপদ হত্যাকারীর নিযুক্ত ব্যক্তি। আর পাগল ভজহরির মাথার কিন্তু আসলে ততটা গোলমাল ছিল না—সে নানাভাবে রণেন্দ্রকে সাহায্য করত। তারপর ইস্মাইল সর্দারকে হত্যা করে লাউচীন—ছদ্মবেশী রণেন্দ্র ওরফে মিঃ বাসুর ভৃত্য। আর তৃতীয় টাইম্ বোমাও সেই বাড়ির কোনও লোকের সাহায্যে·········

বাধা দিয়ে মিঃ বটব্যাল বলেন—তাহলে মিঃ বাসুই ছদ্মবেশী রণেন্দ্র ?

—এতদিনেও চিনতে পারেন নি ?

—আশ্চর্য ! তাকে এক্ষুণি গ্রেপ্তার করা উচিত।

—কিন্তু তা পারবেন কি ? তার কাজ শেষ হয়েছে। সে এতক্ষণ গা-ঢাকা দিয়েছে কিনা কে জানে !

—আমাদের চেষ্টা করা উচিত। চলুন, আমি এক্ষুণি গাড়ি রেডি করতে বলছি। আমাদের এক্ষুণি রওনা হওয়া উচিত।

সকলে উঠে দাঁড়ায়।

* * *

বৈজ্ঞানিক মিঃ বাসুর বাড়ি।

নীচে থেকে একটা কান্নার শব্দ শোনা যায়। করুণ, হৃদয়স্পর্শী।

সকলে ওপরে উঠে দেখতে পায়, চেয়ারের ওপরে কাত হয়ে পড়ে আছে মিঃ

বাসুর মৃতদেহ আর তার পাশে দাঁড়িয়ে বুক চাপড়ে কাঁদছে প্রিয় ভৃত্য লাউচীন। যে লাউচীনকে বাইরে থেকে শয়তানের মতো ভয়ানক বলে মনে হয়, তার মনের কোণে যে এতটা কোমলতা লুকিয়ে আছে তা কে জানত!

টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে একখানা চিঠি। তাতে লেখা :

প্রিয় মিঃ চ্যাটার্জী ও মিঃ বটব্যাল,

আমার প্রতিশোধের পালা সমাপ্ত। তাই আমি পৃথিবীর কাছ থেকে চিরবিদায় নিলাম। যে ভয়ানক জিঘাংসার বিষ আমি এতকাল হৃদয়ে পোষণ করে এসেছিলাম তা যে এত শীঘ্র চরিতার্থ হবে তা আমি ভাবতে পারিনি। যাক্, আজ আমি তৃপ্ত।

বিদায় পৃথিবী! বিদায় আপনাদের সকলের কাছ থেকে। আপনাদের হাতে ধরা না দিয়ে যে আত্মহত্যা করব, এটা নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগবে না আপনাদের। কিন্তু তবু আমাকে তা করতেই হবে। ইতি—

হতভাগ্য বৈজ্ঞানিক বাসু

(রণেন্দ্র)

* * *

সামান্য মাঠ আমি। তবু আমার মুখ থেকে সমস্ত কাহিনীই আপনারা শুনলেন। এবার নিশ্চয়ই মনে করবেন, আমার নামের সঙ্গে যে অভিশাপ জড়ানো আছে, তার জন্যে আমি দায়ী নই।

কিন্তু তবু লোকে আমাকে ঘৃণা করে—বলে ময়নামতীর মাঠ অভিশপ্ত। আমি তাই রিক্ত অবস্থায় খাঁ খাঁ করছি আজ। দূর দেশ থেকে আসা পথিকেরা আমার নাম শুনলেই ভয়ে আঁতকে ওঠে।

এ থেকে আমার পরিত্রাণের কি কোনও উপায় নেই?

—শেষ—

স্বপনকুমারের লেখা ডিটেক্‌টিভ গ্রন্থমালা

=বিশ্বচক্র সিরিজ=

প্রত্যেকখানির মূল্য ৫০ ন. প.

১। অদৃশ্য সঙ্কেত
২। দুরাত্মার ছল
৩। ভ্রান্তপথের শেষে
৪। চলন্ত ছায়া
৫। হিংসার অন্ধকার
৬। অব্যর্থ সন্ধান
৭। বিষাক্ত হাসি
৮। মিথ্যা চমক
৯। চায়না লজ
১০। বিজয়িনী তন্দ্রা
১১। শ্বেতপদ্ম
১২। অদৃষ্টের পরিহাস
১৩। ব্যথার প্রদীপ
১৪। মৃত্যুহীন প্রাণ
১৫। রক্তকমল
১৬। নূতন অতিথি
১৭। পৃথিবী থেকে দূরে
১৮। হারান ডাইরী
১৯। বিকেল ছ'টার 'শো'তে
২০। বিফল স্বপ্ন
২১। বাগান-বাড়ী
২২। প্রবালপুরী
২৩। জীবন-মৃত্যু
২৪। পরপারের পথিক
২৫। জমাট অশ্রু
২৬। পরাজয়ের গ্লানি
২৭। আলো-আঁধার
২৮। তিন বন্ধু
২৯। ছায়ার আর্ত্তনাদ
৩০। রাঙ্গাজবা
৩১। এক পেয়ালা চা
৩২। বেনামী চিঠি
৩৩। রত্নমালার কাহিনী
৩৪। ঝড়ের সঙ্কেত
৩৫। জবানবন্দী
৩৬। ব্যর্থ অভিযান
৩৭। হারানো মাণিক
৩৮। অদৃশ্য বন্ধু
৩৯। হরতনের নওলা
৪০। গৃহপ্রবেশ
৪১। জোয়ার-ভাঁটা
৪২। বেয়াইনী দখল
৪৩। রূপমহল
৪৪। পরশ-পাথর
৪৫। চোখের ভুলে
৪৬। চারশো বিশ
৪৭। রঙ্গিন সূতা
৪৮। বিষকন্যা
৪৯। শুধু দুটি হাত
৫০। সন্ধ্যা-মালতী
৫১। বন্দী বাসুকী
৫২। শেষ রাতের কাহিনী
৫৩। বলয়গ্রাস
৫৪। ছন্দহারা
৫৫। মায়া-কানন
৫৬। ছদ্মবেশী
৫৭। তেরো নম্বর বাড়ী
৫৮। বন্দিনী বিশাখা
৫৯। একটি চোখের রহস্য
৬০। মুখার্জী ভিলা
৬১। চীনের পুতুল
৬২। কালো মুখোশ
৬৩। গ্রীন ড্রাগন
৬৪। নাইট ক্লাব
৬৫। সোনার হরিণ
৬৬। তিন নম্বর ফ্লাট
৬৭। ঘূর্ণি হাওয়া
৬৮। বিষের বাঁশী
৬৯। ভাড়াটে বাড়ি
৭০। ঘুম ভাঙা রাত
৭১। শেষ অঙ্ক
৭২। লাল কুঠী
৭৩। নিশি মালঞ্চ
৭৪। পাগল হাওয়া
৭৫। ঝরা বকুল
৭৬। চৈত্রের পলাশ

কলেজ ষ্টুডেন্টদের জন্য—

বিশ্ব-চক্র সিরিজের ত্রয়োদশ বই =

ব্যথার প্রদীপ

শ্রীস্বপন কুমার

G1067

※ মূল্য আট আনা

বিশ্ব-সাহিত্য প্রকাশনী
৬৮, কলেজ ষ্ট্রীট · কলিকাতা
প্রকাশক
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার

নিউ বেঙ্গল প্রেস লিঃ
৬৮, কলেজ ষ্ট্রীট · কলিকাতা
মুদ্রাকর
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার

১৩৬২
৩

উপহার

ব্যথার প্রদীপ

এক

—ওরা কে ?—

—একটি পয়সা দাও বাবু ! একটি পয়সা ভিক্ষা দাও মা জননী !

সুকরুণ প্রার্থনা ।

পথচারীদের কেউ কেউ দয়াপরবশ হয়ে দু-একটা পয়সা ফেলে দেয়। কেউ বা মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়। কেউ হাসে বিদ্রূপের হাসি ।

একটি অন্ধ লোক আর একটি ছোট ছেলে। মাণিকতলার পোলের ওপর মাঝে মাঝে দেখা যায় ওদের এম্‌নি ভিক্ষা করতে ।

দিনের পর রাত নামে ।

ওরা ধীরপায়ে ফিরে চলে কোন্ এক অজ্ঞাত বাসস্থানের দিকে ।

এইটুকুই ওদের দৈনন্দিন সাধারণ জীবন। একটানা গতিতে এম্‌নিই চলে ওদের ভিক্ষাবৃত্তি। কখনও মাণিকতলা, কখনও ট্যাংরা, কখনও হাওড়া, কখনও ভবানীপুরের মোড়ে ওদের দেখা যায় ।

কিন্তু জনসাধারণ ওদের সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানে? জানবার অবকাশও তাদের থাকে না ।

এদের সে জীবন সম্বন্ধে—যবনিকার আড়ালে ঢেকে-থাকা সে বিস্তীর্ণ জীবন-নাট্যের একটা অংশ আজ তুলে ধরছি আপনাদের সাম্‌নে। আপনারা যদি তা দেখতে আর শুনতে চান তবে আমার সাথে নেমে আসুন ধূলিরুক্ষ পৃথিবীর ক্ষুদ্র একটি অন্ধ কোণের নির্জন বাস্তবতাপূর্ণ অংশে ।

আসুন, আমার সাথে সাথে আপনিও এই অন্ধ ভিখিরী আর তার সঙ্গী ছেলেটাকে অনুসরণ করুন।

রাত নটা।

পথ জনহীন হয়ে আসছে।

ধীরে ধীরে ওরা দুজন পথ ধরে এগিয়ে চলে। কিছুদূরে ওদের ওপর নজর রেখে একজন দীর্ঘকায় লোক অপেক্ষা করছিল।

সে এবার এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে—কত হলো রুখুলাল?

—পাঁচ সিকা।

—দেখি।

অন্ধ লোকটি এবার তার ট্যাঁকে গুঁজে-রাখা পয়সাগুলো তুলে দেয় দীর্ঘদেহী লোকটার হাতে।

—আর নেই? দীর্ঘদেহী লোকটা কর্কশস্বরে প্রশ্ন করে।

—না। শুধু এই পেয়েছি।

—মিথ্যা কথা! লোকটি যেন গর্জে ওঠে।—এখনও বলছি সব দাও। না হলে সর্দারকে বলে দেব আমি। আর সর্দারের হাতে পড়লে যে কি অবস্থা হবে তা নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার!

—না না, ওকথা বলো না। সর্দারকে বললে একেবারে মেরে ফেলবে! উঃ!

অন্ধ লোকটির গালে সজোরে চপেটাঘাত করে সে বলে—এখনও দাও যা আছে সব। মিথ্যা কথা বলে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করো না।

রুখুলাল কাঁদতে কাঁদতে বলে—আমাকে মেরো না বলছি। ফের অমন করলে আমি শেষে গিয়ে পুলিশের কাছে সব কথা ফাঁস করে দেব। বলব তোমরা কি করে সমস্ত ছেলেমেয়েদের ধরে এনে তাদের অধঃপাতের পথে ঠেলে দাও। তাদের উপার্জনের ওপরেও ভাগ বসাতে ছাড় না তোমরা!

—কি বল্‌লি! লম্বা লোকটা রুখুলালের দেহে পদাঘাত করে বলে—আজ

…সজোরে চপেটাঘাত করে সে বলে—এখনও দাও… (পৃষ্ঠা ৬)

তোরই একদিন কি আমারই একদিন! সারা রাত আজ তোকে উপোস করিয়ে রাখব! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! আমার ওপর তেজ দেখান!

এমন সময় আরও তিন-চারজন ভিখিরী এসে জুটে যায়। এরা এতক্ষণ বাঘমারীর খালপোল অঞ্চলে ভিক্ষে করছিল। দলে দলে ভিখিরীরা এসে রুখুলাল আর লোকটার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে যায় মজা দেখবার জন্যে। এ সব যেন তাদের কাছে নিত্যনৈমিত্তিক একটা অতিসাধারণ ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়!

লোকটা রুখুলালকে নির্দেশ করে তাদের দিকে চেয়ে বলে—তোরা সব পয়সা জমা দিয়ে একে ধরে নিয়ে যা। আজ সারা রাত ওর উপোস। শয়তান বলে কিনা পুলিশে জানাবে!

অন্য ভিখিরীরা হি হি করে হাসে। বিদ্রূপের হাসি। নিষ্করুণ হাসির বিশ্রী প্রবাহ যেন রুখুলালের সারা দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।

সকলে আপন আপন পয়সা দীর্ঘদেহী লোকটির হাতে তুলে দেয়। এই লোকটিই হচ্ছে এ অঞ্চলের অর্থসংগ্রাহক। সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করে ও ফিরে যায় বড় আস্তানায়। সর্দারের কাছে রাত দশটার মধ্যে সব পয়সা জমা দিতে হয়।

অন্য ভিখিরীরা রুখুলালকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। রুখুলালের চোখদুটো অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। চোখের জলে তার গালদুটো ভিজে যায়। সুগভীর বেদনায় তার সারা মনটা যেন টন্‌টন্ করে ওঠে। নিস্পন্দ বুক ভেদ করে বেরিয়ে আসে একঝলক দীর্ঘশ্বাস।

ধীরে ধীরে তার মনে ভেসে ওঠে সুদূর কোন্ এক দিনের কাহিনী।

বহুদিন পূর্বের বিস্মৃতপ্রায় ইতিকথা যেন।

বাংলা থেকে দূরে—অনেক দূরে বিহার অঞ্চলে ছিল তার বাড়ি। পল্লীর ছেলে সে। আজীবন পল্লীতেই মানুষ। তখন সে বাংলা ভাষাও ভালমত শেখেনি।

বছর সাত-আটের বেশি তার বয়স নয়। গাঁয়ের পথেঘাটে ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করে। বাড়িতে খাবার অভাব ছিল না। নদীর জলে স্নান

করে, ক্ষেতের গমের রুটি খেয়ে আর গ্রামের পথে ঘুরে বেড়িয়ে তার দিন কাটত। কি আনন্দপূর্ণ স্বপ্নের মতো ছিল সে সব দিনের ইতিহাস!

তারপর?

ঠিক আট বছর তখন তার বয়স। সন্ধ্যাবেলা খেলাধুলো শেষ করে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরছিল। বাড়ি থেকে অল্প দূরে একটা পুকুরপাড়ের পথ দিয়ে হেঁটে চলছিল সে। হঠাৎ যেন কে পেছন থেকে তার মুখ চেপে ধরল। রুখুলাল এর জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তা ছাড়া তার মত অল্পবয়সের একটা ছেলের দেহে এমন শক্তি ছিল না যে অত বড় একটা লোককে বাধা দিতে পারে।

কাঁদতে গিয়েও কাঁদতে পারল না রুখুলাল। তার মুখ জোর করে চেপে বন্ধ করে ফেলা হলো। একটা মিষ্টি গন্ধ প্রবেশ করল তার নাকে। কে বা কারা তাকে এভাবে বন্দী করল এটা ভাল করে জানবার আগেই তাদের হাতে ধরা পড়ল রুখুলাল।

তারপর কোল্‌কাতা। কতদিন বা কতক্ষণ ঘুমের মধ্য দিয়ে কেটেছিল তা তার মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল, সে দেখতে পেল একটা মস্ত ঘরের মধ্যে সে বন্দী। হাত পা শক্ত করে বেঁধে রেখে তাকে একটা টেবিলের ওপর শোয়ান হয়েছে। মুখও বেশ শক্ত করে বাঁধা। এতটুকুও শব্দ করবার উপায় নেই তার।

একজন বিরাট চেহারার স্যুটপরা লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। সে রুখুলালের দিকে চেয়ে নির্বিকারকণ্ঠে হুকুম দিল—ওর চোখ দুটোকে শেষ করে দাও! কোনও মানুষ যে এত ভয়ঙ্কর হতে পারে সে সম্বন্ধে কোনও ধারণা এর আগে রুখুলালের ছিল না।

উঃ, তারপর সে কি ভীষণ যন্ত্রণা! ভালমত খেয়াল করতে আজও যেন তার সারা শরীর ভয়ে অবশ হয়ে আসে।

৯।০৮

যন্ত্রণার চোটে সে জ্ঞান হারাল।

অবশেষে যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন থেকে চোখে দেখতে পায় না কিছু!

…তার মুখ চেপে ধরল। (পৃষ্ঠা ৯)

পৃথিবী যেন তার কাছে সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেছে। যেদিকে তাকায় শুধু অসীম অখণ্ড আঁধার।

কে একজন তাকে ভয় দেখিয়ে বলল—আমাদের কথামত কাজ না করলে একেবারে খতম করে দেওয়া হবে!

ভয়ে রুখুলালের গলা শুকিয়ে কাঠ! সে শুধু বলল—যা বলবেন, তাই করব হুঁজুর। কিন্তু—

—বেশ বেশ। কোন ভয় নেই তোমার! শুধু আমাদের লোক তোমাকে যেখানে বসিয়ে দেবে সেখানে বসে ভিক্ষে করবে।

তারপর থেকে রুখুলাল এম্‌নি ভিক্ষে করে বেড়ায়। সেই শৈশব থেকেই তার ভিখিরী জীবনের সুরু। যা পায় সব এদের লোকের হাতে তুলে দেয়। বিনিময়ে বিনা পয়সায় থাকা আর খাওয়া পায় এদের কাছ থেকে।

শুনেছে এদের দলে নাকি এম্‌নি আরও অনেক ভিখিরী আছে। হাজার হাজার ভিখিরী নাকি এদের দলে। কোল্‌কাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ সব জায়গাতেই নাকি এদের দলবল ছড়ান রয়েছে।

মালিক নাকি বদলে গেছে। আগে যে লোক মালিক ছিল সে মারা গেছে। তার ছেলে এখন মালিক। আগে দল এত বড় ছিল না। এখন নাকি বিরাট দল হয়েছে।

সব শুনেছে রুখুলাল। কিন্তু সবই তার কাছে ধোঁওয়ার মতো লাগে।

কোথায় এদের দলের সব লোকজন তা সে জানে না। এদের কতগুলি ঘাঁটি তাও জানতে পারেনি সে।

সে শুধু একই আস্তানায় ত্রিশ-চল্লিশ জন ভিখিরীর সঙ্গে আজীবন আছে। রোজ সন্ধ্যায় একই লোক এসে সব পয়সা নিয়ে যায়।

যে ছোট ছেলেটা তার সঙ্গে বসে সে এদেরই দলের আর একটি ভিখিরী। নতুন এদের দলে এসে ঢুকেছে। কোন্ মায়ের কোলছেঁড়া ধন তা

কে জানে? শিশু রুখুলাল আজ ত্রিশের কোঠা পেরিয়ে গেছে। এম্‌নি করে ভিক্ষে করতে করতে কোন্ দিন তার সঙ্গী ছোট ছেলেটাও বার্ধক্যে গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু তবু এদের অমানুষিক ব্যবসা চলতে থাকবে অপ্রতিহত গতিতে।

এদের ওই নিষ্ঠুর, জঘন্য কাজে বাধা দিতে পারে এমন কোনও লোককেই কি ভগবান এ পৃথিবীতে সৃষ্টি করেননি?

একটি চোরাকুঠুরীর মধ্যে রুখুলালকে এনে ঢুকিয়ে দেয় সঙ্গী ভিখিরীরা। তারপর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। আজ রাতের মতো সে চোরাকুঠুরীতে বন্দী। কিছুই খেতে দেওয়া হবে না তাকে।

অন্য ভিখিরীরা হি হি করে হাসছে। তারা ভাবছে, তাদের বোধ হয় এমন কুক্ষণ আসবে না। কিন্তু রুখুলাল মনে মনে ভাবে, ওদেরও একদিন এমন অবস্থা আসতে পারে। ওরা জানে না যে ওদের অবস্থাও তার চেয়ে এতটুকুও উন্নত নয়!

ধীরে ধীরে রুখুলাল মেঝের ওপর বসে পড়ে চুপচাপ।

তার সারা শরীর প্রবল শ্রান্তিতে কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে। উপবাসক্লিষ্ট দেহ ঘিরে নেমে আসতে থাকে অসীম অবসাদ।

সারা মনটা কেমন যেন তোলপাড় করতে থাকে!

এমন সময় বাইরে শোনা যায় কণ্ঠস্বর—এই তোরা এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যা! কেন এখানে এসে এভাবে জটলা সুরু করেছিস্!

বাইরে ভিখিরীদের কলরব থেমে যায়। তারা যে কে কোথায় যায় তার কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

কণ্ঠস্বর রুখুলালের অপরিচিত নয়। লোকটা প্রশ্ন করে—তোরা এখানে জটলা করছিস্ কেন?

—রুখুলালকে সারাদিন খেতে না দিয়ে আট্‌কে রাখা হয়েছে!

—বেশ, আমি দেখছি কি ব্যাপার। তোরা গোলমাল করিস্ না আর এখানে।

কণ্ঠস্বর থেমে যায়।

রুখুলালের মনে কিছুটা আশা ফিরে আসে যেন।

একটু পরেই দরজা খুলে যায়।

—কে? রুখুলাল প্রশ্ন করে।

—আমি রে আমি। বিরিজলাল।

—ও, তুমি এসেছ?

—হ্যাঁ, কিন্তু কি ব্যাপার বল্ তো। তোকে হঠাৎ আটক করল কেন? কি জন্যেই বা তোকে আজ সারাদিন উপোস থাকতে হলো? তুই কি কোনও কিছু অন্যায় কাজ করেছিস নাকি?

—জানি না! রুখুলালের কণ্ঠে অভিমান।

—বল্ না। বাজে সময় নষ্ট করিস্ না।

—ভেবেছিল আমি পয়সা লুকিয়ে রেখেছি, তাই মেরেছিল আমাকে। আমি তাতে রেগে বলেছিলাম যে পুলিশে—

—চুপ্, ওরকম কথা বলিস্ না আর!

—কিন্তু আমাকে মারবে কেন? আমি কি কোনওদিন পয়সা লুকিয়ে রেখেছি নাকি? বরং ওই নাকি মাঝে মাঝে টাকা-পয়সা মেরে দেয়। লুকিয়ে রাখে। সর্দারকে সব টাকা দেয় না! ওর মত গাঁজা ভাঙ্ খাওয়া ত আর অভ্যাস নেই আমার!

—আচ্ছা, সে আমি সর্দারকে বলে ব্যবস্থা করব।

রুখুলাল উত্তর দেয় না।

বিরিজলাল বলে—এবার বাইরে চল্। তোর খাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে যাচ্ছি আমি। কোনও ভয় নেই তোর! ওরা গেল কোথায়?

—জানি না।

—বেশ, আমিই খাবার আনিয়ে দিচ্ছি। আর ওরা ফিরে এলে বুঝিয়ে বলব'খন।

বিরিজলাল বাইরে বেরিয়ে যায়। বোধ হয় চলে গেল খাবারের সন্ধানে।

রুখুলালের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তার মত সামান্য ভিখিরীর প্রতি এত অসীম মমতা যে কারও থাকতে পারে এ ধারণা তার ছিল না।

বিরিজলাল কি মানুষ না দেবতা! সত্যি, এদের দলে যেন বিরিজলালকে মানায় না। সে যেন এ জগতের কেউ নয়। এখানে এসে পড়েছে নেহাৎ পথ ভুল করে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে রুখুলালের বুক ভেদ করে।

দুই

—দু নম্বর ঘাঁটি—

হাওড়ার পোলের ওপর একটা খোঁড়া লোককে দেখা গেল বসে বসে ভিক্ষে করতে। পা দুটো হাঁটুর ওপর থেকে সরু লিক্‌লিকে। দেহের নিচের অংশটাই অপরিণত। কেমন যেন বিশুষ্ক।

ভোরবেলা একটা চাকা-লাগান গাড়িতে করে ঠেলতে ঠেলতে একজন লোক তাকে এখানে নামিয়ে রেখে গিয়েছিল। আবার সন্ধ্যার কাছাকাছি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সেই চাকা-লাগান গাড়িতে করেই।

শুধু এই লোকটাই নয়, হাওড়ার ঘাঁটিতে থাকে আরও অনেক ধরণের ভিখিরী। এই ঘাঁটিতে ভিখিরীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তার কারণও অবশ্য আছে। এই ঘাঁটি থেকে সর্দারের আয় হয় কোল্‌কাতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

বড়বাজারের মোড়ে একটি মেয়ে বসে ভিক্ষে করছিল। মাথায় লম্বা করে ঘোমটা টানা। কোলের কাছে শুয়েছিল একটি মাস পাঁচ ছয়ের ছেলে। দুধের সঙ্গে সামান্য আফিং খাইয়ে তাকে ঘুম পাড়ান হয়েছিল। ঘোমটা-দেওয়া মেয়েটিকে দেখে গৃহস্থ-ঘরের বধূ বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু সে তা নয়। এদের দলেরই মেয়ে সে। এখন ঘোমটার আড়ালে একে দেখতে পাচ্ছেন না বটে, তবে যদি কখনও একে অন্য বেশে কোনও পুরুষকে প্রলুব্ধ করতে দেখেন, তবে চম্‌কে উঠবেন না যেন। একেও ছোটবেলায় অল্প পয়সায় কোনও গ্রাম থেকে কিনে এনে এই আড্ডায় মানুষ করা হয়েছে।

মেয়েটি সাম্‌নে হাত পেতে চুপ করে বসেছিল। পথচারীরা প্রায়ই তার সাম্‌নে দু-চারটে পয়সা ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু এতেও পথচারীরা কেউ সামান্যও সন্দেহ করতে পারে না এদের পেছনে রয়েছে কি বিরাট একটা চক্রান্তজাল। কারা এদের পরিচালিত করে এদেরই রোজগারের পয়সা থেকে নিজেদের বিপুল অর্থ উপার্জন করছে।

সে সব কথা জানতে হলে যেতে হবে এদের সঙ্গে সঙ্গে দু নম্বর আড্ডায়। একটি গোপন স্থানের জনপূর্ণ একটি ষড়যন্ত্র-চক্রে যেতে হবে আপনাকে।

হাওড়া স্টেশন থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে একটি পুরোনো আমলের জীর্ণ, ব্যারাক প্যাটার্ণের বাড়ি। বর্তমানে ওখানে কে বা কারা থাকে তা নিয়ে সাধারণ মানুষ খুব বেশি মাথা ঘামায় না। কিন্তু ভিখিরী সমাজ ও গুণ্ডা শয়তানদের কাছে এই দু নম্বর ঘাঁটি একটি সুপরিচিত স্থান।

বাড়িখানায় মোট আট-দশটি কক্ষ। দিনের বেলায়ও বাড়ির কক্ষগুলো

অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হয়। চূণ-বালি খসে পড়া, গাছপালার জটিলতায় আচ্ছন্ন ঐ বাড়িখানাই হচ্ছে ভিখিরী তৈরীর কারখানা।

শুধু ভিখিরী নয়, এখানে বহু সুন্দরী মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে এসে তাদের মানুষ করে পরে নারী-ব্যবসায়ীদের কাছে উচ্চমূল্যে বিক্রী করা হয়।

শুধু ভিখিরী তৈরীই নয়, তাদের উপযুক্ত জায়গায়, বিভিন্ন ঘাঁটিতে পাঠান হয় এই দু নম্বর ঘাঁটি থেকেই। এখানকার সঙ্গেই বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদির সংযোগ আছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি অঞ্চলের ভিখিরীদের পাঠান হয় কাশী অথবা কোল্‌কাতায়। আর কোল্‌কাতার আড়কাঠিরা যে সব ছেলে-মেয়েদের সংগ্রহ করে তাদের পাঠান হয় দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন স্থানে।

কোল্‌কাতায় যে কয়টি ঘাঁটি আছে তার সেণ্টার হচ্ছে এই দু নম্বর ঘাঁটি।

এখানে আছে অপারেশন-রুম। উপযুক্ত লোকের হাতে ভার দেওয়া আছে সংগ্রহ-করা ছেলেদের দৈহিক অবস্থা পরিবর্তনের। দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে সাধারণ অবস্থায় এরা কারও মনে করুণার উদ্রেক করতে পারবে না। তাই এই বিশেষ অপারেশন-রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে। কোনও ছেলের চোখ নষ্ট করা হয়, কারও বা জিব কেটে বোবা করে দেওয়া হয়। অনেক অল্পবয়স্ক শিশুকে চুরি করে এনে হাঁড়ির মধ্যে আট্‌কে রেখে তাদের দেহের নিচের অংশটিকে অপরিণত করে দেওয়া হয়। এতে তারা জীবনে আর কখনও সোজা হয়ে চলতে পারে না।

বড় হলে এদের দেহের নিচের অংশে চট জড়িয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরা গড়িয়ে গড়িয়ে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলে। আর এদের সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক হাঁকতে হাঁকতে আর ভিক্ষা করতে করতে এগিয়ে চলে। কিভাবে সাধারণ মানুষের মনে করুণার উদ্রেক করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যেতে পারে সে বিষয়ে দলের সর্দারের যথেষ্ট জ্ঞান আছে বলেই মনে হয়।

এ ছাড়াও অনেক শিশুর জিহ্বার কেন্দ্রস্থলে ছিদ্র করে দেওয়া হয় অত্যন্ত অল্পবয়সে। পরে বয়স কিছুটা বাড়লে সেই ছিদ্রের মধ্যে সরু লোহার তৈরী ত্রিশূল ঢুকিয়ে, গায়ে ছাই মাখিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় ভিক্ষে করতে। এরা দেবতার অনুগৃহীত এ-কথা মনে করে সাধারণ লোক এদের প্রচুর পয়সা ভিক্ষে দেয়।

সাধারণ ভিখিরীদের চেয়ে এই সব বিশেষ 'কোয়ালিফিকেশন' যে সব ভিখিরীর থাকে তাদের আদর একটু বেশি। যে আড্ডায় এদের পাঠান হয়, সেখানে এরা একটু বেশি যত্ন পায়। আর এরা রোজ ভিক্ষেয় বের হয় না, ভিক্ষেয় বের হয় মাঝে মাঝে। কোনও বিশেষ পার্বণ বা উৎসবকে কেন্দ্র করে চলে এদের এই ভিক্ষাবৃত্তি।

এই সব বিভিন্ন আড্ডাকে পরিচালিত করে দু নম্বর আড্ডা। আর দু নম্বর আড্ডার সঙ্গে যোগ রয়েছে বোম্বাই, কাশী, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ ইত্যাদি অঞ্চলের আড্ডাগুলোর। বড় সর্দার জয়ন্ত শেঠ যখন কোল্‌কাতা পরিদর্শন করতে আসে তখন সে সর্বপ্রথমে আসে এই দু নম্বর আড্ডাতে। এখানকার স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত সর্দার বশীর খাঁই তাকে বিভিন্ন আড্ডাগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়। কোল্‌কাতার সব আড্ডাগুলোতে তাই বশীর খাঁর অপ্রতিহত প্রভাব। সব আড্ডার লোকই তাকে ভয় করে যমের মতো।

কাশী থেকে সম্প্রতি খবর এসেছে সর্দার জয়ন্ত শেঠ কোল্‌কাতার আড্ডা পরিদর্শন করতে আসছে।

খবরটা পেয়েই বশীর খাঁ ডেকে পাঠাল বিরিজলালকে।

বিরিজলালের হাতে সমস্ত ভিখিরীদের নাড়ি-নক্ষত্র। বিরিজলাল সব ভিখিরীদের খোঁজখবর রাখে। এমন কি কোনও আড়কাঠি চুরি করে অন্যত্র ছেলে বিক্রী করলেও সে আশ্চর্য উপায়ে খবরটা যথারীতি সংগ্রহ করে বশীর খাঁকে

এসে জানায়। তাই বশীর খাঁ বিরিজলালের কথামতো চলে সব সময়। আর আজ পর্যন্ত তার কথা অনুসারে কাজ করে সে কখনও ঠকেনি।

বিরিজলালের ওপর বশীর খাঁর এতটা নির্ভর করার আরও একটা কারণ ছিল। সে কারণটি হচ্ছে বিরিজলালের বৌ রুক্মিণী।

সাধারণ ভিখিরীরা না জানলেও বশীর খাঁ জানে সর্দার জয়ন্ত শেঠ রুক্মিণীকে কতটা ভালবাসে। ভালবাসা মানে অবশ্য সাধারণ অর্থে নয়—অর্থের উৎস হিসেবেই রুক্মিণীর প্রতি সর্দারের এই আকর্ষণ। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যত মেয়ে সংগ্রহ করা হয় তাদের সকলকে মানুষ করার ভার রুক্মিণীর ওপর। আর রুক্মিণী এত চমৎকারভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে তাদের মানুষ করে যে তা নিয়ে সর্দারকে আর বেগ পেতে হয় না।

দু-চার বছর পরে মোটা মূল্যে সেই মেয়েগুলোকে বিক্রী করে সর্দার যা পায় তার সিকি লাভও তার ভিখিরীদের আড্ডা থেকে হয় না। তাই রুক্মিণীর প্রতি সর্দারের এই কৃপাকটাক্ষ।

বিরিজলাল এই দলে আছে আজ প্রায় পাঁচ-ছ বছর। এই পাঁচ-ছ বছর বশীর খাঁরও কাজের সুবিধে হয়েছে অনেকটা। তাই সর্দার জয়ন্ত শেঠের আসার সংবাদ পেয়েই বশীর খাঁ বিরিজলালকে ডেকে পাঠায়।

কিন্তু ডেকে পাঠালেও কোনও সুবিধেই হয় না বশীর খাঁর। একজন ভিখিরী দলপতি কোত্থেকে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—সর্বনাশ হয়েছে সর্দার! বিরিজলাল পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

—ধরা পড়েছে? বশীর খাঁর মুখখানা যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায়।—কি বলছিস্ তুই!

—ঠিকই বলছি সর্দার। একজন আড়কাঠির লোক শয়তানী করে পুলিশে খবর দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে ওকে!

—কে সেই লোক? আমাদের দলের কি?

—হ্যাঁ, আমাদেরই দলে কাজ করত। তবে দু-একটা ছেলে চুরি করে অন্য জায়গাতেও বিক্রী করবার চেষ্টা করেছিল। তাই বিরিজলাল ওকে ভয় দেখিয়েছিল যে সব কথা সর্দারকে বলে দেবে। সেই লোকটা তারপর গোপনে পুলিশে খবর দিয়ে—

—বুঝেছি! বাধা দিয়ে বশীর খাঁ বলে ওঠে—তার নামটা কি তাই শুনি। তারপর কতো বড় তার বুকের পাটা তা পরে দেখা যাবে।

—ওর নাম হচ্ছে কিশোরী। মাণিকতলা অঞ্চলের টাকা আদায় আর ছেলে জোগাড় করার ভার আছে তার ওপর।

—মনে পড়েছে বটে। কিন্তু তার হঠাৎ এতদূর সাহস হলো কি করে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—শুধু বিরিজলালের কথাই যে পুলিশে জানিয়েছে তা নয়, আরও দু-একটা এম্‌নি মারাত্মক কাজ সে করেছে শুনলাম। রুখুলাল নামে একটা ভিখিরী আমাদের দলে আছে বড় সর্দারের বাবার আমল থেকে। আজ রিপোর্ট পেলাম, সামান্য কারণে সে নাকি রুখুলালকে মারধোর করেছে। এমন কি তাকে সারা রাত খেতেও দেয়নি।

ইতিমধ্যে বিরিজলাল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। সমস্ত বিষয় জানতে পেরে সে রুখুলালকে মুক্ত করে দেয় এবং তার খাবার ব্যবস্থাও করে দেয়। এর মধ্যেই আবার কিশোরী ফিরে এসে সমস্ত কথা জেনে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বিরিজলালের সঙ্গে তার বাদানুবাদ হতে থাকে এই ব্যাপার নিয়ে। বিরিজলালও তাতে রেগে গিয়েছিল বলেই নাকি ওভাবে পুলিশে খবর দিয়েছে সে। এমন কি পুলিশের কাছে দলের দু একটা গোপন তথ্যও সে ফাঁস করে দিয়েছে। প্রয়োজন হলে সে নাকি দলের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে সাক্ষী দিতেও রাজী হয়েছে বলে শুনতে পেলাম।

—বুঝেছি। বড় সর্দার এলে এ সব বিষয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবশ্যই করতে

হবে! আর সেই সঙ্গে নতুন তৈরী করা ভিখিরীগুলোকেও তাঁকে দেখাতে হবে। মনে হয় এবার সব দেখে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হবেন।

—কিন্তু একটা কথা সর্দার—

—কি কথা বলো? ভিখিরী দলপতির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে বশীর খাঁ।

—আমার আর একটু সুবিধের ব্যবস্থা যদি করেন তবে আমি চিরদিন আপনার প্রতি একান্ত অনুগত হয়ে থাকব!

—বেশ বেশ। গম্ভীরকণ্ঠে বশীর খাঁ বলে। এখন একটু ওধারে যাও—আর একটু ভাবতে দাও আমাকে!

বশীর খাঁকে যথেষ্ট চিন্তিত মনে হয়।

শুধু বিরিজলালের জন্যেই তার এই চিন্তা নয়—তার চিন্তা কিশোরীর জন্যেও। একে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে না পারলে বড় সর্দারের কাছে তার মান থাকবে না। আর বিরিজলাল পুলিশের হাতে পড়লে রুক্মিণীর সাহায্যও আর বিশেষ পাওয়া যাবে না!

বশীর খাঁ চিন্তিতভাবে পায়চারী করতে থাকে।

তিন

—তদন্ত ; রিপোর্ট—

বিভাগীয় তদন্ত একটা অদ্ভুত জিনিস। এমন সব অজস্র জটিলতার মধ্য দিয়ে তদন্তচক্র এগিয়ে চলে যে কোনও একটা বিষয়ে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করতে হলে দীর্ঘদিনের পূর্বে কোনও কিছু ঘটে ওঠা সম্ভব নয়।

ঠিক তেমনি ব্যাপার ঘটেছিল বোম্বাইয়ের একটি সি. আই. ডি. চীফের রিপোর্ট ব্যাপারেও।

বোম্বাইয়ের একজন সি. আই. ডি. চীফ অফিসার মিঃ স্বামীনাথম্ একটা গুণ্ডার আড্ডায় হানা দিয়ে তদন্তক্রমে একটা নতুন ধরণের কেসের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সংগ্রহ করলেন।

ব্যাপারটা হচ্ছে, একজন গুণ্ডা ধরা পড়ে স্বীকার করল যে সে স্বেচ্ছায় আইন অমান্য করেনি, বিরাট একটা দলের হুকুমেই সে এ কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এর সঙ্গে জড়িত যে দল তারা দুটি-একটি নয়, দলে দলে ভিখিরীদের নিয়ে বিরাট ব্যবসা চালায়। তা ছাড়াও তারা ছোট ছোট মেয়েদের ধরে এনে মানুষ করে বিদেশে চালান দেয়।

সবকিছু শুনে মিঃ স্বামীনাথম্ যে অবাক হলেন তা নয়, এদেশে অনুষ্ঠিত নতুন এক ধরণের অপরাধ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করলেন তিনি।

দু-একটা আড্ডায় তিনি হানা দিলেন। কিন্তু কোনও সুফল হলো না। এদের কর্মপদ্ধতি অত্যন্ত নিখুঁত। তবে একটা জিনিস তিনি জানতে পারলেন। তা হচ্ছে, এর কর্মকেন্দ্র হচ্ছে কোল্‌কাতা। কোল্‌কাতা থেকে অপহৃত ছেলে-মেয়েদের এদেশে চালান দেওয়া হয়, আর এদেশের ছেলে-মেয়েদের পাঠান হয় কাশী অথবা কোল্‌কাতায়।

মিঃ স্বামীনাথম্ সি. আই. ডি.র আপার অথরিটিকে জানালেন এই বিষয়টা। তিনি জানালেন বোম্বের পুলিশ কমিশনারকে।

পুলিশ কমিশনার ফাইলটা দেখে খানিকটা অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে সেটা আগাগোড়া নিরীক্ষণ করে মনে মনে বললেন—যত্‌তো সব আজগুবি রিপোর্ট! কোথা থেকে কি গল্প শুনে একেবারে এমন একটা অসম্ভব কল্পনা করে বসল। সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট এসে হাজির! এ রকম আজগুবি ঘটনা সম্ভব নাকি! বলে কিনা, ইণ্টার-প্রভিন্সিয়াল্ বেগার্ বিস্‌নেস্! যত্‌তো সব পাগলামি!

পুলিশ কমিশনার পাঁচ বছর বিলেতে ছিলেন। তাই তিনি এদেশের যাবতীয় ক্রাইম্‌কে বিলিতি দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই দেখতে অভ্যস্ত।

বিলেতে ভিখিরীদের কোনও আস্তানা নেই। পথে-ঘাটে এত ভিখিরী উপদ্রবও সেখানে সম্ভব নয়। তাই বেগার্‌ বিস্‌নেস্‌ কথাটা শুনে তিনি মনে মনে হাসলেন। এ যেন কোন্‌ রূপকথার একটা গল্প!

কিন্তু তবু রিপোর্টের একটা স্টেপ্‌ নিতেই হবে। তিনি ডেপুটি কমিশনারের কাছে ব্যাপারটা পাঠালেন রিপোর্টের জন্যে। ডেপুটি কমিশনার ত ব্যাপার দেখে হেসেই খুন! তিনি মনে মনে ভাবলেন, এই স্বামীনাথম্‌ লোকটার মাথায় নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে!

কিন্তু তবুও রিপোর্ট নেবার জন্যে তিনি ব্যাপারটা এন্‌কোয়্যারীর জন্য পাঠালেন তাঁর অধীন বিভিন্ন থানার ও. সি.দের কাছে।

ও.সি.দের মেজাজ একটু কড়াই হয়ে থাকে সাধারণত। তার ওপর এ আজগুবি ব্যাপারের তদন্ত করতে হবে শুনে তাঁরা ত রেগে অস্থির!

ও. সি.রা ডি. ও. সি., জমাদার, হাবিলদার ইত্যাদির কাছ থেকে মোটামুটি শুনে রিপোর্ট লিখলেন—'দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই এ অধিকসংখ্যক ভিখিরীদের উৎপত্তির কারণ।'

কেউ বা লিখলেন—'এই ভিখিরী সম্প্রদায় নিজেদের আস্তানায় থাকে, খায় ও ভিক্ষা করে। ওদের কেউ পরিচালনা করে না।'

আসলে এই ব্যাপারের তদন্ত যে কিছুই হলো না তা বলাই বাহুল্য। জমাদারেরা রাস্তার মোড় থেকে দু একজন করে ভিখিরীকে ধরে ধরে গরম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। তারা প্রাণের ভয়ে জানাল যে তারা শুধু খায় আর ভিক্ষা করে। এর বেশি জানবার আর দরকার কি?

তাই জমাদারদের কথামত রিপোর্ট লেখা হলো। সেই রিপোর্ট ডি. ও. সি. হয়ে ও. সি.র কাছে হাজির হলো যথারীতি।

এম্‌নি সব অজস্র অর্ধ-সত্য, অর্ধ-মিথ্যা রিপোর্ট গেলেও দু-একজন ও. সি. লিখলেন—'ব্যাপারটার মধ্যে জটিলতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের ধারণা এই সব ভিখিরীদের উৎপত্তির মূল উৎস হচ্ছে কোল্‌কাতা।'

এই সব রিপোর্ট ঘুরতে ঘুরতে যখন বোম্বের পুলিশ কমিশনারের কাছে পৌঁছল তখন তিন মাসেরও বেশি দিন কেটে গেছে।

ব্যাপারটার তদন্ত এত স্বল্প (বিভাগীয় মতে) দিনের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে দেখে পুলিশ কমিশনার খুবই খুসী হলেন। তিনি তখনই ইণ্টার-প্রভিন্সিয়াল্‌ কন্‌স্‌পিরেসীর এই বিরাট কেসটার সংবাদ বাংলায় প্রেরণের চেষ্টা করতে লাগলেন।

কোল্‌কাতার পুলিশ কমিশনার বোম্বে থেকে এই খবরটা পেয়ে যখন যথারীতি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন তখন তাঁরই বিভাগ থেকে একজন ডেপুটি কমিশনার জানালেন —কোল্‌কাতায় আজকাল যে পরিমাণ চুরি, জোচ্চুরি, পকেটমার, ব্ল্যাক্‌মেলিং ও ফোর টোয়েন্টির কেসগুলো হচ্ছে তার সঙ্গে জড়িত একটা বিরাট দল। আর সেই দলের নায়ক হচ্ছে মাত্র একজন লোক।

এই দলের অধীনে হাজার কয়েক লোক আছে। তাদের অধিকাংশ করে ভিক্ষাবৃত্তি। দেশের বুকে যে সব ছেলে ও মেয়ে চুরি যায় তাও চুরি করে এরাই। আবার এদের দলের লোক ওই সব ক্রাইম্‌ও করে থাকে।

এই সব চুরি-যাওয়া ছেলে-মেয়েদের ওরা একটি গোপন আড্ডায় মানুষ করে থাকে। যথারীতি এই ছেলে-মেয়েরা বড় হয়। তাদের অধিকাংশকে এরা

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত করে। সুন্দরী মেয়েদের মানুষ করে তুলে অধিক মূল্যে বিক্রী করা হয় নারী-ব্যবসায়ীদের কাছে।

কিন্তু এত সব জানলেও কোথায় এই আড্ডা বা কে যে এর পরিচালক সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র খবরও পুলিশবিভাগ জানতে পারেনি।

ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের রিপোর্ট পড়ে পুলিশ কমিশনার তাঁকে ডেকে পাঠালেন।

তিনি ডেপুটি কমিশনার মিঃ মরিসনকে বললেন—শুনুন মিঃ মরিসন, আপনার রিপোর্টের যে যথেষ্ট গ্র্যাভিটি আছে সে কথা স্বীকার করি আমি। কারণ আমিও বোম্বে থেকে সম্প্রতি একটি নোটে জানতে পেরেছি যে, কোল্‌কাতা থেকে রপ্তানী করা ভিখিরী ছেলেদের দিয়ে সেখানকার একদল লোক ব্যবসা চালাচ্ছে। আমার মনে হয় নেহাৎ সামান্য বলে যে ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, আসলে তা সামান্য নয়। এর পেছনে হয়ত রয়েছে বিরাট একটা জটিলতা। রহস্য। আর তার সমাধান করতে হলে চাই উপযুক্ত একজন লোক যে এর ভেতরে প্রবেশ করে সমস্ত মিস্‌ট্রি সল্‌ভ্‌ করতে পারে।

—তাই নাকি স্যর?

—হ্যাঁ। তাই আমি চাই একজন বিশ্বস্ত লোকের হাতে এ ব্যাপারের তদন্ত ভার দিতে।

—কিন্তু পুলিশবিভাগে তেমন কর্মঠ ও বিশ্বস্ত লোক—

—জানি। সেইজন্যেই আমি চাই বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীকে গোপনে এই ব্যাপারের পেছনে নিয়োগ করতে।

—ঠিক বলেছেন স্যর। হি ইজ্‌ দি ফিটেষ্ট্‌ ম্যান্‌। ওঁর চেয়ে ভাল লোক আর কোথাও যে মিলবে না এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

—তাহলে আমি আজকেই তাঁকে ফোন করব ত?

—হ্যাঁ স্যর।

পুলিশ কমিশনার মিঃ মরিসনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—আপনি তাঁকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করবেন এটাই আমি চাই মিঃ মরিসন।

—নিশ্চয়ই স্যর, মিঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। তাঁর সঙ্গে একত্রে কাজও করেছি এর আগে।

—তাহলে ত খুবই ভাল হয়!

পুলিশ কমিশনার টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলে উঠলেন—হ্যালো, পুট মি টু সাউথ থ্রি থ্রি ডবল থ্রি···

চার

—বিচিত্র কেস—

পুলিশ কমিশনার দীপককে তখন টেলিফোনে পেলেন না। এক্সচেঞ্জ বলল—এন্‌গেজ্‌ড্‌।

তার কারণও অবশ্য ছিল।

দীপক তখন শুনছিল বড়বাজারের ও. সি. মিঃ সিংহের কথা তার টেলিফোনে।

মিঃ সিংহ দীপকের পূর্বপরিচিত পুলিশ অফিসার। একটা জটিল কেসে বিরিজলালকে অ্যারেষ্ট্‌ করে তিনি এই কেসটার পেছনে অদ্ভুত একটা চক্রান্তজালের গন্ধ পান। তাই তিনি বাধ্য হয়ে ফোন করলেন ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীকে।

দীপক রিসিভার তুলে প্রশ্ন করে—হ্যালো, কে?

—আমি বড়বাজার থানা থেকে বলছি। আমি মিঃ সিংহ।

—ও, আপনি? তা হঠাৎ কোনও জরুরী কেস নাকি?

—জরুরী না হলেও রহস্যপূর্ণ।

—কি রকম ?

—বিরিজলাল নামে একজন লোককে অ্যারেষ্ট্ করেছি। তার কাছ থেকে যে হিস্ট্রি পাচ্ছি তা সত্যই অদ্ভুত। কল্পনাতীত! সো স্ট্রেঞ্জ এ কেস ইউ ক্যান্ট ড্রিম্ অফ্!

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, আমি পাছে ভালভাবে ক্রশ করতে না পারি, কিংবা কোনও পয়েন্ট মিস্ করি তাই আপনাকে জানাচ্ছি।

—খুব ভাল। আই য়্যাম্ ভেরী গ্ল্যাড্ ফর ইওর কাইণ্ডনেস্।

—তাহলে এক্ষুণি আসছেন ত ?

—হ্যাঁ, এক্ষুণি।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দীপক সাজগোজ করে বের হবার জন্যে প্রস্তত হচ্ছে এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন।

পুলিশ কমিশনার দীপককে ফোন করলেন।

সব শুনে দীপকের মুখ আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে মনে সে ভাবল, এর সঙ্গে বড়বাজারের ও. সি. মিঃ সিংহের ফোনের কোনও সম্বন্ধ নেই ত ?

পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে সময় য়্যাপয়েন্ট্ করে নিয়ে দীপক বেরিয়ে পড়ল বড়বাজারের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু গেটের সাম্‌নেই দেখা রতনলালের সঙ্গে।

—আরে, একা একা চলেছিস্ কোথায় ?

—একটা জরুরী কেসের ব্যাপারে চলেছি বড়বাজার। সেখান থেকে লালবাজার হয়ে ঘুরে আসব।

—অনেকগুলো কেস্ একসঙ্গে এসে জুটেছে বুঝি ?

—হ্যাঁ। তবে মিঃ সিংহ ফোন করেছেন, একটা অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ কেস নাকি এসে পড়েছে তাঁর হাতে। তিনি একা সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া না করে আমার সাহায্য চান। তাই চলেছি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বিরিজলাল নামে একটা লোককে অ্যারেষ্ট্ করে তিনি নাকি এই রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন। বিরিজলালকে তোর মনে আছে নিশ্চয় ?

—হ্যাঁ, অনেকদিন আগে কি একটা ব্যাপারে তাকে যেন ফলো করেছিলাম আমরা!

—তারপর তার সাক্ষাৎ পাইনি বহুদিন। এবার দেখা যাক তার মাধ্যমে কি আবার নতুন হদিস মেলে!

—কিন্তু আমি এক্কেবারে বাদ পড়ে গেলাম ?

—তা কেন ? তুই ইচ্ছে করলে আসতে পারিস্। তুই বাড়িতে ছিলি না, তাই একা—

—কিন্তু মনে রাখিস, আমাকে ছাড়া একা আজ পর্যন্ত কোনও কেসে তুই সফল হতে পারতিস্ না!

হেসে দীপক বলে—তা কি বলেছি আমি ? দীপক বুঝতে পারে রতন অভিমান করেছে। সে তাই ধীরকণ্ঠে বলে—এ কেসেও তোর সাহায্য লাগবে রতন। কোনও লোককে ফলো করবার দরকার হলে, তোর মত এত মূল্যবান সাহায্য আমি কারও কাছ থেকে আশা করতে পারি না। তা ছাড়া তোর মত চট্‌পট্ কাজ সারতে পারে কে ? তাই তোর কথা আমি ভাবছিলাম। কিন্তু তোকে না পেয়ে অগত্যা একাই রওনা হতে হচ্ছিল আমাকে।

মুহূর্তে রতনের অভিমান জল হয়ে যায়। সে হেসে বলে—সত্যি ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। চল্ না।

কিন্তু দীপক তখন মোটেই ধারণা করে উঠতে পারেনি যে সত্যি আজ রতনের প্রয়োজন তার কাছে একটু পরেই অপরিহার্য হয়ে দেখা দেবে।

পাঁচ

—জয়ন্ত শেঠ ঃ রুক্‌মিণী—

কোল্‌কাতা থেকে কিছু দূরে হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি সেই দু নম্বর আড্ডায় নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।

বেলা এখন সাড়ে দশটা।

বশীর খাঁ অদ্ভুত উত্তেজিত ভাবে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার উত্তেজনা দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এর কারণ শুধুমাত্র জয়ন্ত শেঠের আগমনই নয়, অন্য কোথাও তার কারণ নিহিত আছে নিশ্চয়ই।

সে কারণটা আর কিছু নয়—বিরিজলালের আকস্মিক অন্তর্ধান। যে মুহূর্তে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল যে বিরিজলাল পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, তখনই বশীর খাঁ একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল।

বিরিজলাল এত সব খবর জানে—পুলিশের চাপে সে যে কোনও মুহূর্তে সব খবরগুলো বলে ফেলতে পারে। তাছাড়া আর একটা ভয় এই যে, বিরিজলালের আকস্মিক অন্তর্ধানের কথা জয়ন্ত শেঠ জানতে পারলে সবদিক থেকেই মুস্কিল হবে। জয়ন্ত শেঠ তাহলে বশীর খাকেও সন্দেহ করতে সুরু করতে পারে।

বশীর খাঁ ভাবল, বিরিজলালের ব্যাপারটা যদি চাপা দেবার জন্যে কোনও ব্যবস্থা করতেই হয়, তবে তা জয়ন্ত শেঠ কোল্‌কাতা ছেড়ে চলে যাবার পর করাই ভাল।

বশীর খাঁ চিন্তা করল, এক্ষুনি কার সাহায্য নিলে ব্যাপারটার সুরাহা হতে পারে! একটু চিন্তা করতেই তার মনে পড়ল কিশোরীর নাম। কিশোরী মাণিকতলা অঞ্চলের আড়কাঠি। সেখানকার ভিখিরীদের টাকাপয়সা আদায় করে জমাও

দেয় সে। কিন্তু তার হাতেও বিরিজলালের মতো অনেক খবরাখবর থাকে। তার সাহায্য নিলে এ যাত্রা সুবিধে হয়।

কিশোরী অবশ্য দু-একটা অন্যায় কাজ করেছিল সম্প্রতি। প্রথমত, রুখুলালকে মারধোর। দ্বিতীয়ত, কিশোরী যখন বিরিজলালের উল্টো দলের লোক তখন সন্দেহ করা যেতে পারে যে তার গ্রেপ্তারের পেছনে হয়ত কিশোরীরও হাত আছে।

কিন্তু এত সব জানলেও আপাতত কিছু করা যাচ্ছে না। তার সাহায্য না নিলে এ যাত্রা সব কিছুর ব্যবস্থা করা খুবই মুস্কিল।

বশীর খাঁ তাই হাঁকল—কোই হায়?

একজন সর্দার ভিখিরী বাইরে দাঁড়িয়েছিল। সে ছুটে এসে প্রশ্ন করল—কি বলছেন সর্দার?

—একটা জায়গায় তোমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। পারবে?

—কোথায় সর্দার?

—মাণিকতলা।

—বুঝেছি সর্দার। কিশোরীর আড্ডায় ত?

—হ্যাঁ। তাকে এক্ষুণি এখানে ডেকে আনবে। বিশেষ দরকার। বুঝেছ ত? শোন, যত তাড়াতাড়ি পার তাকে এখানে এনে উপস্থিত করতে হবে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করলে মোটা বকশিস পাবে তুমি। পাঁচ টাকা বকশিস দেওয়া হবে তোমাকে।

—আজ্ঞে সর্দার, এক্ষুণি ডেকে আনছি তাকে।

ছুটতে ছুটতে লোকটি বেরিয়ে যায়।

বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা।

একজন আলখাল্লা-পরা মুসলমান ফকীরকে দু নম্বর আড্ডার সাম্‌নে দেখা গেল।

একটু ঘুরে ফিরে আড্ডার ভিতরে উঁকিঝুঁকি মেরে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছিল সে। এমন সময় একজন লোক হঠাৎ তার হাতখানা পেছন থেকে চেপে ধরে বলল—এই কোন্ হ্যায় তুম্?

মুসলমান ফকীর কথা না বলে মৃদু হাসল। তারপর তাকে প্রশ্ন করল—বশীর খাঁ আছে ভেতরে?

—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কে?

গম্ভীরকণ্ঠে মুসলমান ফকীর বলল—সে কথা এখানে নয়। ভেতরে গিয়ে বশীর খাঁর সঙ্গে সে কথা হবে।

লোকটির কণ্ঠে কেমন যেন একটা আদেশের সুর। তাতে মনে জাগে সম্ভ্রম। জাগে ভয় ও শ্রদ্ধা।

—বেশ, চলো ভেতরে। কিন্তু মনে থাকে যেন বাছাধন, যদি বুঝতে পারা যায় যে তুমি টিকটিকি তাহলে কিন্তু—

লোকটি যে ভঙ্গিটা দেখাল তার অর্থ হচ্ছে টিকটিকি হলে তাকে একেবারে খতম্ করে দেওয়া হবে।

মুসলমান ফকীর ভ্রূ কুঁচকে বলল—অন্দরমে চলো।

দুজনে ভেতরে প্রবেশ করে। সাম্‌নের ঘরটায় দেখা হয় বশীর খাঁর সঙ্গে।

লোকটি বলে—সর্দার, এই লোকটা আড্ডার সাম্‌নে ঘোরাঘুরি করছিল। আমার মনে কেমন যেন সন্দেহ হলো, তাই একে নিয়ে এলাম ধরে।

বশীর খাঁ ফকীরের দিকে তাকাল। কাঁচাপাকা চুল আর সুদীর্ঘ দাড়ি। পরনে আলখাল্লা আর পাজামা। পায়ে নাগরাই।

বশীর খাঁ মনে করতে পারল না, এর আগে এই লোকটিকে সে কোথায় দেখেছে।

মুসলমান ফকীর একটু হেসে বলল—তোমার কেরামতি বোঝা গেছে বশীর খাঁ। আমাকেই বেমালুম ভুলে বসে আছ—

কথার শেষে লোকটি মুখের লম্বা দাড়ি আর পরচুলা একটানে খুলে ফেলতেই তার মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করল একখানি অতি পরিচিত মুখ।

—বন্দেগী সর্দারজী!

বশীর খাঁকে কেমন যেন অপ্রতিভ মনে হয়।

মুসলমান ফকীর আর কেউ নয়, স্বয়ং সর্দার জয়ন্ত শেঠ। মৃদু রহস্যময় হেসে সে বলে—এ রকম মেক্‌আপ্ না করতে পারলে আর ব্যবসা চালাতে পারতাম না, বুঝলে খাঁ সাহেব?

বশীর খাঁ লজ্জিতভাবে বলে—আমার বোকামির জন্যে—

—না না, তোমার লজ্জার কারণ নেই বশীর খাঁ। আমারই বরং খুশী হওয়া উচিত এই ভেবে যে এতদিকে নির্ভুল মেক্‌আপ্ অন্তত করতে শিখেছি।

—তাছাড়া আমরা ত আপনারই সাকরেদ সর্দারজী। আমাদের ত আপনার কাছে হেরে গিয়ে লজ্জা পাওয়াই উচিত নয়।

—হেরে গেলাম বশীর খাঁ। তোমার কথার প্যাঁচে একেবারে হেরে গেলাম আমি। জয়ন্ত শেঠ হাসতে হাসতে বলে—কিন্তু এধারের সব খবরাখবর কি?

—সব দেখাচ্ছি আপনাকে। বশীর খাঁ বলে—নতুন নতুন যা সব তৈরী করছি সর্দার, একেবারে নাম্বার ওয়ান!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। দেখুন না।

বশীর খাঁর ইঙ্গিতে একজন লোক গিয়ে কিশোরীকে ডেকে নিয়ে আসে।

—একি, কিশোরী যে!

—হ্যাঁ সর্দার। নতুন দুটিকে যা তৈরী করেছি সর্দার, দেখেই একেবারে ঘাবড়ে যাবেন এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

একটু পরেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দুজন লোক। একজনের চোখের

মণিটা সম্পূর্ণ উল্টে দেওয়া হয়েছে। তাকে দেখলেই অন্ধ বলে বোঝা যায়। অন্যজন বোবা একটি বছর দশেকের ছেলে। বশীর খাঁর দিকে ইঙ্গিত করে ছেলেটি কিছু ভিক্ষে চাইল।

সর্দার ছেলেটিকে হাঁ করিয়ে দেখলে, তার মুখের মধ্যে জিভের বদলে একতাল মাংসপিণ্ড।

এবার কিশোরী ইঙ্গিত করতেই লোকটি হঠাৎ চোখের মণিটা ঘুরিয়ে ফেলল। দেখা গেল তার চোখ ঠিক আছে। অন্যজনও হেসে কথা বলল। দেখা গেল তার জিভও ঠিক ছিল। সবই মেক্‌আপ্‌এর কায়দা।

জয়ন্ত শেঠ খুশী হয়ে দুজনকেই চার আনা করে বক্‌শিস দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই সেলাম করে প্রস্থান করল।

জয়ন্ত শেঠ হেসে বলল—বলিহারী কিশোরী, তুহারী কাম্‌!

কিশোরী কোনও কথা বলল না। ধীরে ধীরে সে একজন লোককে কি যেই ইসারা করল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। পিঠের ওপর তার মস্ত বড় একটা 'টিউমার'। দেহটা সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। দুটো পায়েই পোড়া ঘা। বিষাক্ত ক্ষত দিয়ে পুঁয গড়াচ্ছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে এসে একটা লাঠিতে ভর দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

লোকটাকে দেখে জয়ন্ত শেঠের মত নৃশংস লোকের মনেও কেমন যেন অস্বস্তির সঞ্চার হলো। কি অসহ্য দুঃখ সহ্য করে যে ও বেঁচে আছে তা ভাবাই যায় না। কি অপরিসীম দুর্বিষহ জীবন!

এই লোকটাকে দেখে বশীর খাঁও অবাক হয়ে গিয়েছিল। এরকম লোক যে দলের মধ্যে আছে তা সে জানত না।

জয়ন্ত শেঠ কিশোরীর দিকে চেয়ে বলল—ওকে নিয়ে যাও এক্ষুণি এখান থেকে।

কিশোরী বলল—ভাল করে দেখুন না সর্দারজী।

কিশোরীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দেখা গেল তার পিঠের টিউমারটি একটি নকল মাংসপিণ্ড। পোড়া ঘাগুলি রবার আর গাম্‌এর সাহায্যে তৈরী করা নকল পোড়া ঘা। রুগ্‌ণ বীভৎস লোকটি যখন স্বাভাবিক আকার ধারণ করে সর্দার জয়ন্ত শেঠকে নমস্কার জানাল তখন সে অবাক হয়ে শুধু ভাবতে লাগল—এও কি সম্ভব?

এমন সময় ভণ্ড সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সজ্জিত একজন লোক ঘরের মধ্যে ঢুকল। তার সঙ্গে একটি বছর সাতেকের ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে। মেয়েটি কাঁদছিল তার বাবা মার কাছে ফিরে যাবার জন্যে।

কিশোরী বলল—এই লোকটি সন্ন্যাসীর মেক্‌আপ্‌ নিয়ে আড়কাঠির কাজ করে সর্দার। আজই এই মেয়েটিকে ও নিয়ে এসেছে। আপনি বলেছিলেন আপনার ওই রকম একটি মেয়ে চাই।

—হ্যাঁ, কয়েক বছর পরেই একে পুরো পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রী করতে পারব। খুশীভরা কণ্ঠে বলল জয়ন্ত শেঠ।

কিন্তু কথা শেষ হলো না।

পেছন থেকে কে যেন নারীকণ্ঠে বলে উঠল—কিন্তু তা করতে হলে আমার সাহায্য তোমার অবশ্যই চাই, কি বল সর্দারজী?

সর্দার জয়ন্ত শেঠ পেছনে চেয়ে দেখে পেছনের দ্বারপথে এসে দাঁড়িয়েছে একটি নারীমূর্তি। নারী আর কেউ নয়—ওই হচ্ছে রুক্‌মিণী, পুলিশের হাতে ধৃত বিরিজলালের স্ত্রী।

রুক্‌মিণী বলে চলল—তোমার আশায় ছাই পড়ল সর্দার। ওকে তৈরী করবার ভার আর আমি নিতে পারব না।

—তার মানে? ক্রুদ্ধকণ্ঠে জয়ন্ত শেঠ প্রশ্ন করে।

—মানে আর কিছুই নয়। এইভাবে নিরীহ মেয়েদের জীবনকে কলুষিত করে গড়ে তোলবার চেয়ে মৃত্যুও আমার ভাল। আমি আজই এখান ছেড়ে চলে যাচ্ছি সর্দার। আর কোনদিনই তোমাদের কাজের সহায়তা করে এভাবে কচি কচি মেয়েদের সর্বনাশ করতে পারব না আমি। এই তোমার কাছে আমার শেষ কথা!

—সেকি?

—হ্যাঁ, যার আকর্ষণে এতদিন এখানে ছিলাম সেই যখন পুলিশের হাতে ধরা পড়ল, তখন মিথ্যা এই নরকে আর একটি মুহূর্তও কাটাতে চাই না আমি।

—কার কথা বলছ তুমি রুক্‌মিণী? বিরিজলাল কি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে?

—হ্যাঁ। তুমি না জানলেও আমি তোমাকে জানাচ্ছি। সে এখন কোন অন্ধকার কারাগারে একা বসে সময় কাটাচ্ছে তা কে জানে!

—বিরিজলাল বন্দী! সর্দার জয়ন্ত শেঠের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়ে।

তার ভঙ্গীর দিকে চেয়ে কিশোরী কিংবা বশীর খাঁর মুখ দিয়ে কোনও কথাই বের হয় না।

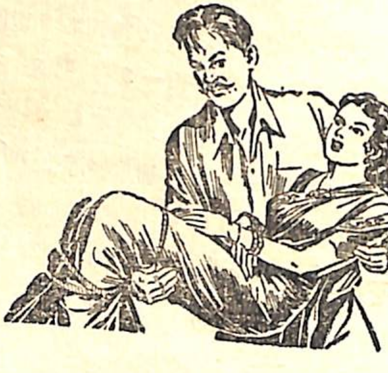

ছয়

—বিরিজলালের উক্তি—

—এ তুমি কি বলছ রুক্‌মিণী? সত্যিই যদি বিরিজলাল বন্দী হতো পুলিশের হাতে তবে নিশ্চয়ই বশীর খাঁ এতক্ষণ তা আমাকে জানাত। নিশ্চয়ই সে বন্দী নয়। সে পলাতক! সে নিশ্চয়ই দল ছেড়ে পালিয়েছে! তাই নয় কি বশীর খাঁ?

—না সর্দার, আমরা এখনও ঠিক জানি না যে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, না পালিয়েছে। তবে সে যে অন্তর্হিত হয়েছে এ কথা সত্যি।

—মিথ্যা কথা। রুক্‌মিণী যেন গর্জে ওঠে দলিতা ফণিনীর মতো। বিরিজলাল ধরা পড়েছে সর্দার! আর তার মূলে কে আছে তাও আমি জানি।

—কে আছে এর মূলে?

—এতক্ষণ ধরে আপনি যার প্রশংসা করছিলেন সেই কিশোরীর চক্রান্তেই সে আজ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

—মিথ্যা কথা! সজোরে বলে ওঠে বশীর খাঁ।

—ডাহা মিথ্যা সর্দার! কিশোরী বলে।

—তোমার কথার কোনও প্রমাণ আছে রুক্‌মিণী? জয়ন্ত শেঠ রুক্‌মিণীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

—নিশ্চয়ই আছে। রুক্‌মিণী বলে। এক্ষুণি বড়বাজার থানায় কোনও লোক দিয়ে খোঁজ করালেই জানা যাবে যে সে পুলিশ হাজতে আছে কিনা।

—ঠিক কথা। জয়ন্ত শেঠ আপন মনেই বলে ওঠে। আমি আজই খোঁজ

নেবার ব্যবস্থা করছি। এক্ষুণি। কি কিশোরী, তোমার এতে কোনও আপত্তি আছে ?

—অবশ্যই নয়। কিশোরী বলে ওঠে।—কিন্তু সদার, সে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেই কি এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে আমিই তাকে ধরিয়ে দিয়েছি ?

—তা অবশ্য নয়। আচ্ছা রুক্মিণী, বিরিজলালকে ধরিয়ে দিয়ে কিশোরীর কি লাভ ?

—যথেষ্ট লাভ আছে সর্দার। ও চায় দলের সমস্ত কিছু স্থানীয় পরিচালনার দায়িত্ব ওর হাতে যায়। কিন্তু তা ত আর সম্ভব হচ্ছে না, যতক্ষণ বিরিজলাল আছে। কাজেই—

—কিন্তু শুধু সেইজন্যেই এভাবে সে—

—এ কথা বললে আমি বলব, তুমি কিশোরীর সঠিক পরিচয় এখনও জান না সর্দার। ওর মত হীন, নীচ, জঘন্য চরিত্রের লোক—

—থাম ! কিশোরী যেন গর্জন করে ওঠে।—তোমার অনর্গল বক্তৃতার স্রোত বন্ধ কর রুক্মিণী !

—কেন বন্ধ করব আমার কথা ? তোমার হুকুমে নাকি ? সর্দারের সামনে আমার কথা বন্ধ করবার কোন ক্ষমতা তোমার নেই কিশোরী।

কিশোরী রুক্মিণীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন প্রচণ্ড বেগে একটা লাফ মেরে তার দিকে এগোতে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বশীর খাঁ তার হাত ধরে তাকে নিবৃত্ত করে বলে—এখন কলহ করে অযথা দলের দুর্দিনকে ডেকে আনা আমাদের উচিত নয়, কি বলেন সর্দার ?

সর্দার জয়ন্ত শেঠ ধীরকণ্ঠে বলে—তোমরা সকলে মিথ্যা মাথা গরম করছ রুক্মিণী আর কিশোরী। সব কিছু কাজের ব্যবস্থা করবার জন্যে আমি আছি।

কিশোরী, তুমি যাও। আর রুক্মিণী, তুমি দল ত্যাগ করে চলে যাবার সংকল্প আপাতত ত্যাগ কর। আগে দেখি সমস্ত ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে।...

মিঃ সিংহের জরুরী ফোন পেয়ে দীপক সোজা বড়বাজার থানায় চলে এলো রতনকে সঙ্গে নিয়ে।

মিঃ সিংহ দীপকের জন্যে উদ্গ্রীবভাবে অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ।

—আসুন মিঃ চ্যাটার্জী। সাদরে দীপককে আমন্ত্রণ জানান তিনি।

—নমস্কার মিঃ সিংহ। এবার ওধারের ব্যাপারটা কি খুলে বলুন ত !

—ব্যাপারটা বলতে হলে আগে লোকটাকে আনাতে হবে। আপনি তাকে ক্রশ করলেই সব জানতে পারবেন।

—ধন্যবাদ মিঃ সিংহ !

মিঃ সিংহ হাঁকলেন—দরওয়াজা !

—জী হুজৌর !

দরওয়াজা সশব্দে বুটজুতোটা মেঝেতে ঠুকে সেলাম জানিয়ে দণ্ডায়মান হলো।

—সাত নম্বর কয়েদীকে নিয়ে এস।

—হুজৌর !

দরওয়াজার সশব্দ অভিবাদন ও প্রস্থান।

একটু পরেই দুজন সশস্ত্র প্রহরীর তত্ত্বাবধানে একজন কয়েদীকে ঘরের মধ্যে এনে দাঁড় করান হলো।

দোহারা চেহারার লোকটি। পেশীবহুল দেহ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। প্রথম দর্শনে একটু নিরীহ লোক বলেই মনে হয়। কিন্তু ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলে বোঝা যায় লোকটি যথেষ্ট চতুর ও তীক্ষ্ণধী।

—তোমার নাম কি ?

অত্যন্ত হাল্কাভাবে দীপক প্রশ্ন করে।

—বিরিজলাল, হুজুর।

—নিবাস?

উত্তর নেই।

—কাজ করতে কোথায়?

—হাওড়া।

—কি কাজ?

—মালগুদোমে চাকরী।

—গুদোম কোথায়?

—হাওড়া বেলগাছিয়ার কাছাকাছি।

হো হো করে হেসে উঠে দীপক বলল—মিথ্যা কথা বলে এভাবে ধরা পড়ার কোনও মানে হয় না বিরিজলাল। বেলগাছিয়াতে তেমন বড় মালগুদোম একটাও নেই। যা আছে তার মালিকরা সকলেই আমাকে চেনে। খোঁজ করলেই তোমার মিথ্যা কথা ধরা পড়ে যাবে। তা ছাড়া আমি যে দু-চারবার ওই অঞ্চলে গেছি, কোনওবারই ত তোমাকে সেখানে দেখিনি।

বিরিজলাল উত্তর দেয় না।

দীপক বলে—সত্যি কথা বল বিরিজলাল। তোমার বোধ হয় মনে নেই, আজ থেকে চার পাঁচ বছর আগে তোমাকে আমি একটা ছেলেচুরির ব্যাপারে গ্রেপ্তার করেছিলাম। অবশ্য প্রমাণের অভাবে সেবার তুমি ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলে, কিন্তু সেই থেকে তোমার প্রতি আমার আগাগোড়া একটা সন্দেহ ছিল। তাই তুমি যে কোথাও চাকরী কর না তা আমি বুঝতে পারছি। তবে সত্যি কথা যদি তুমি বল, কিংবা যে দলে আছ তাদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য কর, তবে আমি চেষ্টা করব যাতে তোমার বেশী সাজা না হয়। এমন

কি তোমাকে রাজসাক্ষী করে নিয়ে যাতে তোমার কোনও ক্ষতি না হয় সে চেষ্টাও আমি করব। তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর বিরিজলাল যে আমার কথার

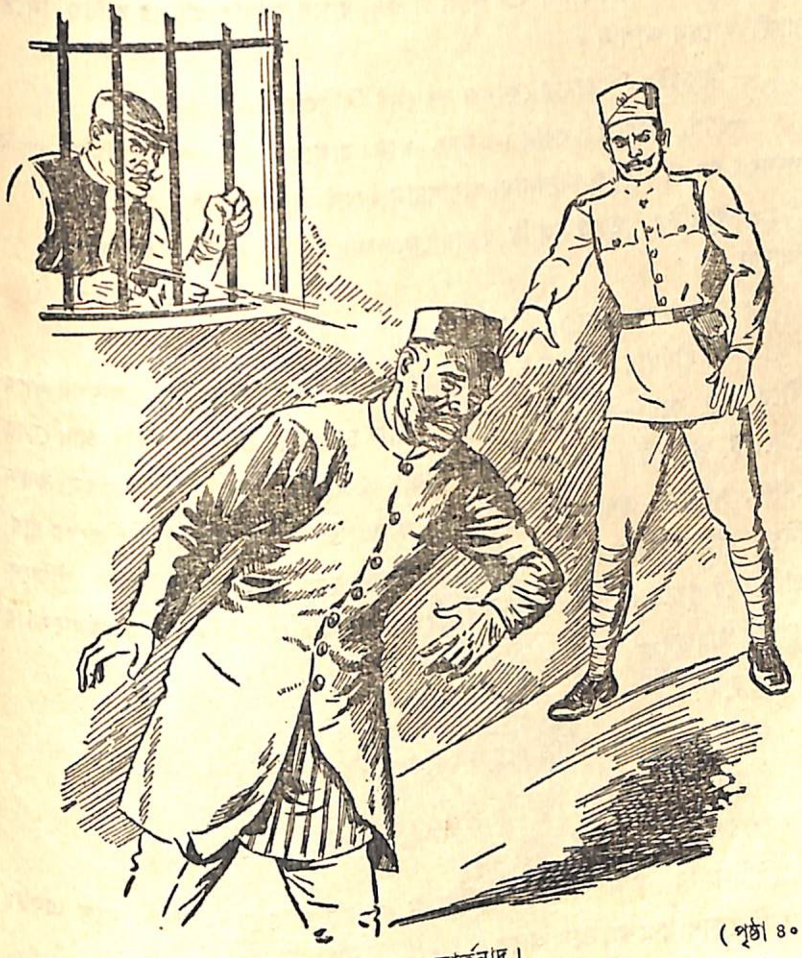

(পৃষ্ঠা ৪০)

আঃ...সকরুণ আর্তনাদ।

কখনও কোনও ব্যতিক্রম হয় না। আর কাকেও বিশ্বাও না করলেও অন্ততঃ আমাকে তুমি নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পার!

একটু থেমে বিরিজলাল বলে—সত্যি কথা বললে আমার প্রাণের দায়িত্ব নিতে রাজী আছেন আপনি?

—নিশ্চয়ই। তোমার কোনও ভয় নেই বিরিজলাল।

—বেশ, তাহলে শুনুন। কিন্তু মনে রাখবেন এ দল এমনিই একটি সংঘবদ্ধ দল যে এতটুকু আপনারা অসাবধান হলেই আমার প্রাণ যেতে পারে।

—বুঝেছি। তবুও আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যতটা সম্ভব সাবধান হব আমরা।

—বেশ, তবে শুনুন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিনিটখানেক চিন্তা করে বিরিজলাল। তারপর ধীরে ধীরে সুরু করে—সারা ভারত জুড়ে আজ চলেছে যে চুরি, জোচ্চুরি আর ফোর টোয়েন্টি তার ঠিক মাঝখানে বসে রয়েছে একটিমাত্র লোক। আর কল্পনা করুন বোম্বে, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, বেনারস, কোল্‌কাতা এই সব জায়গায় এদের দ্বারা নিযুক্ত হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে ভিখিরী তৈরী হয়ে ভিক্ষে করে এদের পুঁজিকে ভারী করে তুলছে। এই যত ভিখিরী দেখতে পাচ্ছেন আর যতো মেয়ে কেনাবেচার চোরাই কারবার—

গুড়ুম!

প্রচণ্ড একটা শব্দ ধ্বনিত হয়ে সকলকে সচকিত করে তোলে।

আঃ...

সকরুণ আর্তনাদ।

বিরিজলাল জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে মেঝের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে একটা অট্টহাসি কোথা থেকে ভেসে আসে।

সকলে ছুটে যায় জানালার কাছে।

একটি লোককে দেখা গেল জানালা থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে গিয়ে একটি বাদামী রঙের মোটর গাড়িতে চড়ে বসতে।

ওই সেই অদৃশ্য আততায়ী। কিন্তু কে ও?

মিঃ সিংহ তাঁর হুইশেলে ফুঁ দিলেন। কনেষ্টবলরা দ্রুত ছোটাছুটি আরম্ভ করল। কতকগুলি কনেষ্টবল গাড়িটাকে অনুসরণ করবার জন্যে ছুটল।

মিঃ সিংহ আর দীপক ছুটে এলো আহত বিরিজলালের কাছে।

সে তখন অন্তিম নিশ্বাস ফেলবার জন্যে আকুলিবিকুলি করছে। মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়া তার সারা চোখে-মুখে ছড়ান।

ধীরে ধীরে সে শুধু বলল অনেক কষ্টে—হাওড়া...দু নম্বর আড্ডা...জয়ন্ত শেঠ...

তার পরেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে।

সাত
—পরবর্তী প্রোগ্রাম—

মিঃ সিংহকে সঙ্গে নিয়ে দীপক বাইরে এলো। সেখানে ভিজা মাটির ওপরে দেখা গেল জুতোর ছাপ—অস্পষ্ট। জানালার গরাদে কোনও দাগ নেই। অথচ আততায়ী জানালা দিয়ে গুলি ছুঁড়েছিল।

দীপক বলল—নিশ্চয়ই লোকটার হাতে দস্তানা পরা ছিল মিঃ সিংহ।

মিঃ সিংহ হেসে বললেন—আমারও তাই মনে হয় মিঃ চ্যাটার্জী।

দুজনে ঘুরে ফিরে দেখে ফিরে যাচ্ছে, এমন সময় সেখানে দেখা গেল এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে।

দীপক বলল—বোধ হয় কাগজের টুকরোটা আততায়ীর কাছ থেকে পড়ে গেছে, অথবা সে ফেলে রেখে গেছে।

তুলে দেখা গেল সেটা একটা নির্দেশপত্র।

তাতে লেখা ঃ

প্রিয় কিশোরী,

তুমি সন্ধ্যার মধ্যে আউটরাম ঘাটে লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করো। বিরিজলালকে শেষ করে ব্যবস্থা করতে হবে রুক্মিণীর ব্যাপারে। তাহলেই আর ভয় থাকবে না।

সেই ব্যবস্থাগুলো ওখানে করাই নিরাপদ। শেষ করতে না পারা গেলে ওকে কিড্ন্যাপ্ করে বিক্রী করে দিলেও চলবে! ইরাণে চালান হয়ে যাবে। যা হোক্, আজ মনে করে অবশ্যই আসবে। ইতি

বশীর খাঁ।

চিঠিখানা আগাগোড়া দেখে দীপক বলল—তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এই কিশোরী বেশ বড় একটা পার্ট প্লে করছে। কিন্তু কোন্ ভূমিকায় ইনি অবতীর্ণ হয়েছেন জানি না। যাই হোক্, অবিলম্বে ব্যবস্থা করতেই হবে।

মিঃ সিংহ বললেন—কিন্তু আপনি যেন স্বয় খুব বেশি বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে—

দীপক বলল—এতবড়ো এ্যাড্ভেঞ্চার যার ভাল লাগে তাকেই পাঠান হবে সেখানে।

—কে? মিঃ সিংহ প্রশ্ন করেন।

দীপক হেসে বলে—ওপরের ঘরে আমার সহকর্মী রতনলাল বসে আছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।

—এঁকেই পাঠাচ্ছেন নাকি আপনি?

—তা ছাড়া উপায়? আমাকে ত আবার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে এক্ষুণি দেখা করতে হবে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, বিশেষ কি একটা জরুরী কেসে উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

—সে ভাল কথা। আপনার সহকর্মীর যোগ্যতার উপরেও আমাদের যথেষ্ট ভাল ধারণা আছে।

আনমনে দীপক বলে—অবশ্য খুব বেশি দূরে থাকলে আমার চলবে না। দেখা যাক্।

মিঃ সিংহের সঙ্গে ঘরের ভেতরে ঢুকে দীপক বলে—তোর কথাই সত্যি হলো রতন। তুই সঙ্গে না এলে এতবড়ো একটা এ্যাড্ভেঞ্চার মাঠে মারা যেত।

—কি ব্যাপার ?

দীপক চিঠিখানা রতনের দিকে এগিয়ে দেয়।

রতন আপনমনেই বলে—আউটরাম ঘাট ! দেখা যাক্ কতদূর সাক্সেসফুল হতে পারি এ কেসে।

দীপক কোনও উত্তর দেয় না।

রতনকে ছেড়ে দিয়ে দীপক সোজা চলে যায় লালবাজার পুলিশ স্টেশনে। যাবার আগে রতনকে সেদিনের নৈশ অভিযানের জন্যে ভাল করে প্রস্তুত হতে উপদেশ দিয়ে যায়।

পুলিশ কমিশনার দীপককে দেখতে পেয়েই ডেপুটি কমিশনার মিঃ মরিসনকে ডেকে আনান।

মিঃ মরিসন এসে সমস্ত ফাইলপত্র দীপককে দেখিয়ে বলেন—আমি চাই এই বিষয়টা নিয়ে বেশ ভালভাবে তদন্ত হয়।

সবকিছু দেখে শুনে দীপক বলে—আরে, আমিও যে সম্প্রতি—মানে আজই এই রকম আর একটি কেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি।

—তাই নাকি ? আশ্চর্য যোগাযোগ ত ! কেসটা কি ভাল করে খুলে বলুন ত !

দীপক তখন কেসটা ভাল করে খুলে বলে মিঃ মরিসনের কাছে। তিনি ও পুলিশ কমিশনার দুজনেই আগাগোড়া ব্যাপারটা মনোযোগ দিয়ে শুনে বলেন—স্ট্রেঞ্জ ! আপনি ত তাহলে কতকটা এগিয়ে গেছেন বলতে পারা যায়।

দীপক হেসে বলে—তা অবশ্যই বলতে পারেন আপনারা। আপনারা তদন্তচক্রে আমাকে আনবার অনেক আগেই আমি অন্য একটা সূত্র ধরে এতটা এগিয়ে গেছি।

—তাহলে ত খুব ভালই হলো। মিঃ মরিসন বলেন—আই থিঙ্ক্ দেয়ার ইজ্ নাউ দি সিওরেষ্ট্ চান্স অব্ সাকসেস। তবে আপনার সহকারীর ওপর এতটা দায়িত্ব—

দীপক হেসে বলে—ভয় নেই মিঃ মরিসন। আমিও দূর থেকে ওকে ফলো করব। এতবড়ো একটা কাল্‌প্রিটের গ্যাংকে অ্যারেষ্ট্ না করে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছি না আমি।

মিঃ মরিসন দীপকের হাতে হাত রেখে বলেন—আই উইস ইউ সাক্সেস। আমার মনে হয় এই ক্লু নিয়ে এগুলেই গোটা কেসটা আপনার হাতে এসে পড়বে। দেন্ ইট্ উইল্ বি ইজি টু সল্‌ভ ইট্, আই থিঙ্ক্।

আট

—জয়ন্ত শেঠের বিভ্রান্তি—

জয়ন্ত শেঠ কিশোরী আর বশীর খাঁকে সঙ্গে নিয়ে আড্ডা থেকে বের হয়ে সোজা চলে এলো বড়বাজারে।

বড়বাজার থানায় যে সব কনেষ্টবল গার্ড থাকে তাদের মধ্যে একজন ছিল তাদেরই দলের গুপ্তচর। তাকে অত্যন্ত সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল।

তাকে সঙ্গে নিয়ে জয়ন্ত শেঠ বেরিয়ে এলো থানা থেকে বাইরে। সেখানে একখানা দোতলা বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত শেঠ ভরত সিংকে প্রশ্ন করল

—একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলাম ভরত সিং। খুব জরুরী প্রয়োজনেই আসতে হলো আমাকে।

—কি কথা বলুন সর্দার।

দুখানা দশ টাকার নোট ভরত সিংয়ের হাতে গুঁজে দিয়ে জয়ন্ত শেঠ বলল

—আমাদের বিরিজলাল নামে একজন লোককে কি তোমাদের এখানে আটক রাখা হয়েছে?

নোট দুটো পকেটে পুরে সহাস্যমুখে ভরত সিং বলল—আপনি ঠিকই বলেছেন সর্দারজী। তাকে দুদিন হলো এখানে আটক রাখা হয়েছে।

—কি অপরাধে ধরা পড়েছে সে?

—সেটা ঠিক জানি না। বোধ হয় কোনও একটা লোককে 'চিট্' করবার ব্যাপারে—

—কিন্তু বিরিজলাল ত তেমন লোক নয়।

—হয়ত ওকে অপরাধী সাজান হয়েছে। ওর শত্রুপক্ষও ত অনেকে আছে।

—তা বটে। তা যদি হয় তবে আমার কিন্তু সন্দেহ হয়—

—কার ওপর?

—সে কথা এখানে আলোচনা করতে চাই না। যাক্, আর একটা কথা।

—বলুন।

—ও কি এখন পর্যন্ত কোনও স্বীকারোক্তি দিয়েছে পুলিশের কাছে?

—যতদূর মনে হয় দেয়নি।

—খুব ভাল করে খেয়াল রেখেছ ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ সর্দার।

—বেশ চলি তাহলে।

জয়ন্ত শেঠ এতক্ষণ খেয়াল করেনি যে সে কনেষ্টবলটিকে নিয়ে আসার একটু পরেই বড় রাস্তার মোড় থেকে বশীর খাঁ আর কিশোরী অদৃশ্য হয়েছিল।

ওদের খুঁজে বের করবার জন্যে সে এগুলো বড় রাস্তা ধরে। কিন্তু ওদের কাউকেই দেখা গেল না কোথাও।

চিন্তিতমুখে জয়ন্ত শেঠ কি করবে ভাবছে এমন সময় শোনা গেল পর পর দুবার বন্দুকের গর্জন।

প্রচণ্ড শব্দ।

জয়ন্ত শেঠ থানার দিকে এগুলো, কারণ বন্দুকের শব্দটা ওই দিক থেকেই ভেসে এসেছিল। কিন্তু থানার সাম্‌নে গিয়ে সে কাউকেই দেখতে পেল না। শুধু দেখা গেল পুলিশের চাঞ্চল্য ও ছোটাছুটি।

একটু সেখানে দাঁড়িয়ে সে শুনতে পেল দুজন অফিসার বলাবলি করছে—উঃ বিরিজলাল লোকটাকে একেবারে শেষ করে ফেলল !

—সত্যি বুকের পাটা আছে বটে ! প্রকাশ্য থানার মধ্যে এভাবে আক্রমণ করে—

—আমার কিন্তু মনে একটা সন্দেহ হচ্ছে স্যর !

—কি সন্দেহ ?

—নিশ্চয়ই থানার কোনও লোক এর সঙ্গে জড়িত আছে। তা না হলে এত নাড়ীনক্ষত্র জেনে এভাবে পলায়ন করা কি যার তার দ্বারা সম্ভব ?

—কিন্তু—

—আই য়্যাম্ ডেফিনিট্। নিশ্চয়ই তাই।

জয়ন্ত শেঠ ধীরে ধীরে সেখান থেকে প্রস্থান করল। বার বার তার মাথায় শুধু একটা প্রশ্নই জাগতে লাগল। এভাবে প্রকাশ্যে বিরিজলালকে হত্যা করল কে ? আর যেই হত্যা করুক, এর মধ্যে জড়িত আছে একটি বিরাট চক্রান্ত।

জয়ন্ত শেঠ দুশ্চিন্তিত হলো। যেভাবে দ্রুত তার দলের মধ্যে ভাঙন ধরতে সুরু করেছে তাতে ভবিষ্যতে যে কি হবে তা আন্দাজ করা প্রায় অসম্ভব। যেমন করেই হোক্ এই চক্রান্তের অবসান ঘটিয়ে এ ভাঙন রোধ করতে হবে।

জয়ন্ত শেঠ চিন্তিতমনে এগিয়ে চলল আড্ডার দিকে।

নয়

—আউটরাম ঘাট—

রাত তখন ক'টা বাজে ঠিক আন্দাজ করা যায় না। তবে বারোটার যে বেশি তা ঠিক।

আউটরাম ঘাট। জেটি। বড় বড় দুটো স্টিমারের বয়লার ধূমল দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। কতকগুলি মাল-টানা ফ্ল্যাট আর কতকগুলি নৌকা বাঁধা।

ঠিক এম্‌নি সময়ে দেখা গেল একজন লোককে মাতাল অবস্থায় ঘাটের দিকে এগিয়ে আসতে। যে রকম টলতে টলতে সে চলেছে আর যে প্রলাপের মতো ভঙ্গিতে হিন্দি গানের দু-একটা টুকরো গেয়ে চলেছে তাতে তাকে মাতাল বলে বুঝতে খুব বেশি অসুবিধে হয় না।

ঘাটের সাম্‌নে একজন বীটের কনেষ্টবল পাহারা দিচ্ছিল। সে তাকে দেখতে পেয়েই গিয়ে চেপে ধরল। বলল—এই, এত্‌না রাত্‌মে হিঁয়াপর চিল্লাতা কাহে ? তুম্‌কো থানামে যানে হোগা। জরুর।

লোকটি ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল—এইসি চাঁদনী রাত। ফুর্তি উড়াও ইয়ার। এইসি দিন নাহি রহেগা দোস্ত।

কথার শেষে সে একটা হিন্দি গানের কলি দুবার গেয়ে ঘাড় নাড়তে লাগল।

কনেষ্টবলটি বলল—কোই বাৎ মাৎ করো শয়তান। জরুর থানামে যানে হোগা।

—আরে কুছ রুপেয়া মাংতা কি নহি ?

লোকটা বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলে—লিজিয়ে রুপেয়া। লেকিন আপ্‌কা মাফিক বেরসিক আদমী—

পুলিশ কনেষ্টবল দেখল লোকটার হাতে ধরা রয়েছে একখানা দশ টাকার নোট।

কনেষ্টবলটির মুখ আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে নোটখানা পকেটে পূরে মীরার ভজন গাইতে গাইতে আর খানিকটা খইনী টিপতে টিপতে প্রস্থান করে।

লোকটি এবার ধীরে ধীরে জেটির উপরে এগিয়ে আসে। সেখানে ইতিপূর্বেই আধো-অন্ধকারে বসে অপেক্ষা করছিল একজন লোক।

মাতাল লোকটিকে দেখতে পেয়ে পূর্বোক্ত লোকটি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার সাম্‌নে দাঁড়াল।

মাতাল লোকটি এবার অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলে উঠল—উঃ, শেষে আবার একটা ঝামেলায় পড়ে মিছামিছি খানিকটা দেরী হয়ে গেল।

—সে কি কথা ? পূর্বোক্ত লোকটি প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, দশটা টাকা খোয়া গেল। যাক্, এবার বলো ত এভাবে ডেকে পাঠালে কেন ?

—না পাঠিয়ে কি উপায় আছে ! আর একটু হলে সর্দারের কাছে ফাঁস হয়ে যাচ্ছিল। শেষে আমাদের দুজনকেই হয়ত দল ছেড়ে পালাতে হতো। তা না হলে সর্দার যেমন লোক—

—তা জানি বশীর খাঁ। কিন্তু কিশোরীর যা দলবল আছে তাতে সে সর্দার জয়ন্ত শেঠকে ভয় করে না।

—তা না হয় হলো। কিন্তু হাজার হলেও খানিকটা গোলমাল পাকিয়ে তুলে লাভ নেই ত !

—তা বটে। কিন্তু এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন ?

—আমি ঘাবড়ে যাচ্ছি ওই রুক্‌মিণীটার জন্যে।

—সে আবার কি করবে ?

—করবে নয় করতে পারে। সর্দার ওর কথায় যথেষ্ট বিশ্বাস করে তা দেখেছ ত ?

—তা দেখেছি। কিন্তু কেন বলো ত ?

—বুঝতে পারছ না ? সর্দারের ভিখিরীর পাল থেকে যা টাকা লাভ হয় তার চেয়ে অনেক বেশি হয় ওই মেয়ে বিক্রীর ব্যাপারে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। আর সে ব্যাপারে রুক্‌মিণী হচ্ছে বিরাট একটা অর্থকরী কাজের কেন্দ্র।

—বুঝলাম। কিন্তু কি করা যায় ?

—তা জানি না। কিন্তু কি করা যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করবার জন্যেই তোমাকে ডেকে আনা।

একটু থেমে কিশোরী বলে—আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না বশীর খাঁ ?

—কি কাজ ?

—আমরা যদি রুক্‌মিণীর চেয়ে বেশি কর্মক্ষম একটি মেয়ের জোগাড় করতে পারি ?

—কিন্তু কোত্থেকে ?

—সে রকম কাজের মেয়ে আমার হাতে আছে বটে, কিন্তু তাকে এখানে এনে ঢোকাই কেমন করে ?

বশীর খাঁ একটু চিন্তা করে বলে—সর্দারের মনে রুক্মিণীর সম্বন্ধে সন্দেহ এনে দিলে কেমন হয়! সেই সুযোগে আমরা সেই নতুন মেয়েটিকে সর্দারের সামনে এনে ধরব। তারপর রুক্মিণীকে হটিয়ে—

—প্ল্যানটা অবশ্য মন্দ নয়। কিন্তু কি করে তাকে কাজে লাগান যায় তাই ভাবছি।

কথাটা শুনে বশীর খাঁ কিশোরীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলল। সব শুনে আনন্দের আবেগে কিশোরী সজোরে বলে উঠল—ঠিক বাত্ হ্যায় ওস্তাদ!

কিন্তু এরা কেউ এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি যে জেটি থেকে অদূরে একটি পাগল বসে আপনমনেই বিড় বিড় করে কি যেন সব কথা বলে চলেছিল।

এবার সে উঠে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল উল্টো দিকে।

লোকটার দিকে তাকিয়ে বশীর খাঁর কেমন যেন সন্দেহ হলো। সে দ্রুত এগিয়ে লোকটার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বলল—এই শয়তান, কে তুই? কেন এখানে লুকিয়ে আমাদের কথা শুনছিলি?

পাগলটা হো হো অট্টহাসি হেসে উঠল। তারপর বিড়বিড় করে আপন মনে আবার কি সব কথা বলে চলল।

এতক্ষণ ধরে কিশোরী লক্ষ্য করছিল বশীর খাঁর কার্যকলাপ। এবার সে বলে উঠল—শুধু শুধু কি পাগলামী করছ বশীর খাঁ! ও একজন পাগল ছাড়া আর কিছুই নয়।

—কি করে বুঝলে?

—এও কি চিন্তা করে বুঝতে হয় নাকি? ওকে দেখেই তা বেশ ভালমত বোঝা যাচ্ছে।

—তার চেয়ে এক কাজ করলেই ত হয়!

—কি কাজ?

—ও যদি সত্যিই পাগল না হয়! তার চেয়ে ওকে একেবারে শেষ করে দিই না কেন!

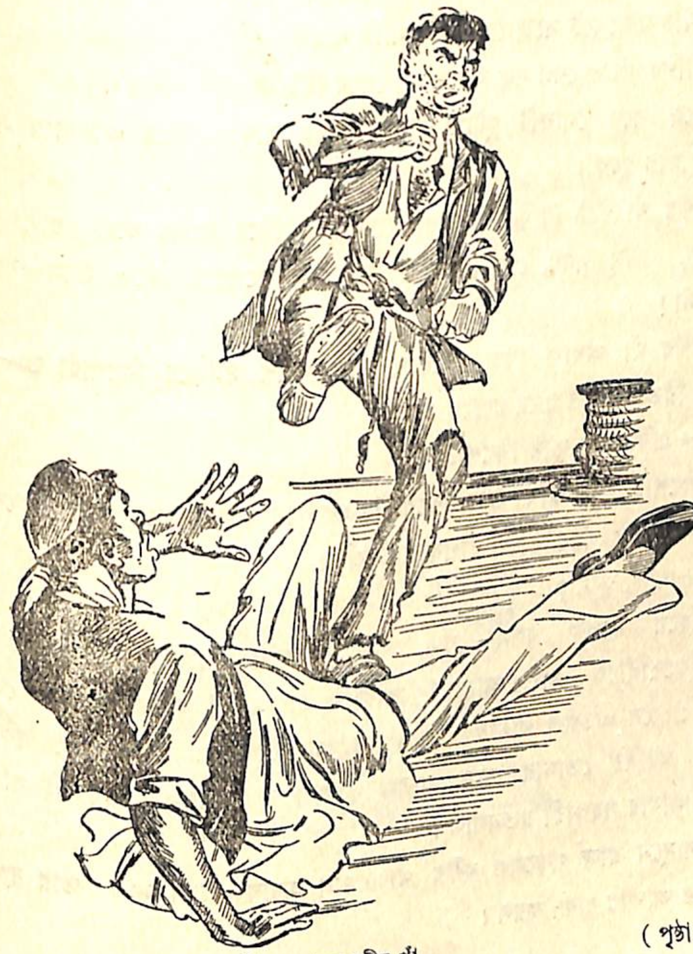

(পৃষ্ঠা ৫৪)

...ছিট্‌কে পড়ল বশীর খাঁ

—সে কি কথা ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কাঁচা কাজ করতে বশীর খাঁ জানে না।

এই বলে বশীর খাঁ কি যেন করতে যাচ্ছিল, এমন সময় পাগলটি হঠাৎ প্রাণপণে বশীর খাঁর তলপেটে সজোরে একটা লাথি মারল।

লাথির প্রচণ্ড বেগ সহ্য করতে না পেরে ছিট্‌কে পড়ল বশীর খাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ছুটতে ছুটতে জেটির সাম্‌নে গিয়ে একেবারে লাফিয়ে পড়ল গঙ্গার বুকে।

বশীর খাঁ উঠে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে ছুটে গিয়ে জলের মধ্যে গুলি করতে যাচ্ছিল, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন সজোরে হেঁকে উঠল—সাবধান, বশীর খাঁ!

বশীর খাঁ অবাক বিস্ময়ে দেখে তার পাশে দাঁড়িয়ে কিশোরী তার দিকে একটা রিভলভার উঁচিয়ে রয়েছে।

—একি করছ তুমি কিশোরী ?

কিশোরী অকস্মাৎ তার ছদ্মবেশটা একটানে খুলে ফেললে দেখা গেল সে আর কেউ নয়—স্বয়ং ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী।

—একি, তুমি ?

হেসে দীপক বলল—কেন, নিরাশ হলে নাকি ? কিন্তু কি করব বল, কিশোরীকে—মানে আসল কিশোরীকে এর আগেই আমরা আটকে ফেলেছি কিনা। সে এতক্ষণ থানায় গিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছে। আর নকল কিশোরী মানে আমিই তোমার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলাম। আর এই পাগলটাই হচ্ছে আমার সহকারী রতনলাল।

সাম্‌নে বাজ পড়লেও বশীর খাঁ এতটা অবাক হতো না। তার মুখ-চোখ নিষ্প্রভ আকার ধারণ করল।

দীপক বলল—আর মিথ্যা চিন্তা করে লাভ নেই বশীর খাঁ, এবার চুপচাপ আত্মসমর্পণ কর দেখি।

কিন্তু একটা মাত্র মুহূর্ত পর হঠাৎ দীপকের সামান্য অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে বশীর খাঁ সজোরে তার মাথায় প্রচণ্ড বেগে আঘাত করল হাতের ডাণ্ডাটা দিয়ে।

দীপক সরে দাঁড়াল। সেটা তার মাথায় না লেগে লাগল তার কাঁধে।

দীপক প্রচণ্ড ব্যথায় বসে পড়ল। ওধারে সেই ফাঁকে বশীর খাঁ প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে গেল তার সাম্‌নে থেকে। ডান কাঁধে আঘাত লাগায় তার হাতখানা প্রায় অবশ হয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে সে হাত তুলে রিভলভারের ট্রিগারটা টিপল। কিন্তু গুলিটা গিয়ে অদূরবর্তী একটা কাঠের গুঁড়িতে বিদ্ধ হলো।

বশীর খাঁ ততক্ষণে বহুদূরে অদৃশ্য হয়েছে।

দশ

—পলায়ন—

আড্ডায় ফেরবার পর থেকেই অত্যন্ত অন্যমনস্ক ছিল জয়ন্ত শেঠ। আজ যেন রাজ্যের ভাবনা তার মাথার মধ্যে জট পাকাতে সুরু করে দিয়েছিল।

এতদিন ধরে তিল তিল করে যে দলকে সে গড়ে তুলল তা যে তার সাম্‌নেই এভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে বসবে এ কথা সে কোনও দিন কল্পনাতেও স্থান দেয়নি। কিন্তু একি? সত্যিই আজ তাকে মারাত্মক এক বিপদের সাম্‌নে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। তার দলের মধ্যে সুরু হয়েছে অযথা দলাদলি আর গোলমাল। দীর্ঘদিন এভাবে চললে যে কি হবে—

—একি, সর্দারজী! এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে? ওধারের কাজের কতদুর?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়ন্ত শেঠ বলল—বিরিজলাল মারা গেছে রুক্‌মিণী!

—মারা গেছে? রুক্‌মিণী যেন আর্তনাদ করে উঠল।

—হ্যাঁ রুক্‌মিণী।

—কিন্তু কে সেই হত্যাকারী সর্দার? যে থানার ভিতরে গিয়েও তাকে গোপনে হত্যা করতে পারে?

রুক্‌মিণীর দুচোখ যেন ক্ষুধার্ত বাঘের মতোই জ্বলতে থাকে।

—সে কথা আমিও জানি না রুক্‌মিণী।

—মিথ্যা কথা! রুক্‌মিণী যেন সজোরে চীৎকার করে ওঠে।

—তোমার কাছে মিথ্যা বলে আমার লাভ?

—যদি বলি তুমিই তাকে হত্যা করেছ? রুক্‌মিণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয়।

—তা হলে তোমার বিরুদ্ধে বলবার মতো প্রমাণ আপাতত আমার হাতে নেই বটে, তবে বশীর খাঁ ফিরে এলেই জানতে পারবে।

—কিন্তু তোমার সঙ্গে বের হয়েও তারা দুজন ফিরে এলো না কেন?

—তা এখনও বুঝতে পারছি না রুক্‌মিণী। তবে হঠাৎ পথের মোড় থেকে তারা যেভাবে সরে পড়ল তাতে—

—তাতে কি মনে হয় সর্দার? খুলেই বল না।

—বলবার মতো ভাষা আমার নেই রুক্‌মিণী। আমাকে একটু একা থাকতে দাও। ভাবতে দাও। আমি যেমন করে পারি খুঁজে বের করবই কে আততায়ী। কে এই সব গোলমাল আর চক্রান্তের মূলে থেকে আমাদের সমস্ত জিনিসকে এভাবে ধ্বংস করছে!

—তা কি এখনও জান না?

—ঠিক করে কিছু বলা কি করে আমার পক্ষে সম্ভব? সর্দারের কণ্ঠ এতক্ষণে কেমন যেন নিষ্প্রভ বলে মনে হয়।

—সে হচ্ছে ওই কিশোরী। আমার কথায় বিশ্বাস কর সর্দার—যদি এখনও বাঁচতে চাও। রুক্‌মিণী সর্দারের মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করে অকম্পিতকণ্ঠে বলে ওঠে।

—দেখা যাক্ রুক্‌মিণী, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

কয়েক ঘণ্টা পর।

ছুটতে ছুটতে আড্ডার মধ্যে প্রবেশ করল বশীর খাঁ। চোখেমুখে কেমন যেন সচকিত একটা ভাব। শঙ্কিত।

বশীর খাঁকে দেখেই রুক্‌মিণী ছুটে আসে। বলে—কি হলো খাঁ সাহেব! এমন বেশে এভাবে প্রত্যাবর্তন ?

জয়ন্ত শেঠও কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে আসে। গম্ভীরকণ্ঠে বলে—তোমাদের এ লুকোচুরির শেষ করতে চাই আমি বশীর খাঁ। এভাবে চলা আমাদের বিপদ—

—বিপদ সত্যিই বেড়ে গেছে শেঠজী। এক্ষুণি এ আড্ডা ছেড়ে আমাদের পালাতে হবে।

—তার মানে ?

—কিশোরী ধরা পড়েছে।

—সে কি কথা ?

—হ্যাঁ। আর আমাদের গুপ্ত খবর সব সে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে।

—কে স্বীকার করেছে ? কিশোরী না তুমি ? রুক্‌মিণী শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

—আমি ?

জয়ন্ত শেঠ বাধা দিয়ে বলে—সে বিচার পরে করলেও চল্‌বে রুক্‌মিণী।

—পরে কেন ?

—আমাদের আগে এখান থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে। কিন্তু কি করে কিশোরী ধরা পড়ল বশীর খাঁ ?

বশীর খাঁ বলল—ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর নাম শুনেছেন ? বিখ্যাত গোয়েন্দা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—সেই কোন্ সূত্রে খবর পেয়ে তাকে এভাবে আটক করেছে বলে জানতে পারলাম।

—সে কি কথা ? কিভাবে খবর পেলে সে ?

—তা জানি না সর্দার। তবে তাড়াতাড়ি গা-ঢাকা দিতে না পারলে আমরাও নিরাপদ নই এ কথা মনে রাখবেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্ষুণি পলায়নের বন্দোবস্ত কর তুমি। আর আড্ডার ভিখিরীদেরও—

—কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে তা সম্ভব হবে বলুন।

—যেমন করেই হোক আমাদের এক্ষুণি এখান থেকে পালাতে হবে। কোনও মতেই আমরা তাদের হাতে ধরা পড়তে পারি না।

সর্দার যেন প্রবল একটা উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠে। ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকে।

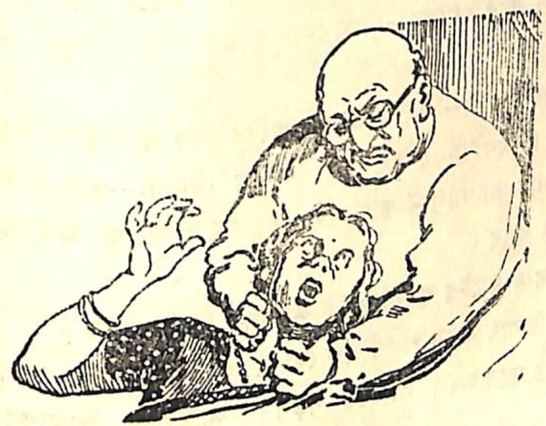

এগারো

—অনুসরণ—

—কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা কি করে তৈরী হয়ে নে মিঃ চ্যাটার্জী ?

দীপকের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন বড়বাজার থানার ও. সি. মিঃ সিংহ।—আমরা আগে থেকে এতটুকুও আভাস পাইনি। আর্মড্ ফোর্সদের আগে থেকে অর্ডার না দিলে তাদের তৈরী করতে বেশ কিছু সময় লাগবে।

দীপক বলল—যেমন করে হোক, অন্তত পনর থেকে কুড়িজন আর্মড্ ফোর্স নিয়ে—

—বেশ, চেষ্টা আমি করছি। কিন্তু এত সত্বর কি হবে ?

কথা বলে তিনি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কি যেন অর্ডার দিয়ে এলেন। তারপর ভেতরে প্রবেশ করে বললেন—কিন্তু কোন্ সূত্রে আপনি এতদূর এগুলেন তা ত বললেন না!

দীপক হেসে বলল—ওই আউটরাম ঘাটের সমস্ত ব্যাপার কি ইতিমধ্যেই ভুলে গেলেন নাকি। সেটাই তো সমস্ত মিস্ট্রির origin…তারপর কিভাবে ওদের ফলো করেছিলাম তা আপনি জানেন না! যাক, আজকের অভিযান সফলে হলে সব আপনাকে বলব।

—আউটরাম ঘাটের ব্যাপারে কি আপনিও ছিলেন নাকি ?

—আমি ছিলাম মানে? দীপক হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠে বলল—রতন ত ভয়ে জলে লাফিয়ে পড়ল। আমিই ত আজকের অভিযানের

হিরো। কিশোরীকে আগেই ধরে দুজন কনেষ্টবলের জিম্মাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম জানেন ত ?

—হ্যাঁ।

—তারপর আমি নকল কিশোরী সেজে ধীরে ধীরে বশীর খাঁর কাছ থেকে সমস্ত সিক্রেটগুলো একে একে বের করে ফেললাম।

—এবার বুঝেছি।

—কিন্তু আর এক মুহূর্তও দেরী নয় মিঃ সিংহ। আমার সন্দেহ হচ্ছে এতক্ষণ বশীর খাঁ ওদের আবার সাবধান করে না দেয়।

—কিন্তু তাকে ধরতে পারলেন না ?

—প্রায় পেরেছিলাম। শেষ মুহূর্তে হাত ফসকে বেরিয়ে গেল। তবুও ওদের আড্ডার সন্ধান আমি পেয়েছি মিঃ সিংহ।

আজ সারা ভারত জুড়ে ওই যে চলেছে ভিখিরী তৈরীর ব্যবসা আর অপহৃতা নারী কেনাবেচা ওর চেয়ে জঘন্য অপরাধ বোধ হয় পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে না। আজকেই আমি সেই পরিচ্ছেদের উপরে যবনিকা টেনে দিতে চাই। বশীর খাঁ আর তার দলবল যেধার দিয়েই পালাবার চেষ্টা করুক না কেন, আমার হাতে আজ তাদের ধরা পড়তেই হবে। যেমন করেই হোক আমি জানি ওদের লীলা-খেলার অবসান ঘটাতে আজ আমি পারব।

দীপক উত্তেজনায় সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

বারো

—পরিশেষ—

আড্ডায় হানা দিয়ে পুলিশবাহিনী দেখতে পেলে বিরাট আড্ডা-বাড়িখানা পোড়ো বাড়ির মতই খাঁ খাঁ করছে।

কোণের তিন-চারটি ঘরে বন্দী করা ছিল দলে দলে ভিখিরীদের। একটা ঘরের তালা খুলতেই পাওয়া গেল প্রায় ত্রিশ জন ভিখিরীকে। দীপক তাদের মধ্যে বুদ্ধিমান গোছের একটি ছেলেকে ডেকে প্রশ্ন করল—এই, সর্দারেরা কোন্ দিকে গেছে রে?

ছোকরাটি বলল—তিন-চারটে মোটরে করে ওরা বড় রাস্তা ধরে গেছে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রাস্তা।

—তুই কি করে বুঝলি যে ওরা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রাস্তা দিয়ে গেছে?

—আজ্ঞে, ওরা ওই সব কথাই বলাবলি করছিল ওদের মধ্যে।

—কতক্ষণ আগে ওরা গেছে এই আড্ডা ছেড়ে?

—তা প্রায় এক ঘণ্টা হবে।

—ওদের সঙ্গে কজন লোক আছে?

—চার পাঁচজন হবে। ওরা বলেছে আর নাকি কোল্‌কাতায় আসবে না।

—বুঝেছি। আর বেশি কথা বলবার সময় দীপকের ছিল না। সে মিঃ সিংহের দিকে চেয়ে বলল—গেট্ রেডি! লেট্ আস্ ফলো!

তীব্র বেগে গাড়ি ছুটে চলেছে।

ছুটে চলেছে পুলিশের লরী আর জীপ্। গতিসীমার প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছেচে তাদের গাড়ির গতি।

দূরে দেখা যাচ্ছে পলায়নরত কয়েকখানা গাড়ির পেছনের দিকের আলো।

জোরে—আরও জোরে। ব্যবধান ক্রমশই কমে আসছে।

ফায়ার! মিঃ সিংহ আদেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি পুলিশ রাইফেল একসঙ্গে গর্জে ওঠে।

রাইফেলের গুলি গিয়ে সাম্‌নের গাড়ির দুটি টায়ারে বিদ্ধ হয়। প্রচণ্ড শব্দে টায়ার ফেটে যায়।

দুটি গাড়িরই গতি রুদ্ধ হয়।

সমস্ত অপরাধী বন্দী হয় পুলিশের হাতে।

তাদের অ্যারেষ্ট্ করে দুজন লোককে মিঃ সিংহের সাম্‌নে টেনে আনে দীপক। বলে—এরা দুজনই হচ্ছে জয়ন্ত শেঠ আর বশীর খাঁ। সারা ভারত জুড়ে এই যে নৃশংস ব্যবসা চলেছে তার নায়ক হচ্ছে এরা।

—কিন্তু এই সব ভিখিরীদের সম্বন্ধে এখন কি ব্যবস্থা করা যায়? মিঃ সিংহ প্রশ্ন করেন।

দীপক হেসে মিঃ সিংহের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—সে ব্যবস্থা করবে সরকার। আমরা নই। আমাদের কাজ এদের পুলিশ কমিশনারের কাছে নিয়ে যাওয়া। তিনি খুবই আনন্দিত হবেন মিঃ সিংহ। এমন কি আপনার পদোন্নতিও হতে পারে!

মিঃ সিংহ কোনও উত্তর দেন না। তাঁর মন তখন দেশের এই অসংখ্য ভিখিরীদের প্রতি বেদনায় ও সহানুভূতিতে ভরে উঠেছিল। কেমন যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল তাঁর সারা মন অপরিসীম ব্যথায়।

দীপক মিঃ সিংহের দিকে চেয়ে বলে—এদের গ্রেপ্তার করে কোল্‌কাতার ব্যবসাকেন্দ্র আমরা বন্ধ করে দিলাম বটে, কিন্তু সারা ভারত জুড়ে এদের যে ব্যবসা চলেছে তার অবসান ঘটাতে আমরা পারলাম না! আমার মনে হয় সে

কাজ না করলে আমাদের সমস্ত চেষ্টাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কবে যে সে কা সফল হব জানি না।

মিঃ সিংহ বলেন—সে কাজ আমার নয়। আপনি বরং ওপরে রিপো করুন মিঃ চ্যাটার্জী! আমার মনে হয় তাতে কাজ হতে পারে।

দীপক এ কথার কোনও উত্তর দেয় না। তার সারা মনও কেম যেন অপরিসীম ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে তার বুক ভেদ করে বেরিয়ে আসে ব্যথা-মেশানো দীর্ঘশ্বাস।

শেষ

বিশ্ব-চক্র সিরিজ

স্বপনকুমারের লেখা

প্রত্যেকখানির দাম আট আনা

১। অদৃশ্য সঙ্কেত
২। ছদ্মাত্মার ছল
৩। ভ্রান্ত পথের শেষে
৪। চলন্ত ছায়া
৫। হিংসার অন্ধকার
৬। অব্যর্থ সন্ধান
৭। বিষাক্ত হাসি
৮। মিথ্যা চমক
৯। চায়না লজ
১০। বিজয়িনী তন্দ্রা
১১। শ্বেতপদ্ম
১২। অদৃষ্টের পরিহাস
১৩। ব্যথার প্রদীপ
১৪। মৃত্যুহীন প্রাণ
১৫। রক্তকমল
১৬। নূতন অতিথি
১৭। পৃথিবী থেকে দূরে
১৮। হারানো ডায়েরী
১৯। বিকেল ছ'টার শো'তে
২০। বিফল স্বপ্ন
২১। বাগানবাড়ী
২২। প্রবালপুরী
২৩। জীবন-মৃত্যু
২৪। পরপারের পথিক
২৫। জমাট অশ্রু
২৬। পরাজয়ের গ্লানি
২৭। আলো আঁধার
২৮। তিন বন্ধু
২৯। ছায়ার আর্তনাদ
৩০। রাজাজবা
৩১। এক পেয়ালা চা
৩২। বেনামী চিঠি
৩৩। রত্নমালার কাহিনী
৩৪। ঝড়ের সংকেত
৩৫। হারানো মানিক
৩৬। হরতনের নওলা
৩৭। ব্যর্থ অভিযান
৩৮। ৪২০ ধারা
৩৯। গৃহপ্রবেশ
৪০। বেয়ানি দখল

বিশ্ব-সাহিত্য প্রকাশনী

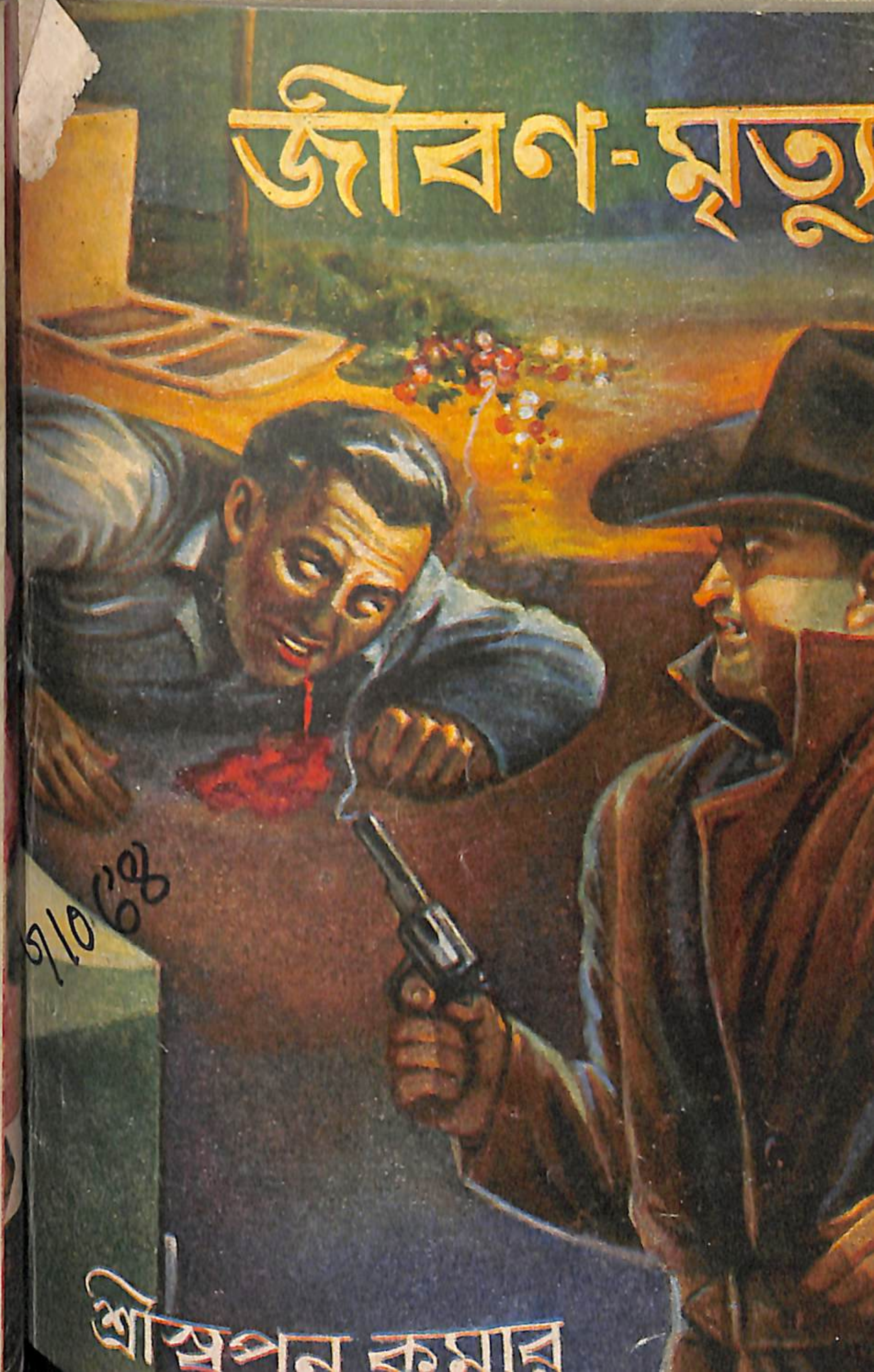

কলেজ স্টুডেণ্টদের জন্য—

বিশ্ব-চক্র সিরিজের ২৩ নম্বর বই—

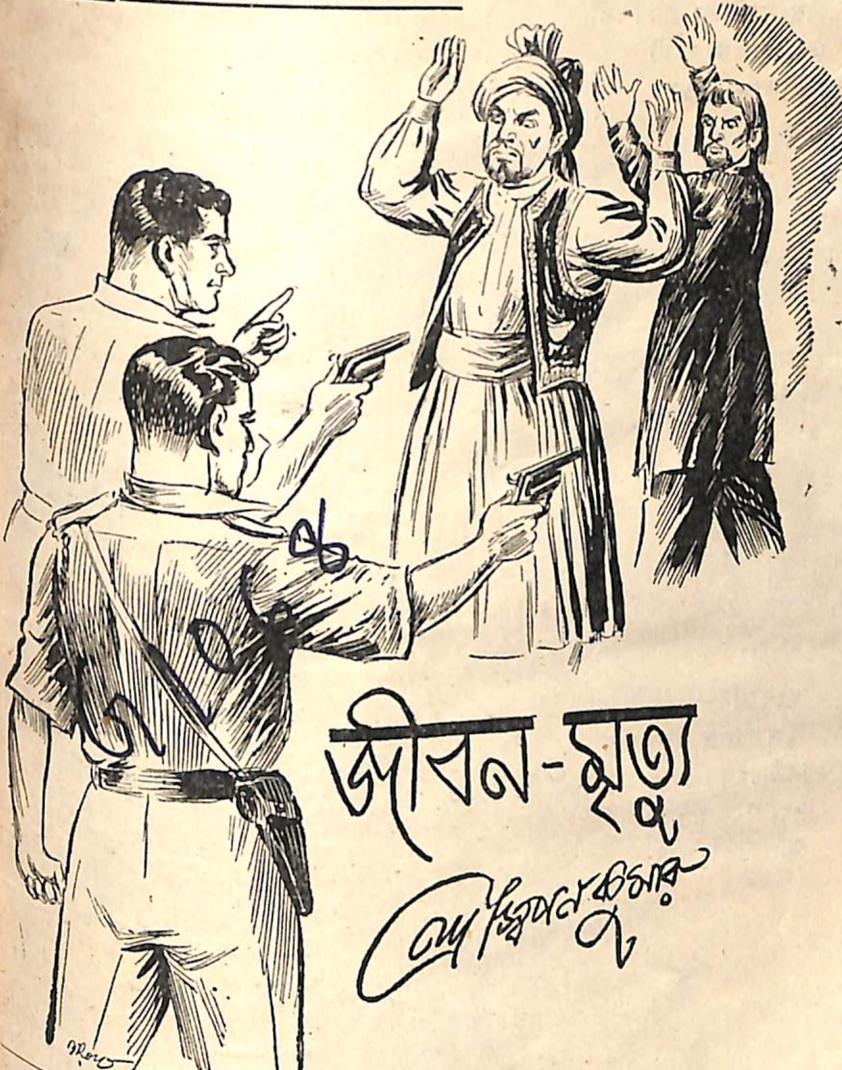

বিশ্ব সাহিত্য প্রকাশনী

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার
বিশ্ব-সাহিত্য প্রকাশনী
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

দোল পূর্ণিমা
১৩৭০
৬

ছেপেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

দাম—
৫০ নয়া পয়সা

জীবন-মৃত্যু

এক

—আত্মঘাতী?—

লেক রোডে তেইশ নম্বর বাড়ি।

হাল্‌কার ওপর ছোট্ট বাড়িখানা। দুপাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। বাড়িখানা আধুনিক কেতায় তৈরী। দোতলা।

রাস্তার দিককার জানালাগুলোতে 'স্কাই-ব্লু' রঙের পর্দা টাঙানো। মোটা পর্দা। যেন বাইরের নজর থেকে বাড়িখানাকে সব সময় আড়াল করতে চান গৃহস্বামী।

বাড়ির সামনের ছোট জায়গাটাতে বাগান করলে বা ফুলগাছ পুঁতলে বাড়ির চেহারার উন্নতি হতো নিশ্চয়ই, কিন্তু সেদিকে তাঁর নজর নেই। সেখানে আগাছা জন্মেছে।

লোহার ফটকের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে উঠে গেছে সুন্দর আইভিলতার ঝাড়। দু একটা মাধবীলতায় লাল সাদা ফুল ফুটে রয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে বোঝা যায় যে একসময়ে বাড়িটার সৌন্দর্যের দিকে মালিকের নজর ছিল।

এখনও সেই পুরোনো বনেদীয়ানার গন্ধ আছে—কিন্তু সে পুরাতন ঐশ্বর্যের ছাপ আর নেই। এখন সে বিগতশ্রী অভিনেত্রীর মতোই পুরোনো ঐতিহ্যের ছাপ বহন করে কোনও রকমে টিকে আছে কালের হাতের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে।

আগাছার জঙ্গলের মাঝ দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথটা এগিয়ে গেছে বাড়ির দিকে। বাড়ির সামনে পর্যন্ত। সামনে কালো রঙের লোহার ফটক। কোলাপসিব্‌ল্ গেট্।

টু-সীটার একখানা বাদামী রঙের গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির ঠিক সা

সামনের ফটকের পাশে লেখা গৃহস্বামীর নামটা দেখে নিয়ে গাড়ি
নামল প্রখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী আর তার সহকারী ও বন্ধু রতন

ফটকে দাঁড়িয়ে একজন লাল-পাগড়ি কনস্টেবল। দীপককে দেখে
সেলাম ঠুকল।

দীপক প্রশ্ন করে—ইন্‌স্পেক্টর বাসু আছেন?

—জী সাব!

—কোথায়?

—দোতলার ঘরে আছেন তিনি। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছে
তিনিই আপনাকে ফোন করেছিলেন এখানে আসতে।

ঘাড় নেড়ে দীপক ভেতরে প্রবেশ করে।

টানা বারান্দা। তিনখানা ঘর। ডানপাশে সিঁড়ি উঠে গেছে
দোতলার দিকে।

দীপক তর তর করে দোতলায় উঠে যায়। সঙ্গে সঙ্গে রতনলালও
অনুগমন করে।

সারা বাড়ি গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন। বোঝা যায় বিরাট একটা
সম্প্রতি এখানে ঘটে গেছে নিশ্চয়ই!

ইন্‌স্পেক্টর বাসু দীপকের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।—আসুন
চ্যাটার্জী! অভ্যর্থনা জানান তিনি।

—কি খবর স্যর?

—খবর বিশেষ কিছু নয়। খুনের কেস মনে করে আপনাকে ফোন
আনলাম, এখন দেখি it's a case of suicide···

—সুইসাইড্?

—হ্যাঁ। অবশ্য রিভলভার দিয়ে।

—প্রমাণ?

—মৃতদেহের তালু ভেদ করে গুলি ওপরে চলে গেছে। বোধ হয় ব্রেন পাংচার করেছে।

—মৃতদেহ কি পোস্ট মর্টেমে পাঠান হয়েছে?

—না।

—তবে সেটা কোথায়?

—ও ঘরেই আছে। আপনিও ইচ্ছা করলে দেখতে পারেন। আসুন আমার সঙ্গে।

—কিন্তু মৃত ব্যক্তি কে?

—এ বাড়িরই মালিক বিনয়ভূষণ মল্লিক।

—ও, বিনয়বাবুই নিহত হয়েছেন তা হলে?

—হ্যাঁ। আপনি তাঁকে চিনতেন নাকি?

—পরিচয় ছিল কিছুটা। কিন্তু তিনি যে ধরনের মানুষ বলে জানি তাতে ত আত্মহত্যা করবেন বলে মনে হয় না! দীপক বলে।

—কেন?

—তিনি ছিলেন একটু কৃপণ প্রকৃতির—যাকে বলে একটু হাতটান ছিল ওঁর। যতো কম খরচে চলে তার মধ্যে নিজের দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ করবার চেষ্টা করতেন উনি। দীপক বলে।

—তাতে কি লাভ হতো ওঁর? এ ধরনের লোক ত কখনও আত্মহত্যা করতে পারে না। সাধারণতঃ কৃপণ ব্যক্তিরা একটু দুর্বলমনা হয়ে থাকে। তাদের পক্ষে আত্মহত্যা করা···

—সম্ভব নয়। সেই কথাই আমি বলতে চাই ইন্‌স্পেক্টর বাসু।

—ভাল কথা মিঃ চ্যাটার্জী। মৃতদেহটাকে ভাল করে দেখে নিন আপনি, তারপর কিছু consultation হবে আপনার সঙ্গে।

—বেশ, আমার আপত্তি নেই তাতে। তা ছাড়া consult করবার জন্যেই যখন আমাকে ডেকে এনেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় রিভলভার দিয়ে আত্মহত্যা করবার মতো মনের অবস্থা ওঁর কোনও কারণেই হতে পারে না।

দীপককে নিয়ে ইন্‌স্পেক্টর বাসু একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন।

মাঝারী আকারের ঘর। কিন্তু ঘরের সর্বত্র গৃহস্বামীর সুরুচির ছাপ পাওয়া যায়। ডিস্‌টেম্পার করা ঘরের রঙ। মোজেইক্ করা মেঝে। বোঝা যায় বাড়ির সর্বত্র গৃহস্বামীর কার্পণ্যের চিহ্ন দেখা গেলেও, এ ঘরের বেলায় তার যেন ব্যতিক্রম ঘটেছে।

ঘরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখা গেল।

দীপক ঝুঁকে পড়ে ভাল করে মৃতদেহটা দেখে বলে—আশ্চর্য!

—কি আশ্চর্য? মিঃ বাসু প্রশ্ন করেন।

—ঘরের মেঝের ওপর ভেজা জুতোর ছাপটা আপনার নজর এড়িয়ে গেছে মিঃ বাসু!

—তাই ত, মৃতদেহের দিকে বেশি নজর থাকায় ওটা খেয়াল করিনি।

—দেখুন, মৃত বিনয়বাবুর পায়ে জুতো নেই। তিনি জুতো পায়ে ঘরে প্রবেশ করেন না। তা হলে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি ভেজা জুতো পায়ে ঘরে প্রবেশ করেছিল। জুতোর দাগটা শুকিয়ে স্পষ্ট ফুটে আছে পরিষ্কার মেঝের ওপর।

—তা ত দেখছি। কিন্তু সে কবে কখন এসেছিল···

—সেটাও আন্দাজ করা কঠিন নয়।

—কি করে?

—কাল রাত এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছিল, মনে আছে আপনার?

···মৃতদেহটা দেখে বলে—আশ্চর্য! (পৃষ্ঠা ৮)

—হ্যাঁ।

—ঐ সময়ে নিশ্চয়ই আততায়ী এসেছিল ঘরে। আমি তাকে আততায়ী

বলছি এই কারণে যে প্রায় ঐ সময়েই উনি নিহত হন বলে আমার ধারণা।

—কিন্তু কে এই লোক ?

—নিশ্চয়ই এমন লোক যে ভেজা জুতো পায়ে পরিষ্কার ঘরে প্রবেশ করলেও বিনয়বাবু তাকে কিছু বলতেন না। আর যে বিনয়বাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে তাঁর কাছে এসে আচম্‌কা চোয়ালের নিচে পিস্তল রেখে গুলি করতে পারে।

—কিন্তু গুলি চোয়ালে লাগেনি দীপকবাবু। শুধু ওপরের তালু ছিদ্র করে মাথার মধ্যে চলে গেছে। তার মানে হাঁ করে মুখের মধ্যে পিস্তল রেখে···

—নাইস্ আইডিয়া ! দীপক বলে।

—এ কথা বলছেন কেন আপনি ?

দীপক মৃদু হেসে বলে—বাইরে থেকে দেখলে এটাকে ঠিক আত্মহত্যা বলেই যাতে মনে হয়, তাই ত এভাবে কেস সাজানো হয়েছে। যেন হাঁ করে নিজেই মুখের মধ্যে পিস্তল চালিয়েছেন।

—বাস্তবে কি তা হয়নি ?

—মোটেই না।

—তবে ?

— কি করে এটা সম্ভব হলো সে ক্লুগুলোই ত বের করতে হবে আমাদের।

—কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব হবে ?

—সম্ভব হবে এই কারণে যে খুনী বিনয়বাবুর অতি পরিচিত ব্যক্তি। কিংবা সেই ধরনের কোনও ছদ্মবেশে এসেছিল।

—কিন্তু উদ্দেশ্য—মানে 'মোডাস অপারেণ্ডি' কি হতে পারে ?

G1068

—সেটা হয়ত ক্রমশ বোঝা যাবে। আচ্ছা, যতদূর জানতাম বিনয়বাবু মৃতদার। ছেলেপুলেও কেউ ছিল না। চাকরবাকরেরাও সব সময় কাছে থাকত না।

—কেবল একজন দ্বারোয়ান আর একটি চাকর রাত দশটার পরে একতলার ঘরে থাকত।

—তারা কাউকে আসতে বা যেতে দেখেনি ?

—হ্যাঁ, কাল রাত দশটায় এসেছিলেন একটি নারী বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে। শুনলাম তিনি নাকি আগেও দু একবার এসেছেন তাঁর কাছে। বিমলা দেবী তাঁর নাম—তাঁর বাবার সঙ্গে নাকি বিনয়বাবুর পার্টনারশিপ ছিল। বাবা মারা যেতে এখন মেয়ে হিসেবপত্র নিতে আসেন হয়ত···

—তিনি যান কখন ?

—তাঁকে যেতে কেউ দেখেনি—মানে তারা ঠিক খেয়াল করেনি। হয়ত বৃষ্টি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে···

—কিন্তু একটি মেয়ের পক্ষে ত এভাবে খুন করা সম্ভব নয় !

—তা ত নয়ই ! দেয়ার ইজ্ সাম্ মিস্‌ট্রি বিহাইণ্ড ইট্—বিরাট একটা রহস্য আছে এর পেছনে। কিন্তু কোথায় ?

—হয়ত ঘরটা ভাল করে সার্চ করলেই বেরিয়ে পড়তে পারে কোনও সূত্র !

—দেখা যাক্।

দুই

—হত্যার উদ্দেশ্য—

সমস্ত ঘরখানা তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হলো।

একটা ড্রয়ারের মধ্য থেকে বের হলো একটা ছোট চিঠি। সেখানা উল্টেপাল্টে দেখে দীপক বলে—এর সঙ্গে যেন এ কেসের একটা যোগাযোগ পাওয়া যাচ্ছে!

—দেখি কি চিঠি। বললেন মিঃ বাসু।

দীপক সেখানা তুলে দেয় মিঃ বাসুর হাতে। তিনি পড়ে চলেন চিঠিখানা :

শ্রীবিনয় মল্লিক

সমীপেষু—

আপনার ওখানে আমার আজ রাতে যাবার কথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটা জরুরী 'লেবার' কেসে আটকে পড়লাম। আজ রাতে যেতে পারব না বলে দুঃখিত।

আমি কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করব। বেলা দশটা নাগাদ।

আশা করি ইতিমধ্যে আপনার শরীর তেমন খারাপ হবে না নিশ্চয়ই!

আর একটা কথা, বিমলা দেবীর সঙ্গে আজ আপনার ওখানে এন্‌গেজমেন্ট ছিল। তাঁর সঙ্গে দেখাও আজ হলো না বলে দুঃখিত।

তিনি যদি আপনার ওখানে এসে থাকেন, তাঁকে বলবেন পরে যে কোনও দিন তাঁকে এক্‌জামিন করব।

প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে—

ভবদীয়—

ডাঃ মিত্র।

চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে মিঃ বাসু বলেন—এতক্ষণে বোঝা গেল কি উদ্দেশ্যে বিমলা দেবী এসেছিলেন মিঃ মল্লিকের কাছে। বোধ হয় কোনও শারীরিক অসুস্থতা ডাঃ মিত্রকে দেখাবার প্রয়োজন ছিল সেদিন। তাই তিনি সেদিন…

বাধা দিয়ে দীপক বলে—কিন্তু একটা কথা মিঃ বাসু। কোথা দিয়ে কখন বিমলা দেবী চলে যান তা কেউ জানে না। যদি এ কথা সত্যি হয় যে কোনও লোকের সাহায্যে ডাঃ মিত্র চিঠিটা পাঠিয়ে থাকেন, আর যদি সেটা পেয়ে তক্ষুণি বিমলা দেবী চলে গিয়ে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তার পরে—মানে রাত প্রায় এগারোটায় বিনয় মল্লিক নিহত হন।

মিঃ বাসু কথাটা শুনে মৃদু হেসে বলেন—আমরা শূন্যের মধ্যে প্রাসাদ তৈরী করছি না ত মিঃ চ্যাটার্জী! বিমলা দেবী আর ডাঃ মিত্রের সঙ্গে দেখা না করে কিছু বলা যায় না।

তাঁর কথার দিকে দীপকের আদৌ মন ছিল না। সে তখন মনোযোগ দিয়ে দেখছিল মিঃ মল্লিকের চেকবইটা।

মিঃ বাসু বলেন—ওটাতে কি দেখছেন মিঃ চ্যাটার্জী?

দীপক বলে—দেখছি একটা ইন্‌টারেস্টিং জিনিস। মিঃ মল্লিক ছিলেন আজীবন কৃপণ প্রকৃতির লোক। তিনি নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে

রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর চেকবইতে দেখতে পাচ্ছি মাত্র একুশ টাকা দশ আনা তাঁর ব্যাঙ্কে জমা!

—অ্যাব্‌সার্ড! মিঃ বাসু বলে ওঠেন—তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জানি তাতে তাঁর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশের কাছাকাছি হওয়া উচিত।

—তা বটে। কিন্তু চেকবই বলছে বর্তমানে তাঁর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কম হলেও মাস তিনেক আগেও তা ছিল তেত্রিশ হাজারের কাছাকাছি!

—তা হলে তিনি সম্প্রতি...

—হ্যাঁ, প্রচুর টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়েছিলেন।

—কিন্তু কেন তিনি তুলেছিলেন এত টাকা?

—তা ত বোঝা যাচ্ছে না ঠিকমত।

—কেউ তাঁকে ব্ল্যাকমেল করত না ত? ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবার জন্যে অনেক সময় এ রকম অবস্থা হয়ে থাকে দেখা গেছে।

—তাও অসম্ভব নয়। কিন্তু সে রকম প্রমাণ ত পাচ্ছি না আমরা। একটা কিছু আন্দাজে ঠিক করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়!

—কিন্তু একটা কথা শুধু আমার মনে বার বার জাগছে। এত টাকা যিনি হঠাৎ তুলে নিলেন তিনি নিশ্চয়ই এক আশ্চর্য প্রকৃতির লোক সন্দেহ নেই! হয়ত ব্যাঙ্কের সব টাকা তিনি কাকেও দান করে বসে আছেন!

—কিন্তু একটা কথা মিঃ বাসু...

—বলুন।

—দেখুন ত কোণের ওই সিন্দুকটাতে কোনও সূত্র পাওয়া যায় কিনা!

—তাই ত! ওটার কথা আমাদের মনেই হয়নি। ওটার চাবি কার কাছে থাকে?

—চাকরকে ডেকে খোঁজ নিলেই জানা যাবে।—দীপক বলে—আসুন আমার সঙ্গে নিচের ঘরে। চাকর শত্রুঘ্নের কাছে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে।

—তা বটে। চলুন মিঃ চ্যাটার্জী। এ খবরটা আমাদের এক্ষুণি জানা প্রয়োজন!

দুজনে নিচে নেমে আসেন।

কিন্তু শত্রুঘ্নের কাছেও কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। শুধু শোনা যায় চাবির খবর সে জানে না। বিনয়বাবু নিজের জিম্মাতেই সিন্দুকের চাবি রাখতেন।

দীপক আর মিঃ বাসু দোতলার ঘরে এলেন। তন্ন তন্ন করে প্রত্যেকটি স্থান খোঁজ করেও চাবির সন্ধান পেলেন না তাঁরা।

দীপক বলল—এখন উপায় কি মিঃ বাসু?

মিঃ বাসু বলেন—সিন্দুকের তালা ভেঙ্গে খুলে ফেলবার ব্যবস্থা করতে হবে।

—তা ত বটেই। কিন্তু এখনই তা হলে কোনও আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীতে ফোন করা উচিত।

—হ্যাঁ। আমি সে ব্যবস্থা এক্ষুণি করছি।

তাঁরা দুজনে নিচে নেমে এসে তক্ষুণি ভবানীপুর অঞ্চলের একটি বিখ্যাত স্টীল ট্রাঙ্কের দোকানে ফোন করলেন।

তারপর মিঃ বাসু বললেন—এর পর আর কিছু কি আমাদের আপাততঃ করবার নেই?

—না, দীপক বলে—এর পরবর্তী কাজ হচ্ছে বিমলা দেবী আর ডাঃ মিত্রের কাছে খোঁজখবর নেওয়া। কারণ এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বার্থজড়িত

এমন কোনও আত্মীয়ের খবরও পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই স্বার্থ নিশ্চয়ই বাইরের কোনও লোকের। আমার মনে হয় এই দু জায়গায় খোঁজ নিলে হয়ত একটা 'সোস' মিলবে। এখন আপাততঃ লাসটা মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন শুধু।

আধঘন্টার মধ্যে স্টীল ট্রাঙ্ক কোম্পানী থেকে লোক এসে উপস্থিত হলো।

দোহারা চেহারার একজন ভদ্রলোক। মুখে দু তিনটে পান গোঁজা। অনেক কষ্টে অতগুলো পান মুখে রেখেছেন বলে বোঝা যায়। পরনে আধ-ময়লা ধূতির ওপর ফর্সা পাঞ্জাবী চাপানো। সমস্ত চেহারার মধ্যে কেমন যেন একটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভাব।

দীপক ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বলল—একটা লোহার সিন্দুকের তালা খোলবার জন্যে আপনাকে ডাকা হয়েছে।

—বুঝেছি স্যর! গদ্‌গদকণ্ঠে বলেন ভদ্রলোক—হুকুম করেন ত এক্ষুনি সিন্দুক খুলে দিচ্ছি…

—কিন্তু যন্ত্রপাতি ত কিছু দেখছি না আপনার সঙ্গে!

—সব আছে। ভদ্রলোক তাঁর সার্টের সুদীর্ঘ পকেটের মধ্যে হাত পুরে বের করেন গোটা দুই তিনেক যন্ত্র। বলেন—এর দ্বারাই সব 'ম্যানেজ' করে নেব।

—বেশ, আসুন পাশের ঘরে।

সকলে পাশের ঘরে যান। দীপক সিন্দুকটা দেখিয়ে দিলে ভদ্রলোক সেটার দিকে চেয়ে বলেন—আরে, এ সিন্দুকের চাবি ত আমার কাছেই আছে! আমি এক্ষুনি খুলে দিচ্ছি!

—আপনার কাছে আছে?

—হ্যাঁ, গত সপ্তাহে এ সিন্দুকের চাবিটা হারিয়ে গিয়েছিল। মিঃ মল্লিক তাই আমাকে ডাকিয়ে এর একটা নকল চাবি তৈরী করিয়ে নেন। তাই এর চাবি আমার চেনা।

—ঠিক বলছেন আপনি?

—হ্যাঁ স্যর! দেখুন না…

ভদ্রলোক এবার বাঁ পকেটে হাত পুরে একগোছা চাবি বের করেন। একটা চাবি সিন্দুকের তালায় ঢুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকটা খুলে ফেলে বলেন—দেখলেন ত!

দীপক কোনও কথা বলে না। একবার মিঃ বাসুর মুখের দিকে চেয়ে সিন্দুকটা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে।

টাকা পনের কুড়ির রেজকি ছাড়া সিন্দুকে আর কিছুই পাওয়া যায় না!

দীপক ধীরকণ্ঠে শুধু বলে—এতক্ষণে তাহলে খুনের উদ্দেশ্য আমার কাছে পরিষ্কার হলো!

মিঃ বাসু কোনও উত্তর দেন না।

তিন

—ডাঃ মিত্র ঃ মিত্রা দেবী—

পরদিন বেলা আটটা।

দীপক তার বাড়ির হলঘরে বসে সকালের খবরের কাগজের পাতা উল্টে চলেছিল।

চাকর ভজুয়া চা দিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল রতনলাল।

দীপক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রতনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—তোর চা খাওয়া হয়ে গেছে নাকি?

হ্যাঁ। রতন উত্তর দেয়।

দীপক হেসে বলে—যাক্, আর এক কাপ চলতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই। চা না হলে রহস্যের গ্রন্থিগুলো সব সময় সহজ হয়ে আসতে চায় না! ভজুয়া আর এক কাপ নিয়ে আয়। এবার আমাদের গুরুতর আলোচনা হবে।

চা এলো। সঙ্গে কিছু পট্যাটো চিপস্।

দীপক ভজুয়ার দিকে চেয়ে হেসে বলে—এইজন্যেই তোকে আমার এত ভাল লাগে ভজুয়া! ঠিক যে সময় যে জিনিসটি চাই, হাতের কাছে এনে দিতে পারিস্ তুই।

রতনের দিকে চেয়ে দীপক বলে—কালকের ঘটনাগুলি ত সব শুনেছিস! এ সম্বন্ধে তোর ধারণা কি?

রতন বলে—আগে ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে দেখ, টাকাগুলো উনি কোনও বিশেষ কাজে খরচ করেছেন কিনা!

—না, তা উনি যে করেননি এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। বোধ হয় সিন্দুকেই টাকা ছিল।

—চেকের কাউন্টারফয়েলে কিছু লেখা ছিল না?

—কিছু না।

—এর কারণ?

—সেটা সত্যি একটা মিস্ট্রি। এ রকম ত বড় একটা দেখা যায় না!

—এখন সবার আগে বের করতে হবে এই টাকাগুলো কোথায় কি ভাবে হঠাৎ অদৃশ্য হলো। এর সঙ্গে হয়ত হত্যাকাণ্ডের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। তাই নয় কি?

—সে ত করতেই হবে! কিন্তু এ ধরনের খুন—মানে এমন নিখুঁত খুন করবার প্ল্যান সকলের পক্ষে সম্ভব নয়!

—তা ত বটেই! রতন বলে—আমি স্বীকার করছি যে প্ল্যানটা ঠিক নিখুঁতই হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা শুধু ভাবছি বার বার···

—কি কথা? দীপক প্রশ্ন করে।

—কোনও মানুষ নিশ্চয়ই মুখখানা হাঁ করে বলে না তাকে গুলি করতে। গুলি যখন মুখের উপরের তালুতে গিয়ে বিঁধেছে তখন সুইসাইড্‌টাই বেশি 'প্রবেব্‌ল্'। কিন্তু ঘটনাপরম্পরা প্রমাণ করছে এটা আত্মহত্যা নয়। আর যে রিভলভারটা মৃতদেহের পাশে পাওয়া গেছে সেটা এমন ভাবে পাশে ফেলা ছিল, যেন কেউ ওটা ওখানে ফেলে রেখে গেছে! তা হলে এর মধ্যে একটা মস্ত বড় alibi রয়ে যাচ্ছে নাকি?

—তা ত যাচ্ছেই, দীপক বলে—কিন্তু সে 'এলিবি'র সমাধান হবে অন্য পথে। ব্যাঙ্কে খোঁজ নিতে হবে টাকার ব্যাপারে। বিমলা দেবী আর ডাঃ মিত্রের কাছে খোঁজ নিতে হবে মিঃ মল্লিকের নিজের অতীত জীবনের

ব্যাপারে। আর চাকর দুজন এবং দ্বারোয়ানের জবানবন্দী নিচ্ছেন ইন্স্পেক্টার বাসু। তাঁর কাছ থেকেই অন্য ব্যাপারগুলো জানা যাবে।

—যাক, আপাততঃ আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম কি ?

—সোজা এখুনি আমাদের রওনা হতে হবে এশিয়াটিক ব্যাঙ্কের হেড অফিসে। ওখানেই ছিল মিঃ মল্লিকের অ্যাকাউন্ট।

এশিয়াটিক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ সমাদ্দার দীপকের খ্যাতি শুনেছিলেন ইতিপূর্বে। দীপকের প্রতি যথেষ্ট আস্থা এবং বিশ্বাসও যে তাঁর ছিল তা তাঁর সম্বর্ধনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা গেল।

দীপক মিঃ সমাদ্দারের দিকে চেয়ে বলে—শুনুন মিঃ সমাদ্দার, এমন একজন লোকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিস্তৃত বিবরণ আমি জানতে এসেছি যিনি সম্প্রতি একজন অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে আমাদের ধারণা।

—মিঃ মল্লিকের কথা বলছেন নিশ্চয়ই ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু খবরের কাগজে ত বের হয়েছে মিঃ মল্লিক আত্মহত্যা করেছেন। এমন কি তাঁর দেহের কাছে প্রাপ্ত রিভলভারের ওপরেও তাঁরই আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেছে।

—তা বটে। কিন্তু তবুও আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের ধারণা এটা একটা 'প্রিপ্ল্যান্‌ড্‌ মার্ডার'—এর পেছনে কতকগুলি জটিল স্বার্থ জড়িত ছিল।

—কিন্তু কি সে স্বার্থ ? কার স্বার্থ ?

—তা জানি না। জানি না বলেই ত তদন্ত করতে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারগুলো।

—বুঝেছি মিঃ চ্যাটার্জী। এবার কি কি পয়েন্ট আপনি জানতে চান বলুন।

—মিঃ মল্লিক কতদিন হলো আপনার ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন ?

—সে আজ প্রায় দু বছর হলো।

—তার আগে উনি কি কোল্‌কাতার বাইরে ছিলেন ?

—সে খবর আমরা রাখি না। হয়ত ওঁর বন্ধু ডাঃ মিত্র রাখতে পারেন সে খবর। তবে এটা ঠিক, তাঁর রেকমেণ্ডেশনে যদিও মিঃ মল্লিক এ ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন, তবু ডাঃ মিত্রের চেয়ে মিঃ মল্লিকের অনেক বেশী গুণ টাকা জমা ছিল এ ব্যাঙ্কে।

—আচ্ছা, প্রথম যখন উনি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলেন, তখন কত টাকা জমা দিয়েছিলেন ?

—সেটা অ্যাকাউন্ট বুক না দেখলে বলতে পারব না। আচ্ছা সে ব্যবস্থা করছি এক্ষুণি।

মিঃ সমাদ্দার কলিং বেল টিপলেন। বেয়ারার প্রবেশ ও সেলাম। মিঃ সমাদ্দার আদেশ দেন—যাও, পাঁচ নম্বর 'অ্যাকাউন্ট বুক'টা নিয়ে এসো। নাইনটিন ফিফ্‌টি-ওয়ানের।

বেয়ারার সেলাম ও প্রস্থান। একটু পরে মোটা একটা অ্যাকাউন্ট বুক হাতে প্রবেশ করে সেটা টেবিলের ওপর রাখে।

মিঃ সমাদ্দার মনোযোগ দিয়ে অ্যাকাউন্ট বুকটা দেখতে দেখতে বললেন—প্রায় এক লাখ টাকা উনি জমা দিয়েছিলেন আমাদের ব্যাঙ্কে।

—এক লক্ষ ? বিস্মিত দীপক প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, কিন্তু তারপর কুড়ি হাজার টাকা তুলে নেন বাড়ি কেনবার জন্যে। আর তার ঠিক পনর দিন পরে দশ হাজার টাকা তুলে নিয়ে একটি গাড়িও

কেনেন। ব্যাঙ্কে তারপর যে টাকা ছিল তা উনি by instalment কিছু কিছু করে তুলতেন।

—বুঝলাম। মৃদু হেসে দীপক বলে—এখন লেটেস্ট অ্যাকাউন্টটা একবার দেখা দরকার।

—বেশ, সে ব্যবস্থাও করছি মিঃ চ্যাটার্জী।

দীপকের কথায় মিঃ সমাদ্দার কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বুকটা আনান। সেটা দেখে চিন্তিতস্বরে বলেন—গত দু বছরে কিছু কিছু টাকা তুলেও মোট প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ওঁর ব্যাঙ্কে জমা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি অনেকগুলি ব্যাঙ্ক পর পর ফেল হওয়ায় মিঃ মল্লিক একদিন স্বয়ং এসে সব টাকা তুলে নিয়ে যান। আমরা জিজ্ঞাসা করলে উনি সেদিন বলেন—ও টাকাটা উনি এবার নিজের কাছেই রাখবেন। এমন কি এজন্যে একটা সিন্দুকও উনি ক্রয় করেন।

—থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ সমাদ্দার! আমার যা জানবার তা জানা হয়ে গেছে। চলি আজকের মতো।

—এক কাপ চা? মিঃ সমাদ্দার আবেদন জানান।

—নো, থ্যাঙ্কস্! চলি আজকের মতো। আরও অনেকগুলি এন্‌গেজ-মেন্ট আছে। বরং পরে সুবিধেমতো একদিন এসে আপনার এখানে চা খেয়ে যাব।

বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে দীপক ও রতন বেরিয়ে পড়ে।

গাড়িতে বসেছিল দীপক আর ইন্‌স্পেক্টর বাসু।

দীপক হেসে প্রশ্ন করে—তা হলে চাকর-দ্বারোয়ান বা ড্রাইভারের স্টেট্‌মেন্ট থেকে কিছুই পাওয়া গেল না?

মিঃ বাসু বলেন—ড্রাইভার ত আর ও বাড়িতে থাকত না। সকালে গাড়ি নিয়ে আসত, সন্ধ্যায় বিদায় নিত। তা ছাড়া সম্প্রতি মিঃ মল্লিক বাড়ি থেকে বের হওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। শুধু···

—শুধু?

—মাঝে মাঝে দু একদিন বিমলা দেবীর সঙ্গে মোটর ট্রিপ···

—প্রৌঢ় বয়সে হঠাৎ এ ধরনের সখ? দীপক হেসে প্রশ্ন করে।

—স্টেট্‌মেন্ট দেখলে বুঝতে পারবেন বিমলা দেবী ছাড়া আরও দু একজন সোসাইটি গার্ল···

—স্ট্রেঞ্জ!

—যাক্, স্টেট্‌মেন্টগুলো এখন থাক। ডাঃ মিত্রের কথাই শোনা যাক। ওঁর বাড়ির পাশে গাড়ি এসে পৌঁছে গেছে। এক্ষুণি আমাদের নামতে হবে।

—ধন্যবাদ মিঃ বাসু! চলুন দেখি, কোনও পাস্ট হিস্ট্রি যদি···

ডাঃ মিত্রের বাড়িটা ছোট হলেও বেশ নতুন ধরনের প্যাটার্নে তৈরী। রসা রোডের ওপর আধুনিকতম ডিজাইনে তৈরী যে বাড়িগুলো পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ডাঃ মিত্রের বাড়ি তার মধ্যে একটি।

ডাঃ মিত্র বাড়িতেই ছিলেন। দীপক ও ইন্‌স্পেক্টর বাসুর আগমনের সংবাদ পেয়ে বেরিয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান।

—আসুন মিঃ চ্যাটার্জী! সো গ্লাড টু মিট্ ইউ। মিঃ বাসু, নিশ্চয়ই কোনও আর্জেন্ট কেসের বিষয়ে আলোচনা···

—এক্‌জ্যাক্টলি সো! মিঃ বাসু সমর্থন জানান।

—আপনারা দুজনে আমার ভেতরের ঘরে আসুন। একটু বসুন। আমি ভেতরে চায়ের কথাটা বলে আসি··

—অত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই ডাঃ মিত্র !

—নো নো, ইট্ ইজ ফর্ম্যালিটি মিঃ বাসু। এটা সাধারণ ভদ্রতা।

এক ঝলক হাসির প্রবাহে ঘরখানিকে ভরিয়ে তুলে ডাঃ মিত্র বেরিয়ে যান ঘর ছেড়ে।

দোহারা, পেশীবহুল ডাঃ মিত্রের দেহ। মাথার সামনের দিকে খানিকটা টাক। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। হোম্‌লি ড্রেসে তাঁকে চমৎকার মানিয়েছিল।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ডাঃ মিত্র ফিরে এসে বসেন। বেতের চেয়ারে মুখোমুখি ওঁরা তিনজন।

দীপকই প্রথমে কথা সুরু করে—আমরা মৃত মিঃ মল্লিকের বিষয়ে তদন্তের সূত্র ধরেই আপনার এখানে এসেছি ডাঃ মিত্র।

—বুঝেছি। ডাঃ মিত্র বলেন—আপনারা যে আসবেন তা আমি জানতাম। কেননা এক্ষেত্রে ব্যাপারটা সুইসাইড্ না মার্ডার এটা বেশ একটু চিন্তার বিষয়। আমি পেপারে সব পড়েছি।

—কিন্তু আপনার অত বড়ো অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যুতে আপনি দেখতে যাননি কেন ডাঃ মিত্র? দীপক প্রশ্ন করে।

—দেখুন, আমার পক্ষে হয়ত সে দৃশ্য সহ্য করা কষ্টকর হতো মিঃ চ্যাটার্জী। আপনি ঠিকই বলেছেন, বিনয়বাবু ছিলেন আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। তাই ফোনে তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়েই...

—ফোনে?

—হ্যাঁ। ব্যাপারটা তা হলে খুলেই বলি মিঃ চ্যাটার্জী। ওঁর শরীরটা ইদানীং খুব ভাল যাচ্ছিল না বলে কম্প্লেন করছিলেন উনি আমার কাছে। কিন্তু আমি দেখেছি, হি হ্যাড্ গট্ এ সাউণ্ড ফিজিক্ ··

—তবে তাঁর কি কোনও মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য ··

—একজ্যাক্টলি। মনের দিক থেকে কোনও একটা পরিবর্তন ঘটেছিল। এটা আমি বেশ ভাল করেই মার্ক করেছি মিঃ চ্যাটার্জী। তাই সেদিন বিকেলে উনি যখন আমাকে ইন্‌ভাইট করলেন আমি এড়াতে পারিনি। মানসিক কোনও চাঞ্চল্য ঘটলেও তা দেখা ডাক্তারের কর্তব্য। কিন্তু একটা 'লেবার' কেসে আটকে যাই সেদিন সন্ধ্যায়। একটি ছেলেকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিই যে পরদিন সকালে যাব। কিন্তু পরদিন সকালে ওঁর চাকর শত্রুঘ্ন আমাকে ফোনে জানাল যে হি ইজ্ ডেড্!

—তখন আপনি কি ভাবলেন?

—আমি কিছু ভাবিনি। শত্রুঘ্নই বলল যে এটা আত্মহত্যা বলে মনে হয়। কিন্তু কেন যে উনি এমন করলেন তা সে বুঝতে পারেনি।

—আপনার কি তখন অন্য কোনও সন্দেহ হয়েছিল?

—না।

—কেন?

—মার্ডারের কথা তখন ভাবতেই পারিনি। ভেবেছি আত্মহত্যা এক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। হয়ত কোনও একটা মেন্টাল এক্সেনট্রিসিটি···

—তেমন কোনও প্রমাণ সম্প্রতি পেয়েছিলেন কি ডাঃ মিত্র?

—নিশ্চয়ই।

কথার শেষে চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সুন্দরী একটি মেয়ে। বয়স আঠারো থেকে উনিশের মধ্যেই মনে হয়। অপূর্ব সুন্দরী। কবির ভাষায় বলতে গেলে চাঁপাফুলের মত গায়ের রং। নিটোল স্বাস্থ্য চেহারার মধ্যে আরও অপরূপত্ব এনে দিয়েছে।

—এ হচ্ছে আমার মেয়ে মিত্রা। মা-মরা একমাত্র মেয়ে—তাই এত স্নেহ

দিয়ে আমি ওকে মানুষ করে তুলেছি। মিত্রা, ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী, আর ইনি হচ্ছেন ইন্‌স্পেক্টর বাসু।

—নমস্কার!

ঘাড়টি ঈষৎ আন্দোলিত করে মিত্রা দীপক ও মিঃ বাসুকে নমস্কার জানায়।

ওঁরা প্রতিনমস্কার জানান। দীপক প্রশ্ন করে—আপনি মিঃ মল্লিককে নিশ্চয়ই চেনেন মিত্রা দেবী?

—কে? বিনয় মল্লিক?

—হ্যাঁ।

—তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল বটে, তবে তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তাঁকে আমি কাকাবাবু বলে ডাকতাম।

—বুঝেছি। ওঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চয়ই জানেন?

—হ্যাঁ, সেদিন বাবার মুখে শুনলাম বটে যে রিভলভারের গুলিতে ওঁর মৃত্যু ঘটেছে।

—কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি কোনও লোক বিশেষ কারণেই ওঁকে হত্যা করেছে।

মিত্রার মুখখানা কেমন যেন ফ্যাকাশে আকার ধারণ করে। কিছুটা অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলে ওঠে—খুন! মানে মার্ডার?

—হ্যাঁ। দীপক বলে।

—আশ্চর্য!

—কেন, আপনি এমনটা ধারণা করতে পারেননি?

—পারিনি? না, পারিনি সত্যিই। বুঝিনি যে ব্যাপারটা সত্যিই সত্যি হয়ে দাঁড়াবে!

—কোন্ ব্যাপার?

—বাবার কাছেই আপনারা তা জানতে পারবেন। আর জানতেন বিমলা দেবী। বিমলা দেবীর সঙ্গে সম্প্রতি মিঃ মল্লিকের খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বলে শুনেছি।

কথা না বাড়িয়ে মিত্রা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় লঘুপায়ে। এক ঝলক হাল্‌কা হাওয়া ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় যেন!

—কোন্ ব্যাপারের কথা উনি বললেন ডাঃ মিত্র? দীপক প্রশ্ন করে।

—সেই পুরোনো হিস্ট্রিই আমি আজ বলব মিঃ চ্যাটার্জী। আজ থেকে পনর বছর পূর্বেকার কথা।

—পনর বছর পূর্বে?

—হ্যাঁ, মিঃ মল্লিক আজ থেকে পনর বছর পূর্বে আফগানিস্তান সীমান্তে একটা চাকরী পেয়ে চলে যান। মিলিটারীতে চাকরী নিয়েই গিয়েছিলেন উনি। তারপর মিলিটারী থেকে অবসর নিয়ে ওখানে একটা লোক্যাল কোম্পানীতে চাকরী নেন।

—তারপর?

—তারপর সুদীর্ঘ তেরো বছর ওঁর কোনও খবর আমি জানতাম না। তেরো বছর পরে উনি যেদিন আফগানিস্তান থেকে ফিরে এলেন সেদিন শুনলাম যে উনি একজন লক্ষপতি।

কথাশেষে ডাঃ মিত্র চায়ের কাপে সুদীর্ঘ একটি চুমুক দিলেন।

তাঁর চোখে ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে পুরোনো দিনের স্মৃতি। ডাঃ মিত্র বলে চলেন তাঁর কাহিনী।

চার

—পুরোনো দিনের কথা—

দুটি বছর আগের কথা।

ডাঃ মিত্রের রসা রোডের বাড়ি।

ইতিমধ্যেই ডাঃ মিত্রের প্র্যাকটিস বেশ জমে উঠেছে। তাঁর রসা রোডের বাড়িতে যথেষ্ট রোগীর ভিড় দেখা যায়।

বেলা পাঁচটা।

একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল তাঁর বাড়ির সামনে। গেট দিয়ে ঢুকে লন পেরিয়ে সোজা তাঁর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় ট্যাক্সিটা।

ডাঃ মিত্র চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

ট্যাক্সি থেকে নামেন ডাঃ মিত্রের বহুপুরোনো বন্ধু বিনয় মল্লিক। ট্যাক্সি ড্রাইভার ট্রাঙ্ক আর লগেজ নামিয়ে ভাড়াটা নিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যায়।

ডাঃ মিত্র সোজা এসে দাঁড়ান মিঃ মল্লিকের সামনে।

—আরে, বিনয়বাবু না? এতদিন বাদে হঠাৎ সুদূর আফগানিস্তান থেকে একেবারে বাংলা মুলুকে চলে এলেন দেখছি!

—হ্যাঁ, ভাবলাম শেষ বয়সে বাংলা মায়ের কোলেই এসে আশ্রয় নেব। যাক, জীবনে অনেক কাজ করলাম। এবার শেষ বয়সে একটু বিশ্রাম চাই। চাই কিছু 'রিক্রেয়েশন'।

—খুব ভাল। কিন্তু আপনার শরীর আগের চেয়ে খারাপ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে!

—তা ত হয়েছেই! কি পরিমাণ খাটুনিই যে গেল তা আপনি কি করে জানবেন। আপনার কল্পনারও বাইরে সে কথা! এখন তাই বিশ্রাম নিয়ে শরীরটাকে সুস্থ করে তুলতে চাই।

—সত্যি বিনয়বাবু, আপনি চিরদিনই কেমন যেন মিস্টিরিয়াস রয়ে গেলেন আমাদের কাছে। কলেজ জীবনেও আপনি চিরদিন ছিলেন এমনি রহস্যময় ও খামখেয়ালী। দু তিন বছর আপনার সহপাঠী হয়েও ঠিক চিনতে পারিনি আপনাকে! তারপর হঠাৎ একদিন কি কারণে যে বাংলা ছাড়লেন আর কেনই বা ফিরে এলেন···

—সবই রহস্যময়, তাই না? মিঃ মল্লিক কথাটা বলে হো হো করে হেসে ওঠেন।

—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি আপনার কাছে। আশা করি সঠিক উত্তর পাব?

—নিশ্চয়ই!

—আচ্ছা বলুন ত মানুষ তার জীবনে কি পেতে চায়। হোয়াট্ এ ম্যান ডিজায়ার্স?

—সেটা ত সত্যি নিরূপণ করা কঠিন।

—কঠিন কিছু নয়! অত্যন্ত সহজ!

—কেন বলুন ত?

—মানুষ চায় সুখ। চায় শান্তি। তৃপ্তি। মানুষের টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি সবই সেই একই কারণে ব্যয়িত হয়!

—তা অবশ্য সত্যি।

—আমি তেমনি চাই শেষ বয়সে কিছু সুখ। কিছু শান্তি। কিছু আনন্দ। এখন একটা বাড়ি আর একখানা গাড়ি আমার এখুনি চাই। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও অবশ্য এর মধ্যেই কোল্‌কাতায় ট্রান্সফার করে ফেলবার ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

—সে সব কথা পরে হলেও চলবে। আপাততঃ চলুন স্নানাহারের ব্যবস্থা করে ফেলি।

—বেশ, চলুন ভেতরে যাওয়া যাক। বৌদির সঙ্গে দীর্ঘদিন বাদে দেখা হচ্ছে। উনিও নিশ্চয়ই…

—আপনার বৌদি আর নেই বিনয়বাবু! তিন বছর আগেই তিনি পৃথিবীর সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেছেন।

অপরিসীম ব্যথায় ডাক্তার মিত্রের কণ্ঠ যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

ডাঃ মিত্রের ব্যথার স্থানে আঘাত লেগেছে বুঝতে পেরে বিনয়বাবু বলেন—দুঃখ করে কোনও লাভ নেই ডাঃ মিত্র। 'দি ওয়েজ্‌ অব্‌ গড্‌ ইজ্‌ ইন্‌ডিস্‌পেন্‌সিব্‌ল্‌'—ভগবানের বিধান অপরিবর্তনীয়! কিন্তু আপনি আবার বিয়ে করলেন না কেন? অবশ্য যদি এ ব্যক্তিগত প্রশ্নে কিছু মনে না করেন!

—না না, মনে করবার কিছু নেই বিনয়বাবু। সত্যি কথা বলতে গেলে আমি বিয়ে করিনি আমার মিত্রা মায়ের মুখের দিকে চেয়ে।

—বুঝেছি। কিন্তু ও ত চিরদিন আপনার কাছে থাকবে না ডাঃ মিত্র।

—তা থাকবে না সত্যি। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে ওর মনে কষ্ট দিতে চাই না আমি। তা ছাড়া, ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, আপনিও ত এখনও বিয়ে করেননি বিনয়বাবু।

—ইন্ মাই কেস্, আমার অন্য কারণ রয়েছে ডাঃ মিত্র। এ পাস্ট ট্র্যাজিক হিস্ট্রি—কিন্তু এ কথা আমি বলতে পারতাম না যে চিরদিনই আমি ব্যাচিলার

থাকব। আই মাইট্ হ্যাভ্‌ ম্যারেড্‌ অ্যাট্ এনি টাইম্। শুধু বলতে পারেন তেমন যোগাযোগ ঘটেনি বলেই আমি আজ অবধি আন্‌ম্যারেড্‌ রয়ে গেছি।

কথায় কথায় দুজনে ভেতরে যান।

ডাঃ মিত্র সেদিন দুপুরে বিশেষ খাবার ব্যবস্থা করতে বলেন। সারাটা দিন আনন্দ আর কথাবার্তার মধ্যেই ওঁদের দিন কাটে।

পুরো পনেরটি দিন ডাঃ মিত্রের বাড়িতেই রয়ে গেলেন মিঃ মল্লিক।

মিত্রার সেবা-যত্নে মুহূর্তের জন্যেও ওঁর এ কটা দিন 'বোরিং' বলে মনে হয়নি।

প্রতিটি মুহূর্তে যেন ঘড়ি ধরে মিত্রা বিনয়বাবু এবং ডাঃ মিত্রের প্রতিটি কাজ করে। কার কখন কি প্রয়োজন তা যেন 'থট্ রীডিং' করে জানতে পারে মিত্রা। কাজের সময় দেখা যায়, যখন যে জিনিসটির প্রয়োজন তা ঠিক হাতের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।

মিঃ মল্লিক একদিন তাই কথায় কথায় ডাঃ মিত্রকে বলেন—মিত্রা মা'কে দেখে আমার শুধু একটি নারীর কথাই মনে জাগে ডাঃ মিত্র!

ডাঃ মিত্র বলেন—কার কথা?

হাসতে হাসতে মিঃ মল্লিক বলেন—ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল!

ডাঃ মিত্রও হো হো করে হেসে ওঠেন এ কথা শুনে।

মিঃ মল্লিক বলেন—কিন্তু এমনি করে আর কতদিন আপনার বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকব ডাঃ মিত্র? আমার সেই বাড়ি কেনার ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি হলো?

—ব্যবস্থা খানিকটা হয়েছে। আগামীকাল বাড়িটা দেখিয়ে আনব। লেক রোডে দোতলা ছোট বাড়ি। হাল্‌কা ধরনের তৈরী। দাম চাইছে ওরা বিশ হাজার…

—আমার আপত্তি নেই ডাঃ মিত্র। বেশ, কালই তা হলে বাড়িটা দেখে আসা যাক। কি বলেন ?

এমন সময় ঘরে প্রবেশ করে মিত্রা। হেসে বলে—কাকাবাবু যেন আমাদের ছেড়ে যেতে পারলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। আমরা যেন ওঁকে দিবারাত্র কতো কষ্ট দিচ্ছি !

মিঃ মল্লিক বলেন—কষ্ট আমি না পেলেও তোমাদের ত কষ্ট দিচ্ছি মা! তা ছাড়া তোমাদের এ ঋণ আমি কোনও দিন শোধ করতে পারব না মিত্রা!

মিত্রা হেসে বলে—তার জন্যে চিন্তা কি ! আমি ঘন ঘন আপনার বাড়িতে গিয়ে নিমন্ত্রণ খেলেই এ ঋণ শোধ হয়ে যাবে।

ডাঃ মিত্র ও মিঃ মল্লিক একসঙ্গে হো হো করে হেসে ওঠেন।

তার পরদিনই লেক রোডের বাড়িখানা কিনে ফেলেন মিঃ মল্লিক। কিছু কিছু সংস্কার করে সেটাকে বাসোপযোগী করে তোলেন।

নতুন মডেলের একখানা গাড়িও অল্পদিনের মধ্যেই কেনা হয়।

নিযুক্ত করা হয় ভৃত্য শত্রুঘ্ন আর রামবিলাসকে। দ্বারোয়ান হরিভকত সিংকেও নিযুক্ত করে গেটে পাহারায় বসানো হয়।

গাড়ির ড্রাইভার নিযুক্ত করে দেন ডাঃ মিত্র। তাঁর কাছে লোকটা ইতিপূর্বে চাকরী করত—নাম ব্রজেন।

সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে মিঃ মল্লিকের জীবন এগিয়ে চলে।

একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও তিনি গড়ে তোলেন। হাজার পাঁচেক টাকা তিনি নিজে ইন্‌ভেস্ট করেন—বাকী পাঁচ হাজার টাকা ইন্‌ভেস্ট করেন ব্রজবিলাস সেন নামে এক ভদ্রলোক। তিনিই হচ্ছেন বিমলা দেবীর বাবা।

ব্যবসাও বেশ ভালই বেড়ে উঠছিল। আর সেই সঙ্গে বেড়ে উঠছিল বিমলা

দেবীর সঙ্গে মিঃ মল্লিকের সৌহার্দ্য। মিঃ মল্লিক যে অর্থবান্ এ কথা বিমলার বাবা ব্রজবিলাসবাবু জানতেন। তাই তিনি এতে আপত্তি করেননি। তা ছাড়া বিমলা তাঁর একমাত্র মেয়ে। সে যাতে সুখী হয়, এটাও তিনি চাইতেন মনে-প্রাণে।

কিন্তু শুধু বিমলা সেনই নয়—আরও বহু আধুনিক মেয়ে ও মেয়ের মায়েরাও মিঃ মল্লিকের বাড়িতে যাতায়াত সুরু করে দিলেন। তার কারণও অবশ্য আছে। কোল্‌কাতার বুকে মিঃ মল্লিকের অমন সুন্দর বাড়ি, গাড়ি—তা ছাড়া কাল্পনিক ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের গল্প। সুন্দর সুন্দর রোম্যান্টিক আইডিয়াতে ভরে উঠত মেয়েদের মন।

আর মেয়ের মায়েরাও আছেন। অনেক আধুনিক রুচিশীল মেয়ের মায়েদের ধারণা জীবনে অপ্রতিষ্ঠিত তরুণ সুন্দর যুবকের চাইতে অর্থবান্, সুপ্রতিষ্ঠিত মধ্যবয়সী পাত্র অনেক ভাল। মেয়েদের অমতেও অনেক সময় মেয়ের মায়েরা সেই দিকেই ঝুঁকে পড়েন।

সেই রকম মায়েরা মেয়েদের নিয়ে সুন্দর সাজে সজ্জিতা হয়ে ঘন ঘন মিঃ মল্লিককে বিরক্ত করতে সুরু করলেন।

আর মিঃ মল্লিক প্রথমে ঠিক ততটা কৃপণ ছিলেন না। বিশেষ করে মেয়েদের আপ্যায়নের কোনও ত্রুটিই ঘটত না তাঁর বাড়িতে। তাই ক্রমশই এমনি মেয়েদের যাতায়াত বেড়ে উঠল। বেড়ে উঠল সোসাইটির বাজারে মিঃ মল্লিকের বাজারদর।

বিশেষ করে সুমনা ব্যানার্জী আর বিমলা সেনের ব্যাপারে আলোচনাই হতো খুব বেশি। তাদের নিয়ে কটাক্ষ আর কথার মারপ্যাচে সোসাইটির বাজার বেশ কিছুদিন গরম হয়ে রইল।

কিন্তু এর মধ্যে একদিন ঘটল একটি মারাত্মক ঘটনা যাতে মিঃ মল্লিক

৩

হঠাৎ কেমন যেন পরিবর্তিত হয়ে গেলেন। পরিবর্তিত হয়ে গেল তাঁর সারা জীবনধারা। তাঁর মন, তাঁর ব্যবহার, তাঁর কাজকর্ম—সব কিছু।

মিঃ মল্লিক বন্ধ করে দিলেন সোসাইটিতে যাতায়াত। বন্ধ হয়ে গেল তাঁর মোটরে ভ্রমণবিলাস। দিবারাত্র যেন ঘরের মধ্যেই কাটাতে সুরু করে দিলেন তিনি।

মেজাজও তাঁর পাল্‌টে গেল। কথায় কথায় লোকের ওপর চটে ওঠেন। দিবারাত্র কি যেন ভাবেন! কি যেন চিন্তা করেন! ঘরের মধ্যে পায়চারী করেন অন্যমনস্কভাবে।

শরীর খারাপ মনে করে ডাঃ মিত্র ঘন ঘন তাঁর বাড়িতে যাতায়াত সুরু করে দিলেন।

মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা ত আর ওষুধে হয় না! মিঃ মল্লিকের জীবনের এ পরিবর্তনকে তাই রোধ করা গেল না। ধীরে ধীরে সোসাইটিতে তাঁর নামে নানা দুর্নাম রটতে লাগল। কঞ্জুস! হাড়কিপ্‌টে! মাথার ঠিক নেই লোকটার! ছটো মেয়ের সর্বনাশ করল! ইত্যাদি—

কিন্তু যে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে মিঃ মল্লিকের জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্তন সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। একমাত্র ডাঃ মিত্র আর মিঃ মল্লিকের ড্রাইভার ব্রজেন ছাড়া আর কেউ জানত না এ কথা। জানত না, কেন মিঃ মল্লিক হঠাৎ রাতারাতি পাল্‌টে গেলেন!

পাঁচ

—রত্নভাণ্ডার—

রাত সাড়ে আটটায় নিমন্ত্রণ।

মিঃ মল্লিক ব্রজেনের দিকে চেয়ে বললেন—একটু জোরে গাড়িটা ড্রাইভ কর ব্রজেন। সাড়ে সাতটা বাজে।

—কোন্ দিকে যাব ?

—সোজা চালাও পার্ক স্ট্রীটের দিকে। জুয়েলার হরকিষণ লছমীনারায়ণের দোকানের সামনে গাড়িটা দাঁড় করাবে।

ব্রজেন ঘাড় নেড়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেয়।

গাড়ি এসে জুয়েলারের দোকানের সামনে থামে। গাড়ি থেকে নেমে মিঃ মল্লিক দোকানের ভেতর পা বাড়ান।

ভেতরে পা দিতেই দোকানের ম্যানেজার এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে তাঁকে আহ্বান জানায়—আসুন স্যর! আপনার পদধূলিতে আমাদের দোকান…

অতিরিক্ত বিনয় মিঃ মল্লিক কোনও দিনই পছন্দ করতেন না। তিনি জ্রূটা ঈষৎ কুঞ্চিত করে বলেন—ভাল হীরার ব্রোচ চাই একজোড়া।

—হীরার ব্রোচ ? গদগদ কণ্ঠে ম্যানেজার বলে—দিচ্ছি স্যর। একেবারে খাঁটি ডায়মণ্ড। রীয়্যাল কমল হীরা বসানো…

বাধা দিয়ে মিঃ মল্লিক বলেন—একটু তাড়াতাড়ি।

হীরার ব্রোচ বের করে ম্যানেজার বলে—দেখুন স্যর! একেবারে আস্‌লী চীজ্। এ রকম দামী মাল এ অঞ্চলে আর কোথাও পাবেন না আপনি।

—তাই নাকি ? মিঃ মল্লিক মৃদু হেসে বলেন।

—নিশ্চয়ই স্যর !

—তা হলে আফগানিস্তানের আসল হীরা দেখলে আপনি ত মূর্ছিত হয়ে পড়তেন !

কথাটা দ্রুত মিঃ মল্লিকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিনি যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কথাটা বলে ফেলেন।

কথা শেষ হয় না।

কোণের কাউন্টারে একজন কাবুলীওয়ালা দাঁড়িয়ে কি যেন একটা জিনিস দর করছিল। এবার সে মুখ ঘুরিয়ে তাকায় মিঃ মল্লিকের দিকে।

চোখোচোখি !

কাবুলীর চোখের ভাষায় কি যেন একটা ক্রূর দৃষ্টি ফুটে ওঠে। মুহূর্তে যেন ফ্যাকাশে আকার ধারণ করেন মিঃ মল্লিক।

সুদীর্ঘদেহী কাবুলী হো হো করে আপন মনেই হেসে দোকানীর সঙ্গে কি কথা বলে।

কিন্তু সেদিকে মন দেবার অবকাশ মিঃ মল্লিকের থাকে না। তিনি দ্রুতপদে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন।

ম্যানেজার বলে—কি হলো স্যর ? ব্রোচটা…

—ওটা থাক। অন্যদিন বরং…

—বলেন ত আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দিই !

—না। প্রয়োজন নেই।

দ্রুত দোকান ছেড়ে পথে পা দেন মিঃ মল্লিক। দোকানের ম্যানেজার গু বলে—আশ্চর্য লোক ত !

কাবুলীটা আবার হো হো করে হেসে ওঠে প্রচণ্ড অট্টহাসি। গাড়িতে উঠতে উঠতে সে হাসিটা মিঃ মল্লিকের কানে যায়।

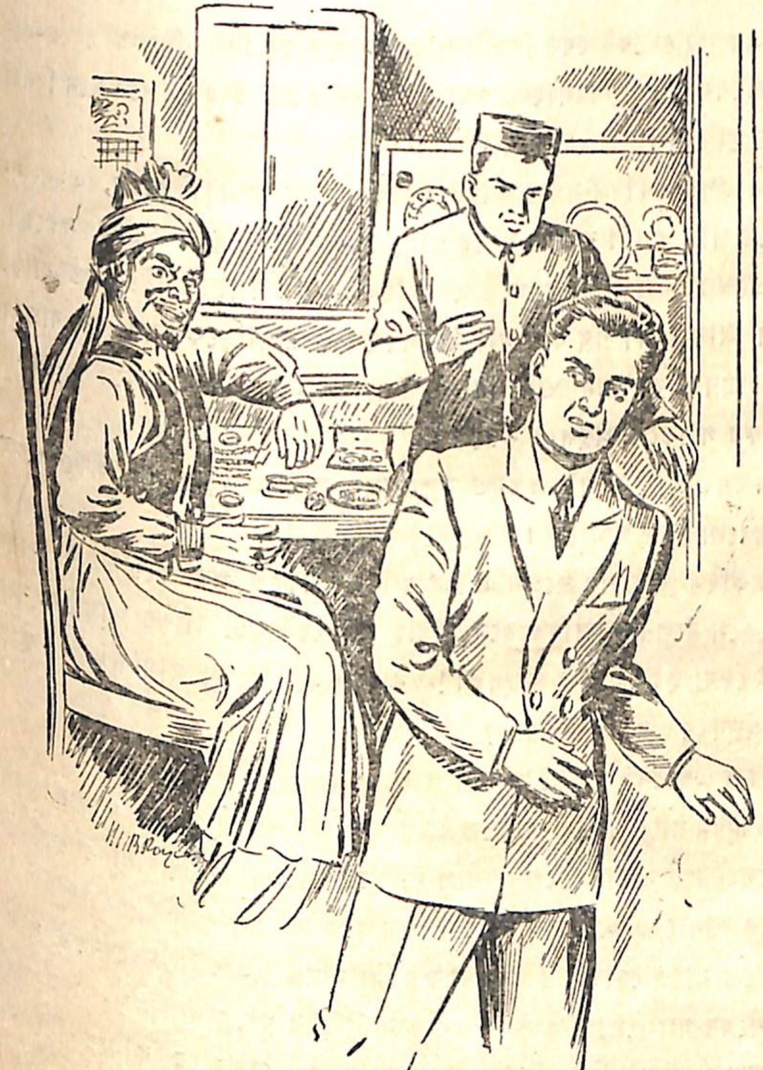

…দোকান ছেড়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। (পৃষ্ঠা ৩৬)

এর পর থেকেই যেন কিছুটা পরিবর্তন সুরু হয় মিঃ মল্লিকের দেহে-মনে। কেমন যেন একটা অবসাদের মধ্য দিয়ে দিন কাটে তাঁর। মনে মনে দিনরাত একটা দুশ্চিন্তা। একটা অস্বাচ্ছন্দ্য।

তারপর একদিন সন্ধ্যা আটটায় তিনি গাড়ি করে ফিরছেন, এমন সময় দেখতে পান একটা কালো রঙের গাড়ি যেন তাঁর গাড়িকে অনুসরণ করছে।

ব্রজেনও ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছিল। সে গাড়ির গতি দ্রুত বাড়িয়ে দেয়। আঁকাবাঁকা পথ ধরে গাড়ি চলে। পেছনের গাড়িকে আর দেখা যায় না।

তারপর ঘন ঘন ওই কালো গাড়িখানাকে দেখা যেতে থাকে মিঃ মল্লিকের গাড়িকে অনুসরণ করতে।

কখনও পার্ক স্ট্রীট, কখনও কলুটোলা, কখনও বড়বাজার অঞ্চলে দেখা যায় কালো গাড়িখানাকে।

একদিন ড্রাইভার ব্রজেন এ বিষয়ে মিঃ মল্লিককে প্রশ্ন করে। মিঃ মল্লিক মৃদু হেসে বলেন—আমিও মনে ভাবছি বটে যে একটা গাড়ির আমাদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। কিন্তু অনুসরণ! না, তা মনে হয় না আমার! তা ছাড়া ওরা অনুসরণ করবেই বা কেন?

কিন্তু এখানেই ঘটনাটার সমাপ্তি হয় না।

একদিন রাতে তিনি বাড়িতে প্রবেশ করবার আগে দেখেন একজন কাবুলী তাঁর গেটের ঠিক ডানপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে! গাড়িখানা দেখেই সে সাঁ করে আঁধারের আড়ালে আত্মগোপন করে।

মাঝে মাঝে দোতলার ঘর থেকেও মিঃ মল্লিক লোকটাকে দেখতে পান। হয়ত পথের গ্যাসপোস্টের পাশে লোকটা দাঁড়িয়ে থাকে।

দেখতে দেখতে মিঃ মল্লিক বাইরে বের হওয়া একেবারে কমিয়ে দিলেন। এমন কি সুমনা বা বিমলার সঙ্গেও তাঁর দেখাসাক্ষাৎ অনেক কমে যেতে থাকে।

অবশ্য এই ব্যাপারটার মাসখানেক আগেই বিমলার বাবা ব্রজবিলাস সেন মারা গেছেন হৃদ্‌রোগে। বিমলাই তাই এখন সমস্ত সম্পত্তির মালিক। এমন কি বিমলার সাথে তিনি সম্প্রতি আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে সুরু করেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেই এই পরিবর্তন!

বিমলাও ব্যাপারটা বোঝে না।

বোঝেন না ডাঃ মিত্র। তিনি মাঝে মাঝে মিঃ মল্লিককে প্রশ্ন করেন এ বিষয়ে। কিন্তু মিঃ মল্লিক কোনও উত্তর দেন না।

অবশ্য ব্যাপারটা পরে তিনি ব্রজেনের কাছ থেকে কিছুটা শুনেছিলেন। আর যা শুনেছিলেন সেটুকুই বলেছিলেন দীপক ও মিঃ বাসুর কাছে।

যাক্, ইতিমধ্যে পর পর দুদিন হঠাৎ মাঝরাতে মিঃ মল্লিকের বাড়িতে চোরের উপদ্রব হলো। কিন্তু আশ্চর্য, টাকাকড়ি কিছুই চুরি যায়নি। চোর হাতড়ে হাতড়ে কি একটা জিনিস যেন খুঁজছিল। কিন্তু তা না পেয়ে সে চলে গেছে।

মিঃ মল্লিক থানায় ব্যাপারটা জানালেন। কাবুলের কোন্ এক ধন-ভাণ্ডারের গুপ্ত নক্‌সা নাকি তাঁর কাছে আছে—সে জন্যেই চোরের এই ঘন ঘন উপদ্রব!

থানা থেকে পুলিশ পাহারা বসানো হলো। বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন স্থানীয় থানার দারোগা। সঙ্গে সঙ্গে চোরের উপদ্রবও বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর সুদীর্ঘ তিন মাস পরে ঘটল এই নরহত্যা!

কিন্তু কে এর জন্যে দায়ী? কাবুলের গুপ্তভাণ্ডার? না বিমলা অথবা সুমনা? না ডাঃ মিত্রের সিন্দুকে জমানো ব্যাঙ্ক থেকে তোলা টাকা?

আর হত্যার রাতে যে নারীকে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে বের হতে দেখা যায়নি সেই বা কে?

ছয়

—আর এক দৃশ্য—

ইম্পিরিয়্যাল হোটেল। সন্ধ্যা সাতটা।

দোতলার ওপরে তেরো নম্বর ঘর।

অস্থিরভাবে পায়চারী করছে একজন কাবুলী—নাম গুজরৎ খাঁ।

ইম্পিরিয়্যাল হোটেলে সব জাতির—সব ধরণের লোক থাকলেও নেহাৎ ধনী লোক ছাড়া এত টাকা খরচ করে এখানে সাধারণতঃ কেউ থাকতে পারে না। গুজরৎ খাঁকে তাই ধনীর পর্যায়েই ফেলা চলতে পারে।

গুজরৎ খাঁর সমস্ত ভঙ্গির মধ্যে যেন একটা প্রতীক্ষার ভাব ফুটে উঠেছে। সে যেন অধীর আগ্রহে কি একটা সংবাদের আশায় উন্মুখ!

কিন্তু কোনও লোককেই দেখা যায় না কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করতে।

—ওয়েটার!

একসময় গুজরৎ খাঁ সজোরে চীৎকার করে ওঠে।

—জী সাব!

হোটেলের ওয়েটার ঘরের ভেতর প্রবেশ করে সেলাম ঠোকে গুজরৎ খাঁর উদ্দেশ্যে।

—কোই আদমী আয়া হ্যায়?

—নহি!

—নন্‌সেন্স! আই অ্যাম্ টু গো অন্ উইথ্ দিস্ রাবিশ পিপ্‌ল্!

কথা শেষ হয় না।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দীর্ঘদেহী একজন মুসলমান। পরনে পাজামার ওপর একটা চাপকান।

—কেয়া খবর মীরজা?

মীরজা ওয়েটারটির দিকে চেয়ে বলে—তুম্ ভাগো আগাড়ি—

ওয়েটার সেলাম ঠুকে চলে যায়।

মীরজা বলে—উস্‌কো খবর মিল গিয়া সাব—লেকিন বাত্ ইয়ে হ্যয়, ওহি চীজ্‌কে লিয়ে—

—আউর থোড়া রূপেয়া মাংতা? মীরজার কথায় বাধা দিয়ে বলে ওঠে গুজরৎ খাঁ।—লেকিন এইসি বাত্ আগাড়ি বহুৎ শুন চুকা মীরজা। রূপেয়া দেনে হাম্ তৈয়ার, লেকিন চীজ্ চাহ্‌তা হ্যয় তিন রোজকা অন্দর—

—ম্যয় আগাড়ি বোলা সাব্, কোই নওজোয়ান আদমী আপকা জান্‌পহ্‌চান রহ্‌তা তব উস্‌কো দিজিয়ে—

—এইসি বাত্‌কো লিয়ে ম্যয় কাবুলসে বাংলা মুল্লুকমে নহি আয়া হ্যয় মীরজা! সজোরে কথাটা বলে ওঠে গুজরৎ খাঁ। তারপর ড্রয়ার খুলে বিরাট এক ছোরা বের করে সজোরে টেবিলের ওপর আঘাত হানে।

খট্ করে ছোরাটা টেবিলের ওপরে গেঁথে যায়।

গুজরৎ সজোরে বলে ওঠে—চীজ্ নহি ত তুম্‌হারা কলিজা! গুজরৎ খাঁ দুস্‌রা বাত্ বল্‌নেকো আদমী কভি নহি—

—এইসি বাতচিত্ বোলিয়ে মাত্ খাঁ সাহাব। ম্যয় দিল্লাগী নহি কর রহা হুঁ!

—ম্যয় তুমকো বাত্ শুন্‌নেকে লিয়ে এতনা রূপেয়া পানিমে নহি ডালা থা! কাম কিজিয়ে জল্‌দি, নেহি ত—

—নেহি ত?

—হামারা পাশ হ্যয় ইয়ে কৃপাণ আউর হামারা রূপেয়া। ইয়াদ রাখিয়ে, রূপেয়া আউর খান্দান কে লিয়ে ম্যয় সব্‌কুছ্‌ করনে সেক্‌তা।

…ছোরা বের করে সজোরে টেবিলের ওপর আঘাত হানে। (পৃষ্ঠা ৪১)

মীরজার মত সাহসী লোকও গুজরং খাঁর কথা শুনে দু পা পিছিয়ে

যায়। তারপর মোলায়েম স্বরে সে গুজরং খাঁকে শান্ত করে। আশ্বাস দেয় যে যতো সত্বর সম্ভব সেই মূল্যবান চীজ্‌ সে তার কাছে এনে পৌঁছে দেবে। নেহাৎ একটা খুনোখুনি ব্যাপারে পুলিশ এবং টিকটিকির দল তার পেছনে ঘুরছে বলেই সে কিছু করতে পারছে না।

কথা শেষ করে সে গুজরং খাঁর কাছ থেকে তিনখানা একশো টাকার নোট নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু গুজরং খাঁও যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই তা বোঝা যায় একটু পরেই।

মীরজা বেরিয়ে যাবার একটু পরেই গুজরং খাঁ স্বয়ং হোটেল থেকে বেরিয়ে আসে। একটা ট্যাক্সি হোটেলের ঠিক সামনেই অপেক্ষা করছিল। গুজরং খাঁ তাতে উঠে বসে ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বলে—লেক রোড—জল্‌দি!

ট্যাক্সি দ্রুত ছুটে চলে চৌরঙ্গী রোড ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে।

গুজরং খাঁ গাড়ির মধ্যে বসে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে পথের দিকে। মনে হয় তার কাছে যেন সারা পৃথিবী মুছে গেছে, শুধু জেগে আছে মহানগরী কোল্‌কাতা আর তার স্থির, দৃঢ়, অবিচলিত সংকল্প।

গাড়ির গতি আরও বেড়ে যায়।

সাত

—স্টেট্‌মেণ্ট—

মনোযোগ দিয়ে দীপক শুনছিল ডাঃ মিত্রের কথাগুলো।

ধীরে ধীরে ডাঃ মিত্র তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। তারপর বললেন—দেয়ার ইজ্‌ সাচ্‌ এ বিগ্‌ মিস্‌ট্রি বিহাইণ্ড ইট্‌। আই ডোণ্ট্‌ নো হাউ টু সল্‌ভ ইট্‌…

হো হো করে হেসে ওঠে দীপক ডাঃ মিত্রের কথা শুনে।

—হাসলেন যে? ডাঃ মিত্র প্রশ্ন করেন।

—হাসব না! আপনার কাছে যা মিস্‌ট্রি তা আমার কাছে অত্যন্ত সহজ একটি প্রব্‌লেম্‌।

—সেটা অবশ্যই অস্বীকার করতে পারি না মিঃ চ্যাটার্জী…

—আর সে প্রব্‌লেম্‌ সল্‌ভ্‌ করাও এমন কিছু দুরূহ ব্যাপার নয়, যদি আমার ইম্যাজিনারী থিয়োরীটা কারেক্ট হয়।

—আই উইশ্‌ ইউ সাক্‌সেস্‌ মিঃ চ্যাটার্জী! আশা করি আপনি এ কেসে সাফল্যলাভ করুন।

—অবশ্য সফলতা নির্ভর করছে এখন কয়েকটি পয়েন্টের উপর। কয়েকটি 'ডেটা'র ওপর। যদি সেগুলো সত্য হয়, ইট্‌ ইজ্‌ সিয়োর টু বী সল্‌ভ্‌ড্‌…

কথার শেষে দীপক নমস্কার জানিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

ডাঃ মিত্রের বাড়ি থেকে সোজা থানার দিকে গাড়ি চালায় দীপক। সঙ্গে তার ইন্‌স্পেক্টর বাসু।

—এখন থানাতেই যাচ্ছি মিঃ বাসু। আপনার সংগ্রহ-করা সেই স্টেট্‌মেণ্টগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

—হ্যাঁ, সেগুলো সব কালেক্ট করা আছে।

—দেখা যাক কোনও নতুন পয়েন্ট সেগুলো থেকে আবিষ্কৃত হয় কিনা।

একটু পরেই থানায় এসে দীপকের গাড়ি থামে। গাড়ি থেকে নেমে দীপক সোজা মিঃ বাসুর সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

মিঃ বাসু তাঁর ডায়েরীটা খুলে দীপকের হাতে তুলে দিতে দিতে বলেন—নাউ ইউ সী অল্‌ দি কালেক্‌শন্‌ অব্‌ স্টেট্‌মেণ্ট্‌স্‌!

—ধন্যবাদ মিঃ বাসু!

দীপক মনোযোগ দিয়ে একে একে স্টেট্‌মেণ্টগুলো দেখতে থাকে।

হরিভকত সিংঃ আমি পুরো দেড় বছর হুজুরের কাছে চাকরী করছি। মনিব হিসেবে যে ওঁর মত লোক যে-কোনও লোকের কাম্য সে কথা স্বীকার করি। না, হুজুর, আমি কখনও এমন কিছু শুনিনি যে ওঁর কোনও শত্রু আছে। তবে হ্যাঁ, দু একদিন একজন কাবুলী আর একজন মুসলমানকে এ বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি।

আমি হুজুরকে বলেছিলাম সে কথা। কিন্তু তিনি তেমন ভয় পাননি বা কোন ব্যবস্থাও অবলম্বন করেননি। তবে পর পর দু দিন যখন বাড়িতে চুরি হলো, তখন অবশ্য উনি সচেতন হয়েছিলেন। তাই উনি ফোন করেছিলেন পুলিশে। পুলিশ থেকে পাহারারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ঘটনার দিন আমার শরীর অসুস্থ থাকায় একসময় ঘরে ঘুমোচ্ছিলাম। হ্যাঁ,

সাত

—স্টেট্‌মেন্ট—

মনোযোগ দিয়ে দীপক শুনছিল ডাঃ মিত্রের কথাগুলো।

ধীরে ধীরে ডাঃ মিত্র তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। তারপর বললেন—দেয়ার ইজ্‌ সাচ্‌ এ বিগ্‌ মিস্‌ট্রি বিহাইণ্ড ইট্‌। আই ডোন্ট্‌ নো হাউ টু সল্‌ভ ইট্‌...

হো হো করে হেসে ওঠে দীপক ডাঃ মিত্রের কথা শুনে।

—হাসলেন যে? ডাঃ মিত্র প্রশ্ন করেন।

—হাসব না! আপনার কাছে যা মিস্‌ট্রি তা আমার কাছে অত্যন্ত সহজ একটি প্রব্‌লেম্‌।

—সেটা অবশ্যই অস্বীকার করতে পারি না মিঃ চ্যাটার্জী...

—আর সে প্রব্‌লেম্‌ সল্‌ভ্‌ করাও এমন কিছু দুরূহ ব্যাপার নয়, যদি আমার ইম্যাজিনারী থিয়োরীটা কারেক্ট হয়।

—আই উইশ্‌ ইউ সাক্‌সেস্‌ মিঃ চ্যাটার্জী! আশা করি আপনি এ কেসে সাফল্যলাভ করুন।

—অবশ্য সফলতা নির্ভর করছে এখন কয়েকটি পয়েন্টের উপর। কয়েকটি 'ডেটা'র ওপর। যদি সেগুলো সত্য হয়, ইট্‌ ইজ্‌ সিয়োর টু বী সল্‌ভ্‌ড্‌...

কথার শেষে দীপক নমস্কার জানিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

ডাঃ মিত্রের বাড়ি থেকে সোজা থানার দিকে গাড়ি চালায় দীপক। সঙ্গে তার ইন্‌স্পেক্টর বাসু।

—এখন থানাতেই যাচ্ছি মিঃ বাসু। আপনার সংগ্রহ-করা সেই স্টেট্‌মেন্টগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

—হ্যাঁ, সেগুলো সব কালেক্ট করা আছে।

—দেখা যাক কোনও নতুন পয়েন্ট সেগুলো থেকে আবিষ্কৃত হয় কিনা।

একটু পরেই থানায় এসে দীপকের গাড়ি থামে। গাড়ি থেকে নেমে দীপক সোজা মিঃ বাসুর সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

মিঃ বাসু তাঁর ডায়েরীটা খুলে দীপকের হাতে তুলে দিতে দিতে বলেন—নাউ ইউ সী অল্‌ দি কালেক্‌শন্‌ অব্‌ স্টেট্‌মেন্ট্‌স্‌!

—ধন্যবাদ মিঃ বাসু!

দীপক মনোযোগ দিয়ে একে একে স্টেট্‌মেন্টগুলো দেখতে থাকে।

হরিভকত সিং: আমি পুরো দেড় বছর হুজুরের কাছে চাকরী করছি। মনিব হিসেবে যে ওঁর মত লোক যে-কোনও লোকের কাম্য সে কথা স্বীকার করি। না, হুজুর, আমি কখনও এমন কিছু শুনিনি যে ওঁর কোনও শত্রু আছে। তবে হ্যাঁ, দু একদিন একজন কাবুলী আর একজন মুসলমানকে এ বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি।

আমি হুজুরকে বলেছিলাম সে কথা। কিন্তু তিনি তেমন ভয় পাননি বা কোন ব্যবস্থাও অবলম্বন করেননি। তবে পর পর দু দিন যখন বাড়িতে চুরি হলো, তখন অবশ্য উনি সচেতন হয়েছিলেন। তাই উনি ফোন করেছিলেন পুলিশে। পুলিশ থেকে পাহারারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ঘটনার দিন আমার শরীর অসুস্থ থাকায় একসময় ঘরে ঘুমোচ্ছিলাম। হ্যাঁ,

হুজুরের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছিলাম আমি। পরের দিন সকালে শুনলাম ওঁর মৃত্যুর খবর। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে গেল।

না, সেদিন রাত্রে কোনও শব্দই শুনিনি, কারণ আমি গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম। সারা রাতের মধ্যে আর ঘুম ভাঙেনি।

রামবিলাস: আমিও পুরো দেড় বছর হুজুরের কাছে চাকরী করছি। হুজুরের কোনও শত্রু আছে বলে আমি জানতাম না। হ্যাঁ, হুজুরের কাছে প্রায়ই একজন দিদিমণিকে আসতে দেখতাম। বিমলা দেবী ওঁর নাম বলে শুনেছি। না, সুমনা ব্যানার্জী নামে কোনও মেয়েকে আমি তাঁর কাছে আসতে দেখিনি। না, হুজুরের সিন্দুকের চাবির কোনও খবর আমরা কেউ রাখি না। তিনি ওটা নিজের কাছেই রাখতেন।

হ্যাঁ, খুনের দিন রাত্রে দিদিমণি এসেছিলেন হুজুরের কাছে। রাত তখন কটা তা ঠিক বলতে পারবো না স্যর। বোধ হয় দশটার মতো হবে। না, তাঁকে আমরা কেউই যেতে দেখিনি। হয়ত বৃষ্টি থামার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চলে গিয়েছিলেন।

না, আমরা কেউ হলফ করে বলতে পারি না যে তিনি বিমলা দিদিমণি। অতটা মনোযোগ দিয়ে তাঁকে দেখিনি। না, তাঁর বাড়ির ঠিকানা আমি জানি না। ব্রজেনবাবু বোধ হয় জানেন। তিনি হুজুরকে নিয়ে দু একদিন ওঁদের বাড়িতে গেছেন বলে শুনেছি।

না, হুজুরকে আমি মৃত অবস্থায় প্রথমে দেখিনি—দেখেছিল শত্রুঘ্নদা। সেই এসে আমাকে বলে। আমি তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছিলাম মাত্র। আমিই তখন ডাক্তার মিত্রকে ফোন করে সব কথা বলি। তিনিই বলেন পুলিশে জানাতে।

শত্রুঘ্ন: আমি হুজুরের কাছে কাজ করছি দেড় বছরের মতো। আমি

আর রামবিলাস একসঙ্গেই এসেছি হুজুরের কাছে চাকরী নিয়ে। হ্যাঁ হুজুর, বিমলা দিদিমণিকে দু এক দিন এখানে দেখেছি। না, মনিব বলে মিথ্যা কথা বলব না। ওঁর সঙ্গে পরিচয় থাকলেও তেমন কিছু আমাদের চোখে পড়েনি যা থেকে বলা যায় ওঁদের ঘনিষ্ঠতা কোনও অসৎ পথে চলেছিল। সেদিক থেকে হুজুর খুব কড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন।

না, বাজারে আজকাল লোকে ওঁকে কঞ্জুস বললেও কখনও আমাদের মাইনে নিয়ে ভুগতে হয়নি। যথাসময়েই আমরা মাইনে পেতাম।

হ্যাঁ, আমিই প্রথম হুজুরের মৃতদেহ দেখতে পাই। সকালবেলা আমি তাঁর ঘরে গিয়েছিলাম চায়ের কাপ নিয়ে। উনি কিছু খাবার আগে ভোরেই এক কাপ 'বেড্ টী' খেতেন। আমিই সেটা দিয়ে আসতাম।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলাম হুজুর মেঝের ওপর পড়ে আছেন। মুখের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। দু একবার নাম ধরে ডেকেও সাড়া পেলাম না। ঘরের দরজা খোলা। জানালা দুটোই বন্ধ।

আমি নিচে এসে সকলকে কথাটা তক্ষুণি বললাম। হ্যাঁ, সে একটা মজার জিনিস স্যর। বাড়ির পেছনে যে একটা সরু দরজা ছিল তা তালা দেওয়াই থাকত। সেই দরজা দিয়ে একটা সরু ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠা যেত। সেদিন খেয়াল করে সেই দরজাটা দেখেছিলাম—কারণ অন্য দিন সেদিকে মনোযোগ না দিলেও সেদিন এই ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় আমাদের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

হ্যাঁ, দেখেছিলাম দরজা খোলা, কয়েক জোড়া পায়ের ছাপও দেখেছিলাম নরম মাটিতে।

চলুন, আপনাকে দেখাচ্ছি সে দৃশ্য। বোধ হয় সেই ছাপ কোনও লেডিজ

'সু'র। না, হুজুরের ঘরে যে জুতোর ছাপ তার সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। হুজুরের ঘরের ছাপ পুরুষের জুতোর—মানে জেন্টস্ 'সু'র।

এই পর্যন্ত পড়ে দীপক হঠাৎ ইন্স্পেক্টর বাসুর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—আপনি কি সেই পায়ের ছাপ দেখেছিলেন মিঃ বাসু?

—হ্যাঁ, মিঃ চ্যাটার্জী। লোকটা মিথ্যা কথা যে বলেনি তা বুঝেছিলাম। কিন্তু এতে সব ব্যাপারটা আরও গোলমাল মনে হচ্ছে।

দীপক হেসে বলে—জটিল ব্যাপারকে সরল করতে যাওয়াই বোকামি মিঃ বাসু। জটিল হিসেবে ভেবে নিয়েই এটার সমাধান করতে হবে। যাক আমি এ বিষয়ে পরে চিন্তা করব। এখন দেখি এদিকের অন্য স্টেটমেন্টগুলো।

দীপক ডায়েরীতে মনঃসংযোগ করে।

ব্রজেন শিকদার: আমি হুজুরের কাছে কাজ করছি বছর খানেকের কিছু বেশী —ওঁর নতুন গাড়ী কেনা হবার পর থেকে। বহুদিন আগে আমি কিছুদিন ডাঃ মিত্রের গাড়ি চালিয়েছিলাম। সেই সময় থেকেই ওঁর সঙ্গে পরিচয়। উনিই আমার এখানকার কাজ ঠিক করে দেন।

দিনের বেলায় আমি সাধারণতঃ গাড়ি চালাতাম। রাতের বেলা, মানে আটটা নটার পর গাড়ি গ্যারেজে তুলে দিয়ে চলে যেতাম আমি। অবশ্য যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকত তবে রাতের বেলাতেও বেরোতে হতো আমায়।

হ্যাঁ স্যর, আমি একটা কালো গাড়িকে মাঝে মাঝে আমাদের গাড়িকে অনুসরণ করতে দেখতাম। পরশু দিনও সে গাড়িখানাকে আমি চৌরঙ্গী দিয়ে পাস করতে দেখেছি। না, তার নম্বরটা আমি খেয়াল করে দেখিনি, তবে গাড়িটা দেখলেই চিনতে পারব।

হ্যাঁ, মিঃ মল্লিককে আমি বলেছিলাম সে কথা। উনি অবশ্য আমার কথা শুনে বলেন—কেউ অনুসরণ করেনি, হয়ত ঘন ঘন একই গাড়িকে দেখতে পাচ্ছি আমরা।

হ্যাঁ, রামবিলাসের কাছে একদিন শুনেছিলাম একজন কাবুলীকে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরতে দেখা গেছে।

এর পর দুবার বাড়িতে চুরি হয়—তারপর থেকে আর সে কালো গাড়িকে অনেকদিন দেখা যায়নি। বোধ হয় পুলিশ পাহারা নিযুক্ত দেখে ওরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

এ বিষয়ে আমার ধারণা কি? আমার ধারণা নিশ্চয়ই মিঃ মল্লিকের কোনও গোপন শত্রু ছিল—কিন্তু তিনি তা আমাদের কারও কাছে ভেঙে বলতেন না।

হ্যাঁ, বিমলা দেবীর বাড়ি আমি চিনি। উনি থাকেন শোভাবাজার অঞ্চলে। একটা তিনতলা বাড়ি ওঁর—পৈত্রিক। একতলা, দোতলা ভাড়া দেওয়া। তিনতলায় উনি থাকেন।

হ্যাঁ, মিঃ মল্লিক মাঝে মাঝেই ওঁর সঙ্গে দেখা করতেন। অবশ্য ব্যবসা-সংক্রান্ত সম্বন্ধ ওঁর সঙ্গে ছিল। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে দুজনে একসঙ্গে বেড়াতেও বের হতেন।

সুমনা দেবীর সঙ্গে সোসাইটিতেই মিলিত হতেন। হোটেল, রেস্টুরেন্ট বা ওঁর বাড়িতে। উনি বিশেষ এ বাড়িতে আসেননি। ওঁর বাড়ির ঠিকানাও জানি। পাঁচ নম্বর, রিজেন্ট পার্ক, টালিগঞ্জ।

এইখানেই মিঃ বাসুর ডায়েরী শেষ করা হয়েছে।

আট

—বিমলা সেন ঃ সুমনা ব্যানার্জী—

দীপক চ্যাটার্জী আর ইন্‌স্পেক্টর বাসুকে দেখা গেল বিমলা সেনের বাড়িতে সেদিন সকালে গিয়ে হানা দিতে। এটা একটা মস্ত বড় সোর্দ—হয়ত এ হত্যারহস্যের সঙ্গে বিমলা সেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তা ছাড়া সেদিন রাতে মিঃ মল্লিকের বাড়িতে একটি নারীমূর্তির প্রবেশ—সব কিছু মিলিয়ে সন্দেহজনক বৈকি!

কড়া নড়ে উঠল।

ভেতর থেকে নারীকণ্ঠে উত্তর ভেসে এলো—কে?

—দরজা খুলুন, আমরা বিশেষ কারণে দেখা করতে এসেছি মিস্ সেনের সঙ্গে।

কথা শেষ হবার আগেই দরজা খুলে যায়। দরজায় দাঁড়িয়ে সুন্দরী একটি যুবতী। বয়স কুড়ি অতিক্রম করে গেছে—তবে ঠিক যে কত তা চেহারা দেখে বোঝা যায় না।

—কাকে চান আপনা রা

—আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। দীপক বলে—আপনিই ত মিস্ সেন?

—ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু কি কারণে হঠাৎ আমার সঙ্গে···

—আমি হচ্ছি ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী, আর ইনি আমার বন্ধু

ইন্‌স্পেক্টর বাসু। আমরা একটা হত্যারহস্যের তদন্ত ব্যাপারে কিছু সাহায্য পাব এই আশা নিয়েই এসেছি আপনার কাছে!

(পৃষ্ঠা ৫০)

দরজায় দাঁড়িয়ে সুন্দরী একটি যুবতী।

দেহের অপূর্ব ভঙ্গী করে মিস্ সেন বলে ওঠেন—হাউ ফানি! আ
হত্যারহস্তের সঙ্গে জড়িত? কি বলতে চান আপনারা?

দীপক বুঝতে পারে, এ জায়গা খুব সহজ নয়! সে তাই কথাটা ঘু
নিয়ে বলে—আপনি জড়িত এ কথা কে বলল? আপনি হয়ত আমা
অনেক কিছু সাহায্য করতে পারেন এই আশায়…

—আমি করব হত্যারহস্তে সাহায্য? হাউ ডেয়ার ইউ টু থিঙ্ক সো
আমাকে আপনারা কি মনে করেন?

দীপক এবার একটু গম্ভীরকণ্ঠে বলে—মনে কিছুই হয়ত করবার অব
পেতাম না, কিন্তু আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একজন লোক নিহত হয়েছেন বলেই

—কে সে লোক? হু ইজ্ ছাট্ ম্যান্? ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেন মি
সেন।

—আপনি নিশ্চয়ই বিনয় মল্লিককে চিনতেন!

—ও, আমার বাবার পার্টনার…

—এবং সম্প্রতি আপনার। দীপক বলে—আপনি তাঁর সঙ্গে ঘ
ছিলেন এ সংবাদও…

—একটু ধীরে কথা বলুন মিঃ চ্যাটার্জী। ঘনিষ্ঠ বলতে আপনি কি ম
করেন?

দীপক এবার আন্দাজে একটা মস্তো বড় ঢিল ছুঁড়ে বসে। সে বলে—বি
যেদিন নিহত হন সেদিন রাতেও আপনাকে সেখানে দেখা গেছে মিস্ সেন

মুহূর্তে মিস্ সেনের মুখ যেন ফ্যাকাশে আকার ধারণ করে। কিন্তু
সাময়িক। একটু পরেই তিনি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন—
সে মাত্র এক মিনিটের জন্যে। একটা জরুরী বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচ
জন্যে আমি গিয়েছিলাম সেখানে।

—আপনি কি কারণে গিয়েছিলেন কিংবা তাঁর সম্বন্ধে কি জানেন শুধু এইগুলি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আমরা। এইজন্যেই আমাদের এখানে আসতে হয়েছে। দীপক শান্তকণ্ঠে বলে।

মিস্ সেনের সমস্ত আগুন যেন এক মুহূর্তে জল হয়ে গিয়েছিল। তিনি এবার বলেন—ভেতরে আসুন মিঃ চ্যাটার্জী। আমি সমস্ত কথাই বলতে চাই আপনাদের কাছে। খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে তা অবশ্য জানেন। আর জানেন যে আত্মহত্যায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু…

—তা ছাড়াও আমরা অনেক কিছু জানি মিস্ সেন। দীপক বলে—এটা যে আত্মহত্যা নয়, খুন এবং খুনের দিন রাত্রে ক'জন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন সবই আমাদের জানা হয়ে গেছে। এখন বাকী শুধু শেষ 'ডিডাক্‌শন', কে খুনী?

—আপনারা এতদূর এগিয়েছেন? ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে চেয়ারে বসতে বসতে বিমলা বলেন—আপনার ক্ষমতার সত্যি প্রশংসা করি মিঃ চ্যাটার্জী!

দীপক কোনও উত্তর দেয় না।

বিমলা বলেন—এক কাপ করে চা-তে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই আপনাদের?

—আপত্তি নেই, বরং কথাবার্তা বলতে সুবিধেই হবে। দীপক বলে।

চায়ের ব্যবস্থা করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান বিমলা। একটু পরে ফিরে আসেন হাতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বিমলা বলতে সুরু করেন—সেদিন আমি যে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম এ খবরটা আপনারা নির্ভুলভাবেই পেয়েছেন মিঃ চ্যাটার্জী। তবে আমি তাঁর ওখানে দীর্ঘক্ষণ ছিলাম না। বিশেষ কারণে বাধ্য হয়ে আমাকে পেছনের দরজা দিয়ে চলে যেতে হয়েছিল।

—কি সে কারণ ?

—সেটা আমি আপাততঃ বলতে পারছি না। তবে আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন, তবে জানাচ্ছি, আমি জানি কেন মিঃ মল্লিক নিহত হয়েছেন!

—কেন ?

—একখানি মানচিত্র।

—মানচিত্র!

—হ্যাঁ, আফগানিস্তানের একটি গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খবর উনি জানতেন। তার নকশা ওঁর কাছে ছিল। সেটার জন্যে একদল লোক ওঁর পেছনে ঠিক ছায়ার মতো অনুসরণ করে ফিরছিল। দুবার ওঁর বাড়িতে চুরিও হয়ে গেছে ঠিক ঐ একই কারণে।

—একটা প্রশ্ন আপনাকে করি মিস্ সেন…

—বলুন।

—সেদিন আপনি পেছনের দরজা দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন তা আমরা জানি। জানি মানে আপনার পায়ের ছাপও পেয়েছি। কিন্তু, কেন? কি সে জিনিস যা নিয়ে আপনি গোপনে…

—প্রাণের ভয়ে তিনি সেই গুপ্ত নকশাটি আমাকে দিতে বাধ্য হন।

আনন্দে দীপক লাফিয়ে ওঠে। বলে—নাউ আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মিস্ সেন! সমস্ত রহস্য আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ইন্‌স্পেক্টর বাসু প্রশ্ন করেন—এখন আপনি কি করতে চান মিঃ চ্যাটার্জী?

—আমি চাই সেই নকশাখানি।

—কিন্তু সেটা ত আমি রাখিনি। সেটাকে দুটুকরো করে আধখানা আমার কাছে রেখেছি। বাকি অর্ধাংশ…

—বাকি অর্ধাংশ ?

কথা শেষ হয় না।

—ভেতরে আসতে পারি? প্রশ্ন করতে করতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে আর একটি নারীমূর্তি।

—পরিচয় করিয়ে দিই মিঃ চ্যাটার্জী, বিমলা বলেন—এ হচ্ছে আমার বান্ধবী সুমনা ব্যানার্জী।

—ও, সুমনা দেবী! দীপক বলে—ইউ ওয়্যার অল্‌সো অ্যাকোয়েন্টেড উইথ মিঃ মল্লিক ?

—হ্যাঁ। সুমনা দেবী ঘাড় নাড়েন।

—ওর কাছে আছে সেই নকশার বাকি অর্ধাংশ। বিমলা বলেন।

—এবং কালই সেই বাকি অর্ধাংশ আমার ব্যাগ থেকে হঠাৎ চুরি হয়ে গেছে! বলেন সুমনা দেবী।

স্ট্রেঞ্জ! স্ট্রেঞ্জ! একসঙ্গে বলে ওঠেন ইন্‌স্পেক্টর বাসু আর দীপক।—বাকি অর্ধেকের ওপরেই তা হলে ওদের সমস্ত অ্যাটেন্‌শন আছে!

দীপক যেন লাফিয়ে ওঠে—বিমলা দেবী, ইফ্ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড—আপনার অংশটা…

বিমলা উঠে গিয়ে একটা বইয়ের মধ্য থেকে সেটি বের করে এনে দীপকের হাতে তুলে দেন।

—চলি বিমলা দেবী। দীপক বলে—চলি মিস্ ব্যানার্জী! এ স্ট্রেঞ্জ বিগ মিস্ট্রি ইজ্ গোয়িং টু বী সল্‌ভ্‌ড্ সুন্!

দীপক ইন্‌স্পেক্টর বাসুর হাত ধরে ঝড়ের মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

নয়

—আফগান-রহস্য—

দীপকের নির্দেশে ইন্‌স্পেক্টর বাসু আফগানিস্তানের ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কাছে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন মিঃ মল্লিকের সেখানকার ইতিহাস সম্পূর্ণ জানবার জন্যে।

সেদিন সকালে সেই মেসেজের উত্তর এসেছিল। মিঃ বাসু সেই মেসেজটা নিয়ে এসেছিলেন দীপকের কাছে।

দীপক সেটা আগাগোড়া পড়তে সুরু করল।

শ্রীবিনয়ভূষণ মল্লিক : আফগানিস্তানে অবস্থানকাল বারো বছরের কিছু বেশী। আফগান গভর্নমেন্টের অধীনে একটা চাকরা নিয়ে ছ বছর ওখানে অবস্থান করেন। সেখানে একজন আফগান সর্দারের মেয়ে জোহ্‌রাবান্থর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

পরিচয় ক্রমে ক্রমে সৌহার্দ্যে পরিণত হয়। জোহ্‌রাবান্থ বিনয় মল্লিককে ভালবাসত। বিনয় মল্লিকও ভালবাসতেন জোহ্‌রাবান্থকে।

জোহ্‌রাবান্থর বাবা আফগান সর্দার কিন্তু তাঁর মেয়ের একজন পরদেশীর সঙ্গে ভালবাসাকে সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু তিনি ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার আগেই ভালবাসা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে আফগান গভর্নমেন্টের কাছ থেকে বিনয় মল্লিকের চাকরী গেল। বিনয়বাবুকে একদিন বড়ো চাকরী হারিয়ে সাধারণ নাগরিকে পরিণত হ'তে হলো। অনেকে বলে এ বিষয়ে আফগান সর্দারের হাত ছিল।

কিন্তু জোহ্‌রাবান্থর সঙ্গে বিনয় মল্লিকের ভালবাসা এতে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় না। জোহ্‌রাবান্থর ভাই গুজরৎ খাঁর সাহায্যে বিনয়বাবু একটি ব্যাঙ্কে ভাল চাকরী পান। তাঁর আফগানিস্তানে অবস্থানের বাকি ছ বছর তিনি এই চাকরীতেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

জোহ্‌রাবান্থর সঙ্গে বিনয় মল্লিকের ভালবাসা যখন চরমে ওঠে তখন হঠাৎ তা আফগান সর্দারের নজরে পড়ে যায়। তিনি ছোরা দিয়ে বিনয়বাবুকে খুন করতে উদ্যত হন। বিনয়বাবুও তার উত্তরে তাঁর ছোরা নিয়ে আফগান সর্দারকে আক্রমণ করেন। ওঁরা তিনজন ছাড়া সেখানে আর কেউই ছিল না।

দুজনে দীর্ঘক্ষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে। অবশেষে বিনয়বাবুই জয়লাভ করেন। নিহত হন আফগান সর্দার।

বিনয় মল্লিক তখন জোহ্‌রাবান্থকে নিয়ে আফগানিস্তান ছেড়ে পলায়ন করেন। তিনি জানতেন, সর্দারের দলবল এ খবর জানলে তাঁকে আর আস্ত রাখবে না।

জোহ্‌রাবান্থ পলায়নের সময় তাদের পূর্বপুরুষসঞ্চিত গুপ্তধনভাণ্ডার থেকে প্রচুর ধনরত্ন এবং একটি বিরাট গুপ্তধনের নকশা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। এই নকশা আফগান সর্দারের পারিবারিক সম্পত্তি। তারা জীবনের চেয়েও এই নকশাকে বেশী শ্রদ্ধা করত—বেশী ভালবাসত।

আফগান সর্দার আর তাঁর ছেলের ধারণা ছিল যে যদি এই নকশা তাঁদের হস্তচ্যুত হয় কোনওদিন তা হলে তাঁদের বংশ হবে হতশ্রী। এমন কি চির-দিনের জন্যে তাঁরা নির্বংশও হতে পারেন। অনেকে বলে জোহ্‌রাবান্থ পিতৃবংশের অমর্যাদা করবার জন্যেই নকশাটা সঙ্গে এনেছিল।

কিন্তু আসলে নকশার সঙ্গে জড়িত প্রবাদটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সর্দারের পূর্বপুরুষেরা তাঁদের যাবতীয় গুপ্তধন গোপনে যে জায়গায় রাখতেন তা সাধারণ

মানুষের কাছে প্রকাশ করতেন না। যাতে এই গুপ্তধন অন্য কোনও লোকের হাতে না যায় তাই এই প্রবাদটার সৃষ্টি করেছিলেন তিনি।

সে যাই হোক, ওদের কাছে এই নকশার দাম যে কত ছিল তা এ থেকেই বোঝা যায়।

জোহ্‌রাবানুকে নিয়ে বিনয় মল্লিক যখন পলায়ন করেন, তখন তাঁদের পেছনে পেছনে অনুসরণ করতে থাকে আফগান সর্দারের দলবল সশস্ত্র অবস্থায়। তাদের মধ্যে প্রধান হয় আফগান সর্দারের ছেলে গুজরং খাঁ, সে উন্মত্তভাবে ওদের পেছনে অনুসরণ করতে থাকে। তাদের ধারণা ছিল যে ধনরত্ন এবং গুপ্তধনের মানচিত্র উদ্ধার করবে ওদের কবল থেকে।

কিন্তু তারা এই কাজে সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ধনরত্ন বা নকশা কিছুই তারা বিনয় মল্লিকের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারেনি।

সীমান্ত অতিক্রম করার সময় একদিন গুজরং খাঁ রাতে অতর্কিতে তাদের আক্রমণ করে। বিনয়কে লক্ষ্য করে সে গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে গুলি বিনয়কে না লেগে জোহ্‌রাবানুর বুকে বিদ্ধ হয়। আফগানিস্তানের সীমান্তে এসে এই আফগান নারী তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। জোহ্‌রাবানুর বুকের রক্তে আফগানিস্তানের উষর প্রান্তর রাঙা হয়ে ওঠে।

বিনয় মল্লিক কিন্তু অনেক কষ্টে তাদের হাত থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হন। তারপর তিনি সোজা চলে যান বাংলায়—কোল্‌কাতা শহরে।

গুজরং খাঁরও আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে অনেকের ধারণা গুজরং খাঁ কোল্‌কাতায় গেছে তার পূর্বপুরুষের মানচিত্র স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে।

রিপোর্টটা আগাগোড়া পড়ে শেষ করে দীপক। তারপর আপন মনেই বলে—নাউ এভ্‌রিথিং ইজ্‌ ক্লীয়ার টু মী!

—এভ্‌রিথিং?

—হ্যাঁ, সব কিছু। আমি জানি মানচিত্রের আধখানাই গুজরং খাঁ চুরি করেছে সুমনা ব্যানার্জীর হাতব্যাগ থেকে। চুরি করেছে নয়—করিয়েছে নিশ্চয়ই। তার নিযুক্ত লোক এসব কাজ করেছে।

একটু থেমে দীপক বলে—এখন বাকি অর্ধেক চুরি করার জন্যে সে নিশ্চয়ই শেষ চেষ্টা করবে। আমাদের ফাঁদ পেতে তাকে ধরতে হবে।

মিঃ বাসু বলেন—কিন্তু এ ফাঁদ যদি কার্যকরী না হয়?

—তা হলে আমরা হেরে যাব—জয় হবে তার!

—আর বিনয়বাবুর হত্যাকারী?

—সেটা এখনও বলতে পারি না—হয়ত গুজরং খাঁ শুধুমাত্র মানচিত্রের জন্যে ঘুরছিল। সেই সুযোগ নিয়ে আসল হত্যাকারী···

—কিন্তু কে সে?

—ধীরে, মিঃ বাসু, ধীরে। স্লো বাট স্টেডি উইন্‌স্‌ দি রেস বলে একটা কথা আছে জানেন ত!

মিঃ বাসু কোনও উত্তর দেন না।

দশ

—ঘুঘু ও ফাঁদ—

রাত গভীর।

ঘুমিয়ে পড়েছে আকাশ—ঘুমিয়ে পড়েছে পৃথিবী।

সন্ধ্যার পরেই এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। ভেজা বাতাসের বোবা কান্নায় যেন কোন্ এক অজানা রহস্যের অশুভ ইঙ্গিত!

এমনি দিনে রাত দুটোর সময়েও দীপক চ্যাটার্জীর চোখে ঘুম নেই। ঘুম নেই ইন্‌স্পেক্টর বাসুর চোখে।

কিন্তু কোথায় তারা? কোন্ নতুন ছদ্মবেশে তারা অনুসন্ধানের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে তা কে জানে!

ঢং ঢং!

রাত ঠিক দুটো।

ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর বাড়ির পেছন দিকের জলের পাইপ বেয়ে সন্তর্পণে উঠে চলেছিল একজন লোক। আর একজন লোক দাঁড়িয়েছিল নিচে। সে ব্যগ্রভাবে লক্ষ্য করছিল উপরের লোকটির গতিবিধি।

ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যেত, এরা দুজনই হচ্ছে গুজরং খাঁ আর তার সহকারী মীরজা।

মীরজা পাইপ বেয়ে দোতলায় উঠল। একটু পরে গুজরং খাঁও তার অনুসরণ করল নিঃশব্দে।

দোতলায় দীপকের শয়নকক্ষ।

দুজনে ঠিক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল।

এক মিনিট—দু মিনিট—তিন মিনিট।

দরজা খুলে গেল। ধীরে ধীরে দুজনে ঘরে প্রবেশ করল। শয্যায় শুয়ে রয়েছে ও কে? দুজনে ধীরপদে এগিয়ে গেল সেদিকে।

ধীরে ধারে মীরজা একটা ক্লোরোফর্ম-ভেজানো রুমাল নাড়তে সুরু করল লোকটার সামনে।

কিন্তু একি!

একটা শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরখানা আলোর বন্যায় ভরে উঠল। আর যে লোকদুটি রিভলভার হাতে তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে তারাই হচ্ছে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী আর ইন্‌স্পেক্টর বাসু স্বয়ং।

লোক দুটি বিস্ময়বিমূঢ়।

মিঃ বাসু হতচকিত লোকদুটির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেন।

গুজরং খাঁ ধীরে ধীরে সমস্ত কথাই স্বীকার করে।

ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে সে যা বলে তার অর্থ হচ্ছেঃ কাবুল থেকে সে বিনয় মল্লিককে অনুসরণ করেই এসেছিল সুদূর বাংলা মুল্লুকে। তাদের পরিবারের পবিত্র গুপ্তধনের মানচিত্র নিয়ে পালিয়ে এসেছিল বিনয় মল্লিক। সে তাই কোল্‌কাতায় এসে তার খোঁজ করতে থাকে।

ইতিমধ্যে সে একদিন কয়েকখানা জুয়েলারী বিক্রি করতে একটা দোকানে যায়। সেখানেই বিনয়কে দেখতে পায় সে। তারপর থেকে সে তাকে অনুসরণ করতে থাকে। দু দিন তার বাড়িতেও হানা দিয়েছিল—কিন্তু তবু সেই নকশা পায়নি।

খুনের দিনও সে এসেছিল তার বাড়িতে গোপনে। সে দেখতে পায়

দশ

—ঘুঘু ও ফাঁদ—

রাত গভীর।

ঘুমিয়ে পড়েছে আকাশ—ঘুমিয়ে পড়েছে পৃথিবী।

সন্ধ্যার পরেই এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। ভেজা বাতাসের বোবা কান্নায় যেন কোন্ এক অজানা রহস্যের অশুভ ইঙ্গিত!

এমনি দিনে রাত ছটোর সময়েও দীপক চ্যাটার্জীর চোখে ঘুম নেই। ঘুম নেই ইন্‌স্পেক্টর বাসুর চোখে।

কিন্তু কোথায় তারা? কোন্ নতুন ছদ্মবেশে তারা অনুসন্ধানের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে তা কে জানে!

ঢং ঢং!

রাত ঠিক ছটো।

ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর বাড়ির পেছন দিকের জলের পাইপ বেয়ে সন্তর্পণে উঠে চলেছিল একজন লোক। আর একজন লোক দাঁড়িয়েছিল নিচে। সে ব্যগ্রভাবে লক্ষ্য করছিল উপরের লোকটির গতিবিধি।

ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যেত, এরা ছজনই হচ্ছে গুজরং খাঁ আর তার সহকারী মীরজা।

মীরজা পাইপ বেয়ে দোতলায় উঠল। একটু পরে গুজরং খাঁও তার অনুসরণ করল নিঃশব্দে।

দোতলায় দীপকের শয়নকক্ষ।

ছজনে ঠিক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল।

এক মিনিট—ছ মিনিট—তিন মিনিট।

দরজা খুলে গেল। ধীরে ধীরে ছজনে ঘরে প্রবেশ করল। শয্যায় শুয়ে রয়েছে ও কে? ছজনে ধীরপদে এগিয়ে গেল সেদিকে।

ধীরে ধীরে মীরজা একটা ক্লোরোফর্ম-ভেজানো রুমাল নাড়তে সুরু করল লোকটার সামনে।

কিন্তু একি!

একটা শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরখানা আলোর বন্যায় ভরে উঠল। আর যে লোকছুটি রিভলভার হাতে তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে তারাই হচ্ছে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী আর ইন্‌স্পেক্টর বাসু স্বয়ং।

লোক ছুটি বিস্ময়বিমূঢ়।

মিঃ বাসু হতচকিত লোকছুটির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেন।

গুজরং খাঁ ধীরে ধীরে সমস্ত কথাই স্বীকার করে।

ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে সে যা বলে তার অর্থ হচ্ছেঃ কাবুল থেকে সে বিনয় মল্লিককে অনুসরণ করেই এসেছিল সুদূর বাংলা মুল্লুকে। তাদের পরিবারের পবিত্র গুপ্তধনের মানচিত্র নিয়ে পালিয়ে এসেছিল বিনয় মল্লিক। সে তাই কোল্‌কাতায় এসে তার খোঁজ করতে থাকে।

ইতিমধ্যে সে একদিন কয়েকখানা জুয়েলারী বিক্রি করতে একটা দোকানে যায়। সেখানেই বিনয়কে দেখতে পায় সে। তারপর থেকে সে তাকে অনুসরণ করতে থাকে। ছ দিন তার বাড়িতেও হানা দিয়েছিল—কিন্তু তবু সেই নকশা পায়নি।

খুনের দিনও সে এসেছিল তার বাড়িতে গোপনে। সে দেখতে পায়

একটি মেয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। তার সন্দেহ হয়। সে মেয়েটিকে অনুসরণ করে তার বাড়ি দেখে আসে। তারপর তার কাছে খোঁজ করতে করতে নকশার আধখানা তার বান্ধবীর কাছ থেকে পেয়েছে।

বিমলাকে অনুসরণ করে সে রাত্রে সে তার বাড়ি গিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছিল বিনয় মল্লিকের বাড়িতে। কিন্তু এবার এসে সে দেখতে পায় বিনয় মল্লিক মৃত। কে যে তাকে হত্যা করেছে তা সে জানে না।

দীপককে যেদিন বিমলা আধখানা নকশা দেয়, সেদিন মীরজা তাদের অনুসরণ করে তাদের ঠিকানা জানতে পেরেছিল।

সমস্ত শুনে মিঃ বাসু বলেন—এ মিথ্যা কথা বলছে বলে মনে হয় মিঃ চ্যাটার্জী! এই-ই বোধ হয় মিঃ মল্লিককে খুন করেছে।

—কিন্তু কি ভাবে? দীপক চিন্তিত স্বরে বলে—মুখের ভেতরে জোর করে নল ঢুকিয়ে গুলি করা ত আর সহজে হয় না!

—তা বটে, কিন্তু...

—আপনার 'কিন্তু'র সমাধানও করবো মিঃ বাসু। একটু পরেই ভোর হবে। চলুন আমার সঙ্গে, আর এদের দুজনকে থানায় চালান করে দিন।

মিঃ বাসু কোনও উত্তর দেন না।

এগারো

—সমাধান—

সকাল সাতটা।

দীপক, ইন্‌স্পেক্টর বাসু আর রতনকে নিয়ে পুলিশ ভ্যানটা এসে থামল ডাঃ মিত্রের বাড়ির সামনে।

ডাঃ মিত্র দোতলা থেকে নেমে আসেন এদের আগমনের সংবাদ পেয়ে।

—নমস্কার মিঃ চ্যাটার্জী! আসুন আমার সঙ্গে ভেতরের ঘরে।

—চলুন ডাঃ মিত্র। কয়েকটা ব্যাপারে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।

—না না, বিরক্ত আর কি! আপনাদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য।

সকলে ডাঃ মিত্রের ঘরে গিয়ে বসেন।

দীপক ধীরে ধীরে সুরু করে—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই ডাঃ মিত্র!

—কি কথা?

—আচ্ছা বলুন ত, যেদিন রাতে মিঃ মল্লিক খুন হন, সেদিন রাত এগারোটায় আপনি কোথায় ছিলেন?

—আমি, মানে সেদিন ত 'লেবার কেস'।

—কোন্ বাড়িতে, কোন্ পেসেন্টের 'লেবার' কল্ ছিল?

—দেখুন ওসব 'প্রফেশন্যাল সিক্রেট'...

—মিথ্যা কথা বলছেন ডাঃ মিত্র! আপনি সেদিন ছিলেন মিঃ মল্লিকের ঘরে। তাঁর ঘরে যে জুতোর ছাপ পাওয়া গেছে তা আপনার পায়ের।

—মানে, এ সব কি বলছেন...

তীক্ষ্ণস্বরে দীপক বলে ওঠে—মিথ্যা বলে দোষ ঢাকবার চেষ্টা করবেন না

ডাঃ মিত্র—দীর্ঘদিনের বন্ধুকে টাকার লোভে হত্যা করে তাঁর সিন্দুকের চাবি আগে লুকিয়ে এনে ঘরের মধ্যে রেখে, সেই চাবি দিয়ে তালা খুলে টাকা চুরি করেছেন···

—কিন্তু···

—কোনও কিন্তু নয়, আপনি তাঁর থ্রোট্ দেখবার অছিলায় তাঁকে হাঁ করতে বলেন। তারপর তাঁর মুখের মধ্যে গুলি করেন আচম্‌কা। উনি রাতে চোখে একটু কম দেখতেন। তা ছাড়া আপনি যে এমন করতে পারেন তা উনি ভাবতেই পারেননি! অবশেষে সেই দোষ বেমালুম কাবুল থেকে আগত গুজরং খাঁর ওপর চাপান! কারণ আপনি জানতেন, তার আগেই গুজরং বিমলাকে অনুসরণ করে চলে গেছে। কেউ আপনাকে সন্দেহ করেনি। একটু আগে চিঠি দিয়ে লোকের হাতে পাঠিয়ে চমৎকার alibi তৈরী করেছিলেন! তা ছাড়া বিমলা দেবী নকশা নিয়ে পালাতে গিয়ে তাঁর পায়ের ছাপ রেখে গিয়েছিলেন পেছনের দরজায়। এসব প্রমাণকে অস্বীকার করে আপনাকে সন্দেহ করে কে? তাই না? এখন সেই চাবিটি পর্যন্ত হয়ত আপনার বাড়িতেই পাওয়া যাবে!

কথা শেষ হয় না।

ডাঃ মিত্র টেবিলের ওপর থেকে একটা শিশি তুলে নিয়ে কিছুটা বিষ মুখে পুরে দেন।

দীপক ও ইন্‌স্পেক্টর বাসু তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর আগেই তীব্র পটাসিয়ম সায়েনাইড তাঁর পেটের মধ্যে চলে গেছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ধীরে ধীরে চেয়ারের ওপর ঢলে পড়ে তাঁর দেহ।

দীপক অস্ফুট কণ্ঠে বলে—উঃ, এত করেও শেষ পর্যন্ত ওঁকে ধরা গেল না! একটা বিরাট পরাজয়! এ বিগ্‌ ফেলিওর অব্ মাই লাইফ্!

মিঃ বাসু দীপকের এ কথার কোনও জবাব দেন না।

—শেষ—

স্বপনকুমারের লেখা ডিটেক্‌টিভ গ্রন্থমালা

=বিশ্বচক্র সিরিজ=

প্রত্যেকখানির মূল্য '৫০ ন. প.

১। অদৃশ্য সঙ্কেত
২। দুরাত্মার ছল
৩। ভ্রান্তপথের শেষে
৪। চলন্ত ছায়া
৫। হিংসার অন্ধকার
৬। অব্যর্থ সন্ধান
৭। বিষাক্ত হাসি
৮। মিথ্যা চমক
৯। চায়না লজ
১০। বিজয়িনী তন্দ্রা
১১। শ্বেতপদ্ম
১২। অদৃষ্টের পরিহাস
১৩। ব্যথার প্রদীপ
১৪। মৃত্যুহান প্রাণ
১৫। রক্তকমল
১৬। নূতন অতিথি
১৭। পৃথিবী থেকে দূরে
১৮। হারান ডাইরী
১৯। বিকেল ছ'টার 'শো'তে
২০। বিফল স্বপ্ন
২১। বাগান-বাড়ী
২২। প্রবালপুরী
২৩। জীবন-মৃত্যু
২৪। পরপারের পথিক
২৫। জমাট অশ্রু
২৬। পরাজয়ের গ্লানি
২৭। আলো-আঁধার
২৮। তিন বন্ধু
২৯। ছায়ার আর্ত্তনাদ
৩০। রাঙ্গাজবা
৩১। এক পেয়ালা চা
৩২। বেনামী চিঠি
৩৩। রত্নমালার কাহিনী
৩৪। ঝড়ের সঙ্কেত
৩৫। জবানবন্দী
৩৬। ব্যর্থ অভিযান
৩৭। হারানো মাণিক
৩৮। অদৃশ্য বন্ধু
৩৯। হরতনের নওলা
৪০। গৃহপ্রবেশ
৪১। জোয়ার-ভাঁটা
৪২। বেয়াইনী দখল
৪৩। রূপমহল
৪৪। পরশ-পাথর
৪৫। চোখের ভুলে
৪৬। চারশো বিশ
৪৭। রঙ্গিন সূতা
৪৮। বিষকন্যা
৪৯। শুধু দুটি হাত
৫০। সন্ধ্যা-মালতী
৫১। বন্দী বাসুকী
৫২। শেষ রাতের কাহিনী
৫৩। বলয়গ্রাস
৫৪। ছন্দহারা
৫৫। মায়া-কানন
৫৬। ছদ্মবেশী
৫৭। তেরো নম্বর বাড়ী
৫৮। বন্দিনী বিশাখা
৫৯। একটি চোখের রহস্য
৬০। মুখার্জী ভিলা
৬১। চীনের পুতুল
৬২। কালো মুখোশ
৬৩। গ্রীন ড্রাগন
৬৪। নাইট ক্লাব
৬৫। সোনার হরিণ
৬৬। তিন নম্বর ফ্লাট
৬৭। ঘূর্ণি হাওয়া
৬৮। বিষের বাঁশী
৬৯। ভাড়াটে বাড়ি
৭০। ঘুম ভাঙা রাত
৭১। শেষ অঙ্ক
৭২। লাল কুঠী
৭৩। নিশি মালঞ্চ
৭৪। পাগল হাওয়া
৭৫। ঝরা বকুল
৭৬। চৈত্রের পলাশ

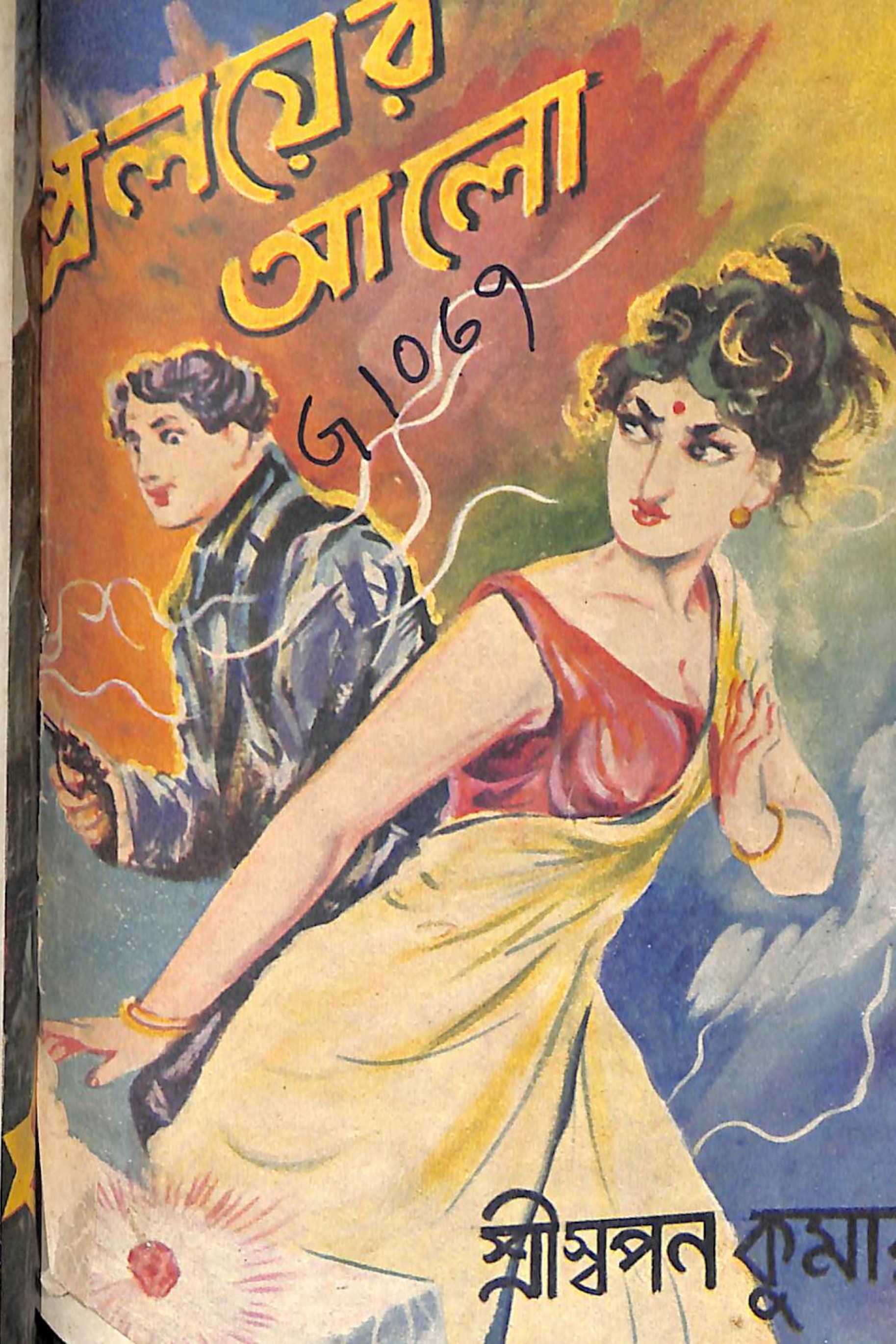

কলেজ স্টুডেন্টদের জন্য—

বিশ্ব-চক্র সিরিজের ৮১ নম্বর বই—

প্রলয়ের আলো

শ্রীস্বপন কুমার

বিশ্ব সাহিত্য প্রকাশনী

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার
বিশ্ব-সাহিত্য প্রকাশনী
৬৮নং কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

শ্রাবণ
১৩৭৪
৩

ছেপেছেন—
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড
৬৮নং কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য—
৬০ পয়সা

প্রলয়ের আলো

এক

বিকেল সাড়ে ছ'টা।

প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী তার গাড়িটা নিয়ে একটু বেড়াতে বের হবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল।

এমন সময় ক্রিং···ক্রিং···

ওপরের ঘরে শোনা গেল টেলিফোনের শব্দ।

দীপকের সহকারী রতনলাল টেলিফোন ধরল দোতলার ঘরে বসে।

টেলিফোনের শব্দ দীপকের কানেও এসেছিল। তাই সে আর বের হতে চাইল না। একটু থেকে বের হওয়াই তার পক্ষে ভালো। দেখা যাক টেলিফোনটা আবার তার জন্যে কী বার্তা বহন করে এনেছে।

এক মিনিট পর।

রতনলাল নেমে এল একতলায়। গ্যারেজের সামনে দীপক চুপ করে দাঁড়িয়ে রতনলালকেই প্রত্যাশা করছিল।

—আজ আর বের হওয়া চলবে না বন্ধু।—হাসতে হাসতে রতনলাল বলে।

—কেন রে? হঠাৎ আবার কী হল?

—ঠিক জানি না। তবে আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু পুলিস ইন্সপেক্টর মিষ্টার গুপ্ত দেখা করতে আসছেন।

—আসার কারণ কিছু বলেছেন কি?

—না। শুধু বললেন জরুরী ব্যাপার। অত্যন্ত আরজেন্ট। যেখানে যে অবস্থাতেই তুই থাকিস না কেন, তোকে তাঁর এখুনি চাই।

—বেশ আমি তাহলে একটু অপেক্ষা করি। তুই কি বলিস ?

—শুধু অপেক্ষা নয়, আমার মনে হয় নতুন কোন কেস হয়ত হাতে নিতে হবে। উঃ! কাজের পর আবার কাজ ? একটা কেস্ সল্‌ভ্ হওয়ার সাথে সাথে আর একটা এসে পড়ে ; এক মুহূর্তও বিশ্রাম নেবার উপায় নেই!

দীপক হেসে বলে,—তা তো দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে আমার বন্ধুর যেন অমর্যাদা না হয়।

—অমর্যাদার কথা আবার এলো কোথা থেকে ?

—মানে আমি বলছি কি, ভজুয়াকে বলে কিছু ভালো খাবারের ব্যবস্থা করে রাখিস। মনে আছে তো, মিঃ গুপ্ত একটু ডিমের ভক্ত বেশী।

কথাটা শুনে রতন হোহো করে হেসে উঠল। তারপর বলল,—হ্যাঁ, সেইজন্যেই লালবাজারে অনেকে মিঃ গুপ্তকে এগ-গুপ্ত বলে ঠাট্টা করেন। আশ্চর্য, দিনে দশ-পনেরটা ডিম উনি কেমন করে হজম করেন ?

দীপক বলে,—এ পৃথিবীতে অভ্যাস করলে হয় না কী ? অভ্যাসের জোরে মানুষ অফুরন্ত শক্তি আর সাহস পেতে পারে ; আর ও তো সামান্য ডিম হজম করা।

দুজনে ধীরে ধীরে ভেতরের দিকে পা বাড়ায়।

এর ঠিক পঁচিশ মিনিট পরের কথা।

ইতিমধ্যে দোতলায় পরিপাটি করে সাজানো হল-ঘরে দীপক মিঃ গুপ্তকে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল।

চাকর ভজুয়া দু প্লেট ডিম সেদ্ধ, চারটে ডিমের ডেভিল, মাংসের শিঙাড়া আর দু প্লেট চা দিয়ে গেল।

একসাথে এতগুলো ডিমের দর্শন পেয়ে খুবই খুশী হলেন মিঃ গুপ্ত।

অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ডিমগুলো শেষ করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন,—এবার শুনুন আমার কাহিনী।

দীপক ও রতন মনোযোগ দিল মিঃ গুপ্তের কথায়।

মিঃ গুপ্ত বলতে শুরু করলেন,—অনেকদিন তো এ লাইনে আছেন মিস্টার চ্যাটার্জী কিন্তু দস্যু প্রলয় নামে কোন এক দুর্দান্ত দস্যুর নাম শুনেছেন কি ?

দীপক চিন্তিত হল।

একটু ভেবে দীপক বলল,—দস্যু প্রলয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের নয় মিস্টার গুপ্ত। একজন ছদ্মবেশী দস্যুর সঙ্গে আমার কিছুদিন সাক্ষাৎ হয়েছিল, কিন্তু সেই দস্যুই আপনাদের দস্যু প্রলয় কিনা তা সঠিক বলতে পারব না।

মিঃ গুপ্ত হেসে বললেন,—এই দস্যু প্রলয় হচ্ছে শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন একটি দস্যু। এর দলে যে কত লোক কাজ করে এবং এর ক্ষমতা যে কত বেশী, তা সঠিক বলতে পারব না। তবু আমরা একে ভয় করি।

এর পেছনে লোক লাগিয়েছি। বিখ্যাত গোয়েন্দারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই দস্যুকে অনুসরণ করছে, কিন্তু তবুও তারা এখনও একে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় নি।

—এর পূর্ব ইতিহাস কিছু জানেন ?—দীপক প্রশ্ন করে।

—যেটুকু শুনেছি তাতে জানতে পেরেছি এই দস্যু এর আগে আফ্রিকা মহাদেশের কয়েকটা অঞ্চলে তার আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

—তারপর ?

—তারপর রেঙ্গুনেও সে বেশ কিছুদিন সদলবলে কাজ করেছিল বলে শোনা যায়।

—কিন্তু দস্যু প্রলয়ই কি এর চিরদিনের পরিচয় ?

—না। এর আগে এ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছে বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি।

—প্রলয় নাম সে কতদিন গ্রহণ করেছে জানেন ?

—না। তবে এর বিষয়ে অনেক খুঁজে পেতে যে ইতিহাস সংগ্রহ করেছি তা সংক্ষেপে বলতে পারি।

দীপক হাতঘড়ির দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে বলল,—আমার হাতে এখনও যথেষ্ট সময় আছে। বলুন! শোনা যাক আপনার কাহিনী।

মিঃ গুপ্ত বলতে থাকেন :—

—প্রলয় অন্য এক ছদ্মনাম নিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অরাজক অঞ্চলে দীর্ঘদিন নির্বিঘ্নে ভয়াবহ গুণ্ডামি, খুন, রাহাজানি আর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালিয়ে যায়। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, দিনের বেলায় এদের দলের লোকেরা অনায়াসে অত্যন্ত ভালো মানুষের মত সাধারণ মানুষের সাথে মিশে থাকে। তারপর রাত নামার সঙ্গে সঙ্গেই এরা এদের সুপরিকল্পিত ভয়াবহ ধ্বংসলীলার পথে এগিয়ে যায়।

—কিন্তু আজ পর্যন্ত এদের দলের কেউই কি ধরা পড়ে নি ?

—না। এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এমনভাবে ঘুরে বেড়ায় যে, এদের সহজে ধরা যায় না। আর দিনের বেলায় দলের সকলেই গা ঢাকা দিয়ে থাকে। তাই কে যে এদের দলপতি পুলিস শত চেষ্টা করেও তার কোন হদিস পায় নি।

—কিন্তু প্রলয়ের বিষয়ে আপনি সম্প্রতি এত চিন্তিত কেন ?

—চিন্তার কারণ আছে দীপকবাবু।

—যথা ?

—কিছুদিন আগে ভারতীয় পুলিস জানতে পারে যে, প্রলয় নামধারী

একটি দস্যু তার দলবল নিয়ে উত্তর প্রদেশে হানা দিয়েছিল। সেখান থেকে পুলিসের তাড়া খেয়ে ওরা চলে আসে বিহারে। ওখানে নয় মাসে প্রায় তিন চার লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করেছে ওরা। কোলকাতা পুলিসের গুপ্ত বিভাগের ধারণা এই যে ওরা হয়ত অতি শীঘ্রই কোলকাতার বুকে হানা দেবে।

—কিন্তু কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো পায় নি……

—প্রমাণ না পেলেও আমাদের কাজ চালাতেই হবে, মিস্টার চ্যাটার্জী। ওরা সারা ভারতের বুকে এমন ভয়, আতঙ্ক আর বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে যে এদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হবে।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন না করলে কারও বিরুদ্ধে এগোনো কত শক্ত, তা তো জানেন আপনি!

—জানি নিশ্চয়ই! কিন্তু ওপর থেকে ক্রমাগত এমন চাপ আসছে যে, আর বসে থাকা যায় না।

—আপনারা কি করতে চান, মিস্টার গুপ্ত ?

—আমরা চাই কোলকাতার সমস্ত সন্দেহজনক এলাকাগুলো সার্চ করে দেখতে। কিন্তু এত অল্প সময়ে তা কী করে সম্ভব বলুন! কোলকাতায় তো আর দুটো-একটা সন্দেহজনক জায়গা নেই—ক্রিমিন্যালস্ ডেন্ আছে প্রায় শ' খানেক।

—আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না, মিস্টার গুপ্ত?

—কী কাজ, বলুন ?

—আমরা সব দিক থেকে এমনভাবে প্রস্তুত থাকব যে, কোথাও কোন অঘটন ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের দু-একজন পাণ্ডাকে জালে আটকে ফেলতে পারব।

—কিন্তু এদের দলের পাণ্ডা মাত্র একজন।

—কে সে ?

—দস্যু প্রলয়।

—কিন্তু তার পরিচয় তো আপনি এখনও কিছু জানেন না ?

—জানি না বলেই তো জানবার জন্যে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

—আমাকে কী করতে হবে, মিস্টার গুপ্ত ?

—আপনার কাজ হবে ওদের দলের সব গুপ্ত খবর সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা করা।

—কিন্তু আমি কোন বিবরণই তো জানি না।

—হয়ত সবটাই একটা আতঙ্কের ফল। ভগবান করুন প্রলয়ের দল যেন কোলকাতায় না আসে।

দীপক হাসে মৃদু হাসি।

মিঃ গুপ্ত প্রশ্ন করেন,—আপনি হাসছেন কেন, মিস্টার চ্যাটার্জী।

—কারণ নিশ্চয়ই আছে।

—যথা ?

—আমার উপরে আপনি যে দায়িত্বের ভার অর্পণ করেছেন তার অর্থ হচ্ছে হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা।

—যা করতে একমাত্র আপনিই পারেন, সেই কাজই আপনাকে দিয়ে করাতে চাই, মিস্টার চ্যাটার্জী।

দীপক আবার হাসে রহস্যের হাসি। সে হাসির অর্থ হচ্ছে—দেখা যাক, অদূর ভবিষ্যতের গর্ভে কী রহস্য লুকিয়ে আছে !

দুই

বিখ্যাত ধনী রায়বাহাদুর শ্যামল সেন অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন তাঁর বিডন স্ট্রীটস্থ বাড়িতে।

কিছুক্ষণ আগেই তিনি সেদিনের ডাকে পাওয়া কয়েকখানি চিঠির উপর দ্রুত চোখ বুলাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল অদ্ভুত সরু একটা নীল রঙের খামের উপর।

সামান্য একটি খাম। কিন্তু তা যেন নিমেষের মধ্যে শুষে নিল তাঁর মুখের সবটুকু রক্ত।

খামের কোণে আঁকা একটি প্রজাপতির ছবি। সাধারণ যে কোন লোক প্রজাপতিটা দেখে মনে করবে এটা বোধহয় কোন বিয়ের চিঠি।

কিন্তু একমাত্র রায়বাহাদুর জানেন এর মধ্যে কী আছে। এটা যে বিখ্যাত দস্যু প্রলয়ের চিঠি, তা বুঝতে তাঁর মোটেই কষ্ট হয় না। তাঁর অতীত অভিজ্ঞতা তাঁকে মনে করিয়ে দেয় যে এ সেই অদৃশ্য দস্যু প্রলয়ের লেখা।

ছুরি দিয়ে খামটা কেটে ভেতরের চিঠিটা বের করে নিলেন তিনি।

সামান্য কয়েকটি লাইন মাত্র লেখা, কিন্তু তাতেই যেন তাঁর মধ্যে এনে দিল একটা অদ্ভুত পরিবর্তন।

ধীরে ধীরে তাঁর মুখের মাংসপেশী কঠিন হয়ে উঠল। অগ্নিগোলকের মত জ্বলতে লাগল তাঁর চোখ দুটি।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত।

তারপরেই চিঠিটা মেঝের উপর ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন,—না না, এ হতে পারে না। এ অসম্ভব। এ অসম্ভব।

প্রাণপণে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করে তিনি পাইপটা ধরালেন। কিন্তু আবার চোখ গিয়ে ঠিকরে পড়ল মেঝের উপরের চিঠিটার উপর।

আবার চিঠিটা হাতে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন রায়বাহাদুর।

তাতে লেখা :—

প্রিয় প্রণয় নিয়োগী,

জীবনে অনেক অদ্ভুত কাজই তুমি করেছ। তবে সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছ

চিঠিটা হাতে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন… [পৃষ্ঠা ৯

G 10

তুমি নিজে। আজ তুমি নাম পালটে প্রাণপণে শ্যামল সেন হবার চেষ্টা করছ বটে, কিন্তু একটা মারাত্মক ভুল তুমি করে বসেছ একটা জায়গায়।

তোমাকে চিনতে আমার কষ্ট হয় নি একটুও। আজ যদি আমি তোমার আসল পরিচয় প্রকাশ করে দিই সকলের কাছে, তবে তোমার পুরোনো ঘৃণিত দিনের কথা স্মরণ করে সবাই আতঙ্কে শিউরে উঠবে।

আজ যদি তুমি বিশ বছর আগেকার দিনে ফিরে যাও, তবে তোমার এত ঐশ্বর্য সব বৃথা প্রতিপন্ন হবে। লোকে জানবে তুমি ঘৃণিত, নীচ একটি খুনী মাত্র।

কিন্তু তাই কি তুমি চাও ?

যদি এই ঘোর দুর্বিপাক থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাও, তবে কিছু টাকা তোমায় খরচ করতেই হবে।

ভুলো না যে তোমার অন্য উপায়ে উপার্জিত অর্থে অনেক দীনদুঃখী দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বাঁচবে।

মাত্র বিশ হাজার টাকার খুচরো নোট একটা তাড়ায় বেঁধে আগামী পরশু রাত দেড়টার সময় গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের পশ্চিম কোণে রেখে আসবে। তা হলেই তা আমার হস্তগত হবে।

তা না হলে তোমার নিস্তার নেই বন্ধু। পুলিসকে জানাতে গেলেই এই চিঠি তাদের দেখাতে হবে। তাহলে পুলিস জেনে ফেলবে তোমার পুরোনো পরিচয়। সুতরাং সে চেষ্টা কোরো না।

এখন নিজের যা ভালো মনে হয় করো। আর একটা কথা, তোমার পুরোনো পরিচয় প্রমাণ করবার ক্ষমতাও আমার আছে। ইতি—

তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী

প্রলয়।

(২০১/৯

রায়বাহাদুরের হাত দুখানা কাঁপতে লাগল।

বিশ বছর 'পরে কালের হাতের স্পর্শে আজ তাঁর দেহের এমন অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে যে, কেউ কোনদিন তাঁকে দেখে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করতে পারবে না যে, তিনিই অতীত দিনের প্রণয় নিয়োগী।

কিন্তু তবুও কী করে ওরা জানতে পারল তাঁর পুরোনো দিনের কাহিনী? কী করে আজ এ সম্ভব হয়েছে? তবে কি এই দস্যু প্রলয় সত্যি কোন মায়াবী বা জাদুকর?

রায়বাহাদুর তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়ালেন একটা আয়নার সামনে। সমালোচকের দৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাকালেন নিজের প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের দিকে।

নাঃ, সম্পূর্ণ অন্য লোক আজ তিনি। পেশীবহুল দেহেও যথেষ্ট পরিবর্তন। মাথায় টাক। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। রগের কাছে চুল পাকতে শুরু করেছে। অদ্ভুত এক গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রৌঢ় তিনি আজ।

দরজায় খিল এঁটে একটা ড্রয়ার থেকে টেনে বের করলেন তিনি একটা বহু পুরোনো বাক্স। তার ভিতর থেকে বের করলেন একজন তরুণ যুবকের ছবি। কিন্তু ঐ ছবির সাথে আজ আর তাঁর কোন মিল নেই।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। আজ আর কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে রায়বাহাদুর শ্যামল সেন স্বয়ং প্রণয় নিয়োগী।

ধীরে ধীরে আবার একবার চিঠিটা তুলে নিলেন তিনি। ভালো করে উলটে পালটে দেখতে লাগলেন সেটা।

নূতন কোন তথ্য আবিষ্কৃত হল না। খামের উপর শুধু বিডন স্ট্রীট পোস্ট অফিসের সীল দেখা গেল।

সেইদিনই পোস্ট করা হয়েছে চিঠিটা।

রায়বাহাদুর বুঝলেন পত্রপ্রেরক আশপাশেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

কিন্তু কে সে?

ধীরে ধীরে তাঁর মুখে ফুটে উঠল বিরক্তির রেখা। কেউ নিশ্চয়ই বাজে চিঠি লিখে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়। ওদিকে মন দিয়ে কোন লাভ নেই।

কিন্তু এ পৃথিবীতে কোন লোকই তো জানে না যে, তাঁর পূর্ব নাম ছিল প্রণয় নিয়োগী! তবে?

আর কে এই দস্যু প্রলয়?

এই কি সেই, যার সাথে উত্তরপ্রদেশে তাঁর একবার সংঘর্ষ হয়েছিল? হয়ত তাই।

আর যদি তা না হয় তবে এ চিঠি জাল। আবার ভাবতে শুরু করেন তিনি। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে তাঁর কপালে। তারপর এক সময় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন চিঠিটা।

তারপর উঠে ঘরের খিল খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়ে চাকর হরিকে ডেকে বললেন,—চা নিয়ে আয়।

হরি চা নিয়ে এসে রাখল টেবিলের ওপর। তারপর তাঁর হাতে তুলে দিল একখানা কাগজ। বলল,—বাবু, এইমাত্র একজন লোক এই কাগজখানা দিয়ে গেল। বলল যে, এটা নাকি আপনার জরুরী চিঠি।

বিস্মিত রায়বাহাদুর কাগজটি খুলে দেখলেন তাতেও একটা প্রজাপতির ছবি জলজ্বল করছে।

ছবির নীচে লেখা—

প্রণয় নিয়োগী,

তুমি যতই চিঠি ছিঁড়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করো, আমার প্রাপ্য টাকা পুরোপুরি না পেলে তোমার নিস্তার নেই জেনো।

মনে রেখো, আমার দৃষ্টি রয়েছে তোমার প্রতিটি কাজের ওপর—তোমার সব গতিবিধির ওপর।

এমনকি, তুমি কোন্ বেশে, কোথায় দাঁড়িয়ে কী করছো, তা পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগণ্ডির ভিতরে। এখনও শেষবারের মত তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, যদি মান-সম্মান প্রতিপত্তি অর্থ নিয়ে বাঁচতে চাও, আমার সামান্য দাবিটি পূর্ণ কর।

আমার এই বিরাট সুসংবদ্ধ শক্তিকে যারা তুচ্ছ করে তারা তাদের ধ্বংসকে নিকটতম করে তোলে। ইতি—

তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী
প্রলয়।

রায়বাহাদুর চাকরের উদ্দেশ্যে গর্জন করে উঠলেন,—যে লোকটা চিঠি দিয়ে গেল সে চলে গেল কোন্ পথে?

ভীত কণ্ঠে চাকর হরি বলল,—আজ্ঞে হুজুর সে ত চিঠিটা দিয়েই একটা সাইকেলে করে তখুনি চলে গেল।

রায়বাহাদুর চিৎকার করে কী যেন বলতে গেলেন—কিন্তু তাঁর মুখে স্বর ফুটল না।

ধপ্ করে সোফায় গা এলিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর দুচোখে যেন অকূল রাত নেমে এলো।

তিন

হোটেল প্যাস্চার।

চীনেপাড়ার অজস্র ঘোরানো পেঁচানো গলি গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে সংকীর্ণ একটা জীর্ণ গলিতেও যে একটা হোটেল থাকতে পারে এটা হয়ত অনেকে কল্পনাও করতে পারবে না।

তবু এটা সত্যি।

বিশেষ এক শ্রেণীর লোকের কাছে এই হোটেলটি বেশ লোভনীয় একটি বাসস্থান। ক্ষুদ্র, অপরিসর, প্রায়-অন্ধকার গলির বাসিন্দাদের সাথে এই হোটেলের লোকগুলিও যেন অভিন্ন।

বহু পুরানো বাড়ি। চুন-বালি খসে খসে পড়ছে। দাঁত বের করে রয়েছে নোনাধরা ইঁটগুলো।

বাড়িটার নীচের তলায় অনেকগুলো দোকান ও গুদাম। উপরের তলায় এই হোটেলটি।

দোকানগুলোতে কোন খদ্দেরকে কখনও দেখা যায় না। তবে কী করে যে এদের দিন কাটে তা জানে না কেউ।

হোটেলটিতে নানা শ্রেণীর এবং নানা বর্ণের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মিশ্রণ। যেন বিভিন্ন জাতির একটি সংক্ষিপ্ত প্রদর্শনী। কিন্তু এদের মধ্যে কে যে কি করে, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

আর মাথা ঘামিয়েই বা লাভ কী?

এ বিরাট হোটেলের কোন গোপন কক্ষে যে কে বাস করে, সে সম্বন্ধে ধারণা করাও সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত।

হোটেলের নয় নম্বর ঘরে রাত সাড়ে বারোটার সময় গল্পের যবনিকা উঠল।

ঢং করে বেজে উঠল একটা সময় নির্দেশক ঘন্টা। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে উপস্থিত প্রায় পনের জন লোক উঠে দাঁড়াল। সজোরে টিপল দেওয়ালের সঙ্গে দণ্ডায়মান একটা কাঠের পুতুলের ঠিক মাঝের অংশটা।

ক্রি—ক্রি—ক্রি—ক্রিং……

বিচিত্র শব্দ।

দেখতে দেখতে সরে গেল ঘরের মেঝের কিছুটা অংশ। দেখা গেল বিরাট লম্বা একটা সুড়ঙ্গপথ। কিন্তু তা যে কোথায় গেছে তা কেউ জানে না।

সুড়ঙ্গপথটিতে ঘোরানো ঘোরানো একসার সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে। নীচে—আরও নীচে। বুঝি পাতালের কোন অতল গহ্বরের সন্ধান পাওয়া যাবে এই পথ থেকে।

ভূগর্ভস্থ একটা কক্ষে গিয়ে পথটা শেষ হয়েছে। সেখানে অনেকগুলি বসবার আসন। একে একে সবাই বসে পড়ল।

সবাই স্তম্ভিত। বিস্ময়ে হতবাক্। বহুদিন পরে আবার তাদের ডাক এসেছে। তাদের অজ্ঞাতবাস করতে হবে না আর। কোন এক অন্ধকার ভাঙ্গা বাড়ির নিশাচর পাখিরা ডানা ঝাপটে উড়তে যাচ্ছে যেন। এবার শুরু হবে তাদের কর্ম। সাড়া দিতে হবে কাজের আহ্বানে। কিন্তু কী যে কাজ তা তারা এখনও জানে না।

ওদের মধ্যে মৃদু কথাবার্তার গুঞ্জন উঠছিল। কিন্তু তা এত ধীরে যে বাইরের কোন লোকের কানে তা পৌঁছাবে না। ধীর কথাবার্তা শুনে শুধু মনে হচ্ছিল যে, এদের স্থির ধারণা, দেওয়ালেরও বুঝি কান আছে।

ওদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছে পুলিসের অতি পরিচিত মহাপ্রভু। অপর দু-একজন সম্বন্ধে যদিও পুলিস নীরব—তবুও জনসাধারণের কাছে বড় বেশী সন্দেহের পাত্র।

দেওয়ালের পিছন দিকে একটা বিরাট কালো পর্দার উপর আঁকা একটা প্রজাপতির বিরাট ছবি।

তার ঠিক নীচে চীনা হরফে যা লেখা তার অর্থ হচ্ছে—প্রলয়।

—ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং……

বেজে উঠল একটা অদ্ভুত শব্দ। পাতাল জুড়ে যেন আবির্ভূত হল, সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে আবৃত, মুখে কালো মুখোশ পরা এক মূর্তি। ঘরের স্বল্প আলোয় মনে হচ্ছিল মূর্তিটির সারা দেহ যেন রোমাঞ্চ দিয়ে তৈরী। সে আবহাওয়াটার মাঝে কোলকাতা শহরের নামজাদা গুণ্ডা ব্ল্যাকমেলারদের বুকও কেমন যেন কেঁপে উঠল।

সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল তাকে সম্মান দেখাবার জন্যে। এটা কারও নির্দেশে তারা করে নি, ভয় আর ভক্তি মিশে তাদের মনে এমন একটা ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল যে, তারা যেন নিজেদের অজ্ঞাতেই কাজ করে চলেছিল।

কালো মূর্তিটি ধীরে ধীরে হাত নাড়ল। সবাই বসে পড়ল একে একে। ঘরের মধ্যে একটা সূঁচ পড়লেও বোধহয় তার শব্দ শোনা যেত, এমনি শান্ত নীরবতা বিরাজ করছিল চারিদিকে।

সকলের একাগ্র দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ।

কর্কশ কণ্ঠে ভেসে এল কতকগুলো কথা—যা মনে অহেতুক একটা ভয় জাগায়। যা শুনে মনে হয়, যে কথাগুলো বলে চলেছে সে ভয়ানক—সে মূর্তিমতী বিভীষিকা। নির্মম। নিষ্ঠুর।

শোনা গেল—

বন্ধুগণ, বহুদিন পরে তোমাদের আমি ডাক দিয়েছি। নূতন কাজের জন্যই সমবেত করেছি তোমাদের। সে কাজ তোমাদের সামনে অপেক্ষা করছে।

এগিয়ে চলবে নিজেদের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে। তোমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। কর্তব্য পালন করলে তার উপযুক্ত মর্যাদাকে তোমরা পাবে, এ বিষয়ে তোমাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি। তোমরা জান, প্রলয় কোনদিন তার কথার খেলাপ করে না।

প্রলয়ের আলো

প্রলয় আজ আর বেঁচে নেই বলে অনেকে মনে করে। অনেকে ভাবে আমার কোলকাতায় আসার কথা মিথ্যা। তাদের ঘুম এবার ভাঙবে। তারা জানবে আমি বেঁচে আছি। আমি ধ্বংসের নেশায় উত্তাল হয়ে উঠেছি। আমার কর্মপদ্ধতি কোথাও এতটুকু বাধাপ্রাপ্ত হবে না কোনদিন।

শুনেছি প্রখ্যাত ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জী আর পুলিস ইন্‌সপেক্টার মিষ্টার গুপ্ত আমাকে ধরবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু তারা জানে না যে, আমার বিপক্ষে যারা দাঁড়াবে তাদের কাজের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে।

দিকে দিকে আবার ছড়িয়ে পড়বে প্রলয়ের আতঙ্ক। মূর্খ পুলিস আর গোয়েন্দার দল আমার সন্ধানে মিথ্যা ঘোরাঘুরি করে মরবে!

কিন্তু আমার কেশাগ্র স্পর্শ করবার ক্ষমতা নেই কারও।

আর আমার কাজ হবে তাদের পাশে বসে তাদের কাজের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলা। এবার থেকে প্রলয়ের নতুন অভিযান শুরু হবে কোলকাতার বুকে। আর তোমরা হবে আমার সে অভিযানের সহায়ক।

কিন্তু সাবধান বন্ধুগণ, বিশ্বাসঘাতকদের আমি একটিমাত্র শাস্তিই দিয়ে থাকি। সে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

এখন তোমাদের কী কাজ করতে হবে সে বিষয়ে কিছু উপদেশ দিই শোন।......

এরপর যেসব কথা সেখানে আলোচিত হতে লাগল তা শুনলে যে কোনও সভ্য মানুষের বুকই ভয়ে আঁতকে উঠবে। কিন্তু ওরা নির্বিকার-ভাবে সব কথা শুনে যেতে লাগল।

চার

খ্যাতনামা প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জী তার সহকারী রতনলালের সঙ্গে কথা বলছিল তার ড্রইংরুমে বসে।

সকাল সাড়ে আটটা।

হালকা হাওয়ার মৃদুস্পর্শে বাসন্তী আমেজ। শীতের দিন শেষ হয়েছে। বসন্ত আগতপ্রায়।

মিঠে রোদের সঙ্গে পাখির গান মিলে অকল্পনীয় আনন্দের আভাস।

রতনলাল বলল,—দীপক আজ পর্যন্ত তুই যে কয়টা কেসে হাত দিয়েছিস, প্রায় প্রত্যেকটিতেই সফলতা লাভ করায় সবার নিশ্চিন্ত ধারণা যে, তুই হাত দিলেই যে কোনও রহস্যের সমাধান হতে বাধ্য।

দীপক হাসিমুখে বলে,—তুই ঠিক বলেছিস। ওরকম ধারণা অনেকেরই আছে বটে।

—কিন্তু এই প্রলয়ের বিষয়ে ত আজ পর্যন্ত নতুন কোন তথ্য তুই আবিষ্কার করতে পারলি না।

—কে বললে?

—অবশ্য আমি তো কিছুই জানি না।

—তোর শোনার মত কিছু জানতে পারি নি বলে তোকে এখনও কিছু বলি নি।

—কী জেনেছিস বল না!

—কোলকাতা শহরের কতকগুলো নামকরা ক্রিমিন্যাল্‌স্ ডেনে পা দিয়েছিলাম আমি। তাদের সঙ্গে মিশে বেশী কিছু জানতে না পারলেও দু-একটা কথা জানতে পেরেছি।

—যথা?

—প্রথম কথা দস্যু প্রলয় কোল্‌কাতার বুকে পা দিয়েছে, একথা ঠিক।

—কতদূর কাজ করেছে সে?

—বিশেষ কিছু না। দুচারটে ভয় দেখানো চিঠি ছেড়েছে আর তার দলবলকে একত্রিত করে বড় বড় উপদেশ শুনিয়েছে।

—তার দলের কারও সঙ্গে তোর আলাপ আছে বোধহয়?

—ঠিক ধরেছিস।

—তাহলে তো কাজের অনেকটা সুবিধে হয়ে গেছে। তাই না?

—অনেকটা। কিন্তু একটা বিষয়ে—

কথা শেষ হয় না।

বাইরে শোনা গেল অচেনা পদশব্দ। দীপক রতনের দিকে চেয়ে বলে উঠল,—অচেনা পদশব্দ শোনা যাচ্ছে মনে হল। বোধহয় কোন অচেনা বন্ধু।

তার কথার সত্যতা প্রমাণ করে ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হলেন একজন অজানা ভদ্রলোক। মাথায় টাক। পরনে দামী স্যুট্। চোখে মুখে অপরিসীম ব্যস্ততার ছাপ। চেহারা দেখে বেশ অভিজাত বলেই মনে হয়।

দীপক এবং রতন মুখ তুলে কোন কথা বলবার আগেই আগন্তুক ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বলে উঠলেন—আমাকে আপনি চেনেন না দীপকবাবু। তবে পরিচয় দিলে হয়ত চিনতে পারবেন। আমারই নাম রায়বাহাদুর শ্যামল সেন।

দীপক হেসে বলে,—ও হ্যাঁ, এবার আপনাকে চিনেছি। আপনার নাম শুনেছিলাম আগেই। আপনি বিডন স্ট্রীটে থাকেন, তাই না?

ভদ্রলোক হেসে বলেন,—মনে রেখেছেন দেখছি। আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও যে চেনেন, আশ্চর্য।

দীপক বলে,—না, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। উঁচু মহলে আপনার

বেশ নামডাক আছে। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যে, আপনি কোন কারণে খুব বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাছাড়া কখনো বিনা কারণে এ দরিদ্রের কুটিরে আপনার মত লোকের পদার্পণ হবে না, তা জানি। এখন যদি ধীরে সুস্থে জিরিয়ে নিয়ে কারণটি ব্যক্ত করেন তো বাধিত হই। অবশ্য আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারব কিনা তা অনেকটা নির্ভর করছে ওই কারণটির উপর।

একটু থেমে দীপক আবার বলে,—দেখুন, একটা কথা আগে থেকেই বলে রাখি, রায়বাহাদুর। টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে কাজে নামাবেন একথা যদি আপনি ভেবে থাকেন তবে আপনি ভুল বুঝেছেন।

—কেন?

—কারণ হচ্ছে এই যে, আমি একজন ক্রিমিনোলজিস্ট ইন্ দি ট্রু সেন্স। ছোটখাট চুরি-বাটপাড়ি নিয়ে মাথা ঘামানো আমার পেশা নয়। কোন বড় ক্রাইম যেখানে অনুষ্ঠিত হয়, কিংবা হবার উপক্রম হয়, সেইখানেই আমার দেখা পাবেন আপনি।

—বুঝেছি।

—যাক আপনার কেসটার বিষয়ে এবার আমাকে সংক্ষেপে বলুন।

রায়বাহাদুর বললেন,—ঠিক বলেছেন আপনি মিস্টার চ্যাটার্জী। এতদিন আপনার নামই কেবল শুনে এসেছি—আজ সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। এই হল উপযুক্ত লোকের মত কথা। এখন শুনুন সংক্ষেপে আমার কেসটি। মনে হয়, আপনি একবার শুনলে আমাকে নিশ্চয়ই এড়াতে চাইবেন না।

দীপকের কৌতূহল অনেকটা বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে সে বলে,—বলুন, আপনার কেসের বিষয়ে শোনা যাক।

রায়বাহাদুর বলতে শুরু করলেন,—তিন দিন আগে সকালে অনেকগুলো চিঠি ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি খামের ওপর প্রজাপতি আঁকা একখানা চিঠি পাই।

—চিঠির প্রেরক কে?

—প্রেরকের নাম শুধু লেখা আছে—প্রলয়।

—প্রলয়?

দীপক ও রতন আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। কৌতূহলপূর্ণ কণ্ঠে দীপক বলে,—তারপর?

—চিঠিতে নূতনত্ব বিশেষ কিছু ছিল না। সাধারণ ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবার ফন্দী ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তবে অত সহজে ভয় পাবার ছেলে আমি নই। আমি চিঠিটাকে মামুলী মনে করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিই এবং ওটা নিয়ে মাথা ঘামানো বোকামি ভেবে ও বিষয়ে আর মাথা ঘামাই না।

কিন্তু তার কয়েক মিনিট পরেই পেলাম দ্বিতীয় চিঠি। আমার চাকরের হাত দিয়ে পাঠিয়েছিল সে চিঠিটা।

—আপনি তখন কী করলেন?

—আমি কিছুই করলাম না তখন। ভাবলাম ওদের বিরুদ্ধে সব কথা পুলিসকে জানাব।

—এরা কি আপনার উপর নজর রেখেছিল?

—দ্বিতীয় চিঠিটা পড়ে তো তাই মনে হল।

—তারপর?

—পরের ঘটনা কাল রাতে। সন্ধের পর খাওয়াদাওয়া করে আমি বাইরের বারান্দায় একটু পায়চারি করি। এটা আমার বহুদিনের অভ্যাস। কালও ঠিক খাওয়াদাওয়ার পর একটু ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

আমার মাথায় ছিল নাইট ক্যাপ ও পরনে নাইট ড্রেস। একটা রিভলভারের গর্জনে হঠাৎ আমি চমকে উঠলাম। ভয় পেয়ে চুপচাপ বসে পড়লাম আমি। দেখলাম ওপাশের রেলিং থেকে একজন লোক মাটিতে লাফিয়ে পড়ে ছুটতে ছুটতে পথে গিয়ে পড়ল। তার সারা দেহ কালো পোশাকে আবৃত থাকায় তাকে চিনতে পারলাম না।

তারপর হঠাৎ নাইট ক্যাপটায় হাত দিয়ে দেখলাম গুলিটা টুপি ভেদ করে চলে গেছে। এটা মস্তবড় সৌভাগ্য বলতে হবে।

শয়তানের প্রথম চেষ্টা হয়ত ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু এরপর তারা সাফল্য অর্জন করবার চেষ্টা করবে। তাই সাহায্যের আশায় আপনার শরণাপন্ন হয়েছি দীপকবাবু। আশা করি নিরাশ হব না।

দীপক কোনও কথা না বলে অকস্মাৎ ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা নিয়ে জানলার দিকে লক্ষ্য করে একবার পিস্তল ছুড়ল।

প্রচণ্ড শব্দ। ধোঁয়া উঠল অনেকটা।

জানলার বাইরে শোনা গেল ধুপ করে একটা শব্দ।

তিনজনে বাইরে বেরিয়ে দেখল একজন লোক সাইকেলে করে পালিয়ে যাচ্ছে। তার অপস্রিয়মান মূর্তিটির দিকে চেয়ে রতন দীপককে জিজ্ঞাসা করল,—ওকে অনুসরণ করব নাকি?

দীপক হেসে বলে,—না থাক।

—কেন?

—ওসব ছোটখাট চুনোপুঁটিদের নিয়ে মাথা ঘামালে আমার আসল লক্ষ্য যারা তারা সাবধান হয়ে যাবে।

তারপর দীপক ঘরে ঢুকে রায়বাহাদুরকে লক্ষ্য করে বলে,—আপনার কেস

আমি গ্রহণ করলাম, রায়বাহাদুর। প্রলয়ের সাথে আমার সংঘাত শুরু হল। জানি না এর শেষ কবে হবে।

রায়বাহাদুর উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে বললেন,—ধন্যবাদ, দীপকবাবু। এই জন্যেই আমি পুলিসের কাছে না গিয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছিলাম। আমি জানি আপনি পুলিসের চেয়ে অনেক বেশী কর্মক্ষম। আর আপনি কাজে নামলে প্রলয়ের নজরে তা পড়বে না।

দীপক একটু থেমে বলল,—কিন্তু আমার বন্ধুদের নজর অনেক আগেই পড়েছে দেখতে পাচ্ছি। ওদের নজর এড়ানো সত্যিই খুব কঠিন।

এমন সময় ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল।

ভেসে এল অপরিচিত এক কণ্ঠস্বর,—হ্যাঁ বন্ধু, ঠিকই বলেছ তুমি। আমার নজর এড়ানো সত্যিই খুব কঠিন। তুমি রায়বাহাদুরের কেস গ্রহণ করেছ জেনে খুব খুশী হলাম।

কিন্তু একটা কথা মনে রেখো বন্ধু। আমার একজন অনুচরকে ভয় দেখিয়ে কী হবে? আমার অনুচর ছড়িয়ে আছে সারা ভারতের প্রতিটি কোণে। আমার শক্তির কাছে তুমি যে কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ তা আমি প্রমাণ করে দেব। তুমি মনে রেখো, তোমার চোখের সামনেই রায়বাহাদুরের ওপর নেমে আসবে আমার অমোঘ দণ্ড। এরপর আমার বিজয় রথ এগিয়ে যাবে। একের পর এক চলবে আমার বিজয় অভিযান। তুমি কেন, সারা কোলকাতার পুলিস বিভাগেরও ক্ষমতা নেই যে আমার কেশাগ্র স্পর্শ করে। বুঝেছ মূর্খ?

কথা শেষ হয় না।

দীপক হেসে ওঠে প্রচণ্ড অট্টহাসি,—হা—হা—হা...

তারের ওধার থেকে ভেসে আসে,—হাসছ যে?

দীপক দাঁতে দাঁত চেপে বলে,—এর আগেও আরও অনেক বড় বড় দস্যুসর্দার তাদের ক্ষমতাকে অজেয় মনে করেছিল প্রলয়? কিন্তু তাদের গর্বকে আমি খর্ব করেছি। মনে রেখ দীপক চ্যাটার্জী পেছোতে জানে না। আজ যে যুদ্ধ ঘোষিত হল তাতে হয় তোমার জয় নয় আমার। দেখা যাক, নিয়তি কার কপালে এঁকে দেয় সে জয়টিকা।

দীপক টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখে।

অপরিসীম উত্তেজনায় তার সারা মুখখানা রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল তখন।

পাঁচ

সেদিন বিকেল।

দীপক বাড়ি থেকে বের হবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় হঠাৎ একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল তার বাড়ির সামনে।

রতন আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল। তাই দীপক নীচে নেমে এল আগন্তুককে অভ্যর্থনা করবার জন্যে।

দীপক দেখে গাড়ি থেকে নামেন মিঃ গুপ্ত।

—কী খবর মিস্টার গুপ্ত?

—খুব জরুরী খবর।

—কী আবার হল হঠাৎ?

—চিঠি।

—দস্যু প্রলয়ের কোন চিঠি পেয়েছেন নাকি আপনি?

—আমার কাছে হলেও তো ভাল ছিল। একেবারে খোদ পুলিস কমিশনার সাহেবের কাছে।

—আশ্চর্য! এ কথা ভাবতেও বিস্ময় জাগে সামান্য একজন দস্যুর ভয়ে কোলকাতার পুলিস বিভাগ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

—কিন্তু এতে দোষ কার বলুন ?

—দোষ গুণ কিছুই নেই মিস্টার গুপ্ত। আমাদের এবার দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে হবে। যাকগে কই দেখি কী চিঠি দিয়েছে এই প্রলয়।

মিঃ গুপ্ত একখানা ছোট খাম এগিয়ে দেন দীপকের হাতে। দীপক তা থেকে একটা ছোট চিঠি বের করে পড়তে থাকে।

তাতে লেখা :

প্রিয় পুলিস কমিশনার—

আমার নাম আপনারা হয়ত নিশ্চয়ই শুনেছেন। সারা ভারত জুড়ে আমি বিখ্যাত বা অখ্যাত। আমার নামে ভারতের বহু প্রদেশের পুলিস বিভাগ আতঙ্কে শিউরে ওঠে।

সম্প্রতি আমি কোলকাতায় পা দিয়েছি। আমি জানি আমাকে জব্দ করবার জন্যে আপনারা অনেক আগে থেকেই বিশেষভাবে তৈরী হয়ে ছিলেন।

কিন্তু আমাকে ধরতে পারবেন কি ?

না। কারণ আমার সম্বন্ধে কোন কিছু জানা আপনাদের ওই কর্তব্যবিমুখ, ভেড়ার পালরূপী পুলিস বা গোয়েন্দা বিভাগের কাজ নয়।

তবে আপনারা যখন চেষ্টা করছেনই, তখন আমি আপনাদের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে ক্রমান্বয়ে আমার কাজ করে যাব। আমি দেখব কি করে আপনারা আমার কাজে বাধা দেন!

আমি এর আগেই কোলকাতা শহরের নামকরা ধনী রায়বাহাদুর শ্যামল সেনকে চিঠি লিখে তার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা দাবি করেছি।

কিন্তু সে আমার কথা অগ্রাহ্য করে কোলকাতার নামকরা গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর কাছে সাহায্য চেয়েছে। তাই আমি আপনাকে চিঠি লিখছি।

দীপক চ্যাটার্জীর মত গোয়েন্দা আমার কাছে তৃণখণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। তাই আমি আপনাদের সকলকে প্রত্যক্ষভাবে চ্যালেঞ্জ করলাম। যদি আপনাদের ক্ষমতা থাকে আপনারা আমাকে বাধা দিন।

আমি আগামীকাল বেলা ঠিক দশটার সময় সকলের সামনেই রায়-বাহাদুরের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা গ্রহণ করব। আপনারা আমার কাজে বাধা দেবার জন্য যত খুশি লোক নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু তাতে আমার কোন অসুবিধা হবে না।

এবার বুঝতে পারছেন তো আমার ক্ষমতা কতদূর প্রসারী। মনে রাখবেন কোলকাতা শহরের প্রতিটি ডিপার্টমেণ্টে ছড়িয়ে আছে আমার লোক।

আজকের মত এখানেই শেষ করলাম। কাল দেখা হবে আবার মুখোমুখি। ইতি—

আপনাদের প্রত্যর্থী

প্রলয়।

চিঠিটা পড়ে দীপক বলে,—প্রলয় যত ক্ষমতাশালীই হোক না কেন, একটা ব্যাপারে সে অন্যান্য সাধারণ দস্যুর মতই।

—কী ব্যাপার, মিস্টার চ্যাটার্জী ?

—প্রলয় অন্যান্য দস্যুদের মত নিজের ক্ষমতাকে প্রচার করতে ভালোবাসে।

—তাই তো দেখছি।

—কিন্তু অহংকারই পতনের মূল, জানেন তো ?

—একথা বলছেন কেন ?

—বলছি এই জন্যে যে, দেখবেন এই অহংকারের জন্যেই প্রলয়ের পতন অনিবার্য।

—কিন্তু এখন আমাদের কী করা উচিত ?

—আমরা যথারীতি এগিয়ে যাব। চলুন শ্যামলবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

—হ্যাঁ, তাই চলুন।

দুজনে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসে।

ছয়

মিনিট কুড়ি পর।

দীপক আর মিঃ গুপ্তকে নিয়ে মোটরটা এসে থেমে যায় মিঃ শ্যামল সেনের বাড়ির সামনে।

গাড়ি থেকে নেমে শ্যামলবাবুকে খবর দেবার পরই হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন তিনি। আর মিঃ গুপ্তের দিকে নির্দেশ করে বলেন,—ওঁকে তো চিনতে পারলাম না মিস্টার চ্যাটার্জী।

দীপক পরিচয় করিয়ে দেয়,—ইনি হচ্ছেন কোলকাতার পুলিস বিভাগের খ্যাতনামা অফিসার—ইন্‌স্‌পেকটার গুপ্ত।

—নমস্কার।

—নমস্কার। আমাকে বিশেষ কারণেই দীপকবাবুর সাথে আপনার বাড়িতে আসতে হয়েছে।

—আমিও কারণ জানবার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।

—ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। এই দস্যু প্রলয়ের ব্যাপারটা আর কি !

হোহো করে হেসে ওঠেন রায়বাহাদুর শ্যামল সেন,—আমি ওকে অতটা ভয় পাই না। প্রায় বারো বছর আগে আমার একবার ওর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

—কিন্তু আপনি কি নিশ্চয় করে বলতে পারেন যে এ সেই দস্যু প্রলয় ?

রায়বাহাদুর হেসে বলেন,—আমিও সে বিষয়ে স্থির নিশ্চয় নই মিস্টার গুপ্ত। তা ছাড়া ওই চিঠিটা জাল প্রলয় না আসল প্রলয়ের লেখা সে বিষয়েও স্থির নিশ্চয় নই।

—তাহলে দীপকবাবুর শরণ নিলেন কেন ?

—সেটা অনেকটা ঘটনাচক্রের উপর নির্ভর করে বলতে পারেন, বিশেষ করে ওই গুলিটা লাগার পরে।

—আমাদের পুলিস মহলের ধারণা কিন্তু অন্য। তারা মনে করে এই প্রলয়ই সেই দস্যু প্রলয়।

—তাহলে অবশ্য ভয়ের কথা।

—হ্যাঁ, সেইজন্যে আমরা আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। এখানে আসবার আরও একটা কারণ আছে।

—যথা ?

—দস্যু প্রলয় পুলিস কমিশনারকে চ্যালেঞ্জ করে একটা চিঠি দিয়েছে যে আগামীকাল বেলা দশটার সময় সে আপনার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা নেবে।

রায়বাহাদুরের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করে।

সেদিকে দৃষ্টি রেখে মিঃ গুপ্ত বলেন,—আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করবো আপনার টাকা রক্ষা করবার। এ বিষয়ে আমার আর একটা প্রশ্ন করবার আছে।

—বলুন।

—আপনার কাছে কি এখন বিশ হাজার টাকা আছে?

—হ্যাঁ, ঠিক ওই পরিমাণ টাকাই আমি কাল ব্যাঙ্ক থেকে বাড়িতে এনে রেখেছি। কিন্তু ওরা তা জানলো কী করে?

মিঃ গুপ্ত হেসে বলেন,—সেটাই সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা। কোলকাতার পুলিস দল যা জানতে পারে না, এই দস্যু প্রলয়ের দল তা জানতে পারে কী করে?

বাধা দিয়ে দীপক বলে,—কিন্তু এটা আপনি ভুল কথা বললেন, মিস্টার গুপ্ত।

—কেন বলুন তো?

—কেন, প্রলয় তার চিঠিতেই তো সব কথা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছে যে সব ডিপার্টমেন্টে তার লোক আছে। অতএব ওই ব্যাঙ্কেও তার লোক থাকা কিছু অসম্ভব নয়। তাহলেই বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা কি। এই রহস্যের মূল সূত্র কোথায়?

—এবার বুঝলাম, মিস্টার চ্যাটার্জী।

—যাক এবার রায়বাহাদুরের সাথে কথাবার্তা শেষ করে ফেলুন, মিস্টার গুপ্ত।

মিঃ গুপ্ত এবার রায়বাহাদুর শ্যামল সেনের দিকে চেয়ে বলেন,—তাহলে কাল আপনার সমস্ত বাড়িতে আমরা পুলিস গার্ড দেবার ব্যবস্থা করে দেব। আর একটা চামড়ার ব্যাগে করে আপনার টাকা আমরা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে পাহারা দেব। দেখি কী করে দস্যু প্রলয় সেই টাকা নিতে সক্ষম হয়।

—বেশ তো! আপনারা কে কে থাকবেন?

—আমি আর দীপকবাবু তো থাকবই। তা ছাড়া থাকবে কোলকাতা পুলিস বিভাগের কয়েকজন নামকরা অফিসিয়্যাল। আর আর্মড্‌গার্ড যতগুলি সম্ভব রাখা হবে।

রায়বাহাদুর কয়েক মুহূর্ত কী চিন্তা করেন। তারপর বলেন,—তাহলে কী ফল হবে বলে আপনারা আশা করেন, মিস্টার গুপ্ত।

—তাহলে তো যা অসম্ভব বলে মনে করি, দেখি একজন সামান্য লোক কী করে তা সম্ভব করে। দেখাই যাক না কতদূর এদের ক্ষমতা।

রায়বাহাদুর আর কোন আপত্তি করেন না। তবে তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় তিনি যেন ওসব পুলিসের ঝামেলা পছন্দ করেন না।

সাত

পরদিন।

রায়বাহাদুর শ্যামল সেনের বিডন স্ট্রীটের বাড়িটা পুলিসের বিরাট বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে অদ্ভুত আকার ধারণ করেছে।

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করা ও বেরিয়ে আসা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। পুলিস প্রতিটি লোককে সার্চ করে নানা প্রশ্ন করে সন্দেহমুক্ত হয়ে তবে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে।

উপরের ঘরে দীপক ও মিস্টার জোন্স আর মিস্টার গুপ্ত এবং দুজন সশস্ত্র আর্মড্‌গার্ড টেবিলের উপর রাখা বিশ হাজার টাকার একটা চামড়ার ব্যাগের সামনে বসে আছে।

দীপক রায়বাহাদুরের দিকে চেয়ে বলে,—আজ পরীক্ষা হবে দস্যু প্রলয়ের শক্তি বেশী না পুলিস বাহিনীর শক্তি বেশী।

রায়বাহাদুর হেসে বলেন,—জানেন তো, একটা কথা আছে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। এও ঠিক তেমনি। যুদ্ধ হচ্ছে পুলিসের সাথে দস্যু প্রলয়ের, মাঝখান থেকে আমাদের মতো গরিবদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

মিঃ জোন্স বলেন,—আপনাদের এ বাড়াবাড়ি আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারছি না, মিস্টার গুপ্ত। সামান্য একটা ডাকাতের জন্য আপনারা সদলে তার জন্যে পাহারা দিতে এলেন।

মিঃ গুপ্ত হেসে বলেন,—প্রলয়ের অতীত ইতিহাস জানলে তাকে এমনি অবহেলা করতেন না, মিস্টার জোন্স।

—কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই জনসাধারণ এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকেরা আপনার এ কাজকে সমর্থন করবে না। তারা বলবে সামান্য একটা ডাকাতের ভয়ে সারা লালবাজারের লোক এসে জড়ো হয়েছে।

মিঃ গুপ্ত হেসে বলেন,—প্রলয় সম্পর্কে সব জানলে আপনার মনে সংশয় জাগত যে তার চ্যালেঞ্জ আমরা রাখতে পারব কি না।

মিঃ জোন্স রেগে উঠে বলেন,—এরকম ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স নিয়ে কাজ করলে চিরদিনই আপনাকে হার স্বীকার করেই যেতে হবে মিস্টার গুপ্ত।

—ভাল কথা, আপনি তো আজ রয়েছেন। আর আপনার যথেষ্ট সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সও আছে। দেখা যাক না কতদূর কী করতে পারেন। অবশ্য ভগবান যদি মুখ রক্ষা করেন তবে আপনার সুনামও বৃদ্ধি পাবে।

দীপক এদের দুজনের কথা কাটাকাটিতে বেশ আনন্দ উপভোগ করছিল—সে বলে,—কিন্তু নটা তো বেজে গেছে। আশা করা যায় আর একঘণ্টাও ভালো করে কাটবে।

ঢং ঢং......

বেলা ঠিক দশটা বাজল।

মিঃ গুপ্ত বললেন,—কী ব্যাপার? তাহলে সবটাই কি আমাদের বৃথা পরিশ্রম হল?

মিঃ জোন্স তার উত্তরে কী একটা অপ্রাসঙ্গিক রসিকতা করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল প্রচণ্ড শব্দ।

বুম্ বুম্......

সারা ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল দেখতে দেখতে। এক হাত দূরের জিনিসটাও দেখা যায় না।

ধোঁয়া সরে গেলে দেখা গেল টেবিলের উপর চামড়ার ব্যাগটা নেই!

মিঃ গুপ্ত বললেন,—সবই যে ঘটে গেল নিমিষের মধ্যে।

দীপক বলল,—স্মোক্ বম্বে এরা আমাদের বড্ড ধোঁকা দিয়েছে। কিন্তু আমি ভাবছি স্মোক্ বম্ব ওরা পেল কোথায়?

—দস্যু প্রলয় কি আর ওইগুলো তৈরির ফরমূলা জানে না ভেবেছেন?

—হয়তো জানে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এরা ভিতরে ঢুকল কোন্ পথে। দরজায় তো সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে।

মিঃ গুপ্ত মিঃ জোন্সের দিকে তাকিয়ে বলেন,—যান মিস্টার জোন্স এখন এই শেষ কাজটুকু করুন। কী করে প্রলয়ের লোক এখানে ঢুকল তার খোঁজ নিনগে যান।

মিঃ জোন্স নীচে নেমে আসেন। দীপক ও মিঃ গুপ্তও নেমে আসেন তাঁর সাথে সাথে।

মিঃ জোন্স প্রশ্ন করেন জনৈক পুলিস সার্জেন্টকে লক্ষ্য করে,—ভেতরে এদের লোক ঢুকল কেমন করে?

—এদের লোক? সে কী স্যার? পুলিস কমিশনার ছাড়া আর তো কেউ ওর ভেতরে যায় নি।

—কমিশনার সাহেব ?

—হ্যাঁ। তিনি ভেতরে গেলেন। তারপর শব্দ হতেই ভেতর থেকে

সারা ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। [পৃষ্ঠা ৩৩

বেরিয়ে এসে বললেন,—দস্যুরা কোথা থেকে বোমা ছুঁড়েছে তাই দেখতে যাচ্ছি। বলে তিনি চলে গেলেন। আর আসেন নি।

দীপক হোহো করে হেসে ওঠে কথাটা শুনে।

—হাসছেন কেন মিস্টার চ্যাটার্জী ?—মিঃ গুপ্ত প্রশ্ন করেন।

—হাসছি এদের ক্ষমতা দেখে। শেষ পর্যন্ত পুলিস কমিশনারের ছদ্মবেশে ওদের অনুচর ভিতরে ঢুকেছিল।

সকলে হতাশভাবে তাকায় পরস্পরের দিকে। মিঃ গুপ্ত খালি বলেন,—কাল কাগজগুলো লাফালাফি করবে এমন একটা মজার খবর নিয়ে। উঃ কী মারাত্মক ব্যর্থতা আমাদের বরণ করতে হল!

—আর রায়বাহাদুর ?—মিঃ জোন্স ফোড়ন কাটেন,—তাঁর এত টাকা এভাবে দস্যুর হাতে……

আট

এর পর তিন মাস চলে গেছে।

দস্যু প্রলয়ের কীর্তি-কাহিনী এরপর খবরের কাগজের পৃষ্ঠাকে অনেকবার অলংকৃত করেছে। পুলিস তার কোন কিনারা করতে না পেরে ও কেসের ভার ছেড়ে দিয়েছে।

কেবল হাল ছাড়ে নি দীপক চ্যাটার্জী। বহুবার আড্ডায় হানা দিয়ে প্রলয়ের কাছাকাছি এসেছে সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সব আয়োজন ব্যর্থ করে প্রলয় পালিয়েছে।

এরপর একদিন হঠাৎ প্রলয়ের অভিযান বন্ধ হয়ে গেল কোলকাতার বুকে। সে যে কোথায় অদৃশ্য হল তা কেউ জানতে পারল না।

ইতিমধ্যে আর একদিকে যে অদ্ভুত কতকগুলি ঘটনা ঘটল তা নিয়েই আমাদের গল্প মোড় ফিরছে নূতন আবর্তে—

রায়বাহাদুর অনাদি সোমের বাড়িতে সেদিন মহা হুলুস্থূল ব্যাপার। রায়বাহাদুরের শোবার ঘরের দরজার উপর বার বার করাঘাত শুরু হয়েছিল। কিন্তু ভেতর থেকে কোন উত্তর নেই।

চিৎকার। কোলাহল। অজস্র লোকের জটলা। পরামর্শ শুরু হল কী করে দরজা ভেঙে ফেলা যায়।

অনেকে চলল পুলিসে খবর দিতে।

এমন সময় ঘরের মধ্যে একটা জিনিস পড়ার শব্দ হল।

—কে? কে? দরজা খুলুন শিগগির……

বাইরে সকলে চিৎকার জুড়ে দিল।

দেওয়াল ঘড়িটা বাজল ঢংঢং করে। রাত এগারোটা বেজে গেল। দরজা ভেঙে ফেলবার জন্য দমাদম আঘাত শুরু হল দরজার উপর।

একজন ছুটে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলে,—হ্যালো—পুট মি টু লালবাজার পুলিস হেড্‌ কোয়ার্টারস্…

শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে একটা খবর—রায়বাহাদুর অনাদি সোম হঠাৎ তাঁর বন্ধ ঘরের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। তাঁর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

ঝম ঝম শব্দে বাইরে বৃষ্টি নামল। অঝোরে ঝরতে থাকে প্রকৃতির ধারা। ঘন ঘন মেঘের গর্জন। সোনালী বিদ্যুতের চকিত ইশারা।

বাড়ির লোকের মুহুর্মুহুঃ আক্রমণের ফলে মড়মড় শব্দে দরজা ভেঙে পড়ে।

সকলে ঘরের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে একসঙ্গে। সকলের কণ্ঠ একসঙ্গে ধ্বনিত হয়,—এ কি! এ যে অসম্ভব ব্যাপার!

ডাক্তারকে জরুরী কল দেওয়া হল।

ডাঃ বাসু রায়বাহাদুরের গায়ে হাত দিয়েই হতাশ মুখভঙ্গী করে বলেন,—হোপ্‌লেস্। হি ইজ স্টোন্ ডেড্। অনেকক্ষণ আগেই এঁর মৃত্যু হয়েছে।

মৃত্যু…

দুটি মাত্র অক্ষর।

অথচ এই দুটি অক্ষর সারা বাড়ির বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ডাঃ বাসু স্টেথিস্কোপটি পকেটে রেখে বললেন,—এটা অবশ্যই স্বাভাবিক মৃত্যু নয় বিশ্বম্ভরবাবু।

—তার মানে?—রায়বাহাদুরের বড় ছেলে বিশ্বম্ভরবাবু প্রশ্ন করেন।

—মানে অতি সাধারণ। রায়বাহাদুরকে হত্যা করা হয়েছে।

—হত্যা, মানে খুন?…

—হ্যাঁ মিস্টার সোম। দিস্ ইজ এ কোল্ড ব্লাডেড্ ডেলিবারেট হোমিসাইড…জানি না তাঁর এ মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

—তাহলে উপায়?

—পুলিসে জানান। আমি এ বিষয়ে স্বাভাবিক ডেথ্‌ সার্টিফিকেট দিতে পারব না।

ডাঃ বাসু টুপিটা তুলে মাথায় দেন। তারপর বলেন,—তাহলে আমি চলি বিশ্বম্ভরবাবু…

—বাবার মৃত্যুর কারণ কী তা তো বললেন না।

—পয়জনিং। বিষ দিয়ে এঁকে হত্যা করা হয়েছে।

—কোন্ উপায়ে?

—এই দেখুন কাঁধের ডান দিকে একটা চিহ্ন। এটা হচ্ছে জমাটবাঁধা একফোঁটা রক্তের দাগ। কী বিষ প্রবেশ করানো হয়েছে জানি না। পোস্ট মর্টেম করলে জানা যাবে।

ডাঃ বাসু বিদায় নেন।

বিশ্বম্ভরবাবু বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকেন ডাঃ বাসুর দিকে—তারপর বলেন,—আচ্ছা।

পাশের ঘরে গিয়ে তিনি পুলিসে ফোন করেন।

নয়

তারপর সেই চিরাচরিত প্রথায় তদন্ত শুরু হয়ে গেল। স্থানীয় থানার দারোগা মিঃ তালুকদার সংবাদ পেয়ে তাঁর জীপগাড়ি নিয়ে ছুটে এলেন। জোর তদন্ত শুরু হয়ে গেল। সারা বাড়িতে হইচই পড়ে গেল।

জবরদস্ত দারোগা বলে মিঃ তালুকদারের একটা সুনাম ছিল। তিনি তাঁর সুনাম বজায় রাখতে দলে দলে লোককে ধরে এনে জেরা করতে শুরু করে দিলেন। রায়বাহাদুরের মৃতদেহটা মর্গে পাঠানো হল।

রায়বাহাদুরের বড়ছেলে বিশ্বম্ভরবাবু মিঃ তালুকদারকে কী বলতে এসে ধমক খেলেন।

মিঃ তালুকদার বললেন,—যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হত তাহলে কিছু বলার ছিল না মশাই। কিন্তু এ হচ্ছে অস্বাভাবিক মৃত্যু। মানে সব কিছুর মধ্যেই একটা বিশেষত্ব আছে। আমাদের যা করবার তা আমাদের করতে দিন। আমাদের কাজের ক্ষতি হলে আপনারা তার কৈফিয়ত দিতে যাবেন না। শুনুন বিশ্বম্ভরবাবু, আগে বাড়ির সব লোককে এক এক করে জেরা করা

হবে তার পরে অন্য কথা। আমি চাই আজকের মধ্যে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে।

—সে তো খুব ভালো কথা। আমিও চাই আমার বাবার হত্যাকারী ধরা পড়ে উপযুক্ত শাস্তি পাক।

—তাহলে বুঝতে পারছেন duty first মশাই···তারপর অন্য কিছু।

বিশ্বম্ভর এ কথার অন্য কোন উত্তর দিতে পারেন না।

রায়বাহাদুরের চার ছেলে, তিন মেয়ে।

বড় দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে মেজজন শ্বশুরবাড়ি বর্ধমানে থাকে। অন্যজন থাকে বাবার কাছে। তার নাম শ্যামলী। স্বামীর নাম তপনকুমার। ছোট মেয়ে হ্যাপি অতি আধুনিকা। কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। এখনও বিয়ে হয় নি, তবে তার একজন সহপাঠী তার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে যাতায়াত করে। তার নাম বিমল।

চার ছেলের মধ্যে বড় বিশ্বম্ভর—বাবার কাজকর্ম দেখাশুনা করেন। রায়বাহাদুরের দ্বিতীয় অর্থাৎ মেজছেলে যদুনাথ দীর্ঘদিন আগে বাবার ব্যবসা দেখতে বোম্বাইতে থাকতে শুরু করেছিল। সে এখনও সেখানেই থাকে। সেজছেলে রাধানাথ বিলেতে গেছে উচ্চশিক্ষার জন্যে। মাঝে মাঝে তার প্রয়োজন মত টাকা পাঠাতেন রায়বাহাদুর। সম্প্রতি ওদেশ থেকে খবর এসেছিল, রাধানাথ নাকি ওদেশের একটা ফিরিঙ্গী মেয়েকে বিয়ে করবে ঠিক করেছিল।

কথাটা জানতে পেরে রায়বাহাদুর তাকে কড়া চিঠি লিখে সাবধান করে দেন। এ ধরনের খেয়াল খুশিকে যে তিনি মোটেই প্রশ্রয় দেন না, সে কথাই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

রাধানাথ তার উত্তরে লিখেছিল যে তার বাবার ধারণা ভুল। শীঘ্রই সে দেশে ফিরছে। তার পড়াশুনা শেষ হয়ে গেছে।

চিঠি লেখার পর মাসাধিক হয়ে গেছে কিন্তু রাধানাথ আর দেশে ফেরে নি। এমন কি তার কোন চিঠিও পান নি রায়বাহাদুর। এ ব্যাপারে তিনি একটু বেশ চিন্তিত ছিলেন।

ছোটছেলে অমল ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। ছোটবেলা থেকেই তার ছিল পলিটিক্সের নেশা। পলিটিক্সের আওতায় পড়ে অল্প বয়সেই যেসব ছেলেদের লেখাপড়া নষ্ট হয় অমল ছিল তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু লেখাপড়া সামান্য হলেও একটি গুণ তার ছিল। সে খুব ভাল বক্তা ছিল। দুবেলা খাওয়াদাওয়া ছাড়া বাড়ির সাথে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না।

দক্ষিণ কোলকাতার লেফটিস্ট পার্টির লোকেরা সকলেই অমলের নাম জানতো ভালো করে। বড় বড় লেফটিস্ট মিটিং জমতই না অমলের বক্তৃতা ছাড়া। দু-একবার খবরের কাগজেও তার ছবি ছাপা হয়েছে। একবার সে জেলেও গিয়েছিল তিনদিনের জন্য।

তবে রায়বাহাদুরের যেন কী একটা দুর্বলতা ছিল এই ছোটছেলের ওপর। যখনই সে দশ বিশ টাকা দাবি করত তখনই সে অভাব তিনি পূরণ করতেন।

অমল অবশ্য সামান্য কথায় করুণ বা সলজ্জভাবে টাকা চাইত না কোনদিনই। সে টাকা দাবি করত বলা যেতে পারে। সে বলত,—দেশের গরিব দুঃখীরা যখন খেতে পাচ্ছে না তখন অত টাকা নিয়ে বিলাস করার কোন অধিকার তোমার নেই। কাজেই কিছু টাকা পার্টিফণ্ডে এক্ষুনি দান কর।

এই ব্যাপার নিয়েই দিন দু-তিন আগে অমলের সাথে কিছুটা বচসা

হয়েছিল রায়বাহাদুরের। পার্টির বিশেষ একটা কাজে সে একশ টাকা চেয়েছিল রায়বাহাদুরের কাছে।

রায়বাহাদুর অমলের প্রস্তাব শুনে বেশ কিছুটা রাগান্বিত হয়ে ওঠেন। এর আগে ছেলের দু-একটা খেয়ালকে হয়ত তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু দিনে দিনে তার আবদার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাকে আর প্রশ্রয় না দিয়ে শাসন করা উচিত।

রায়বাহাদুরের সাথে অমলের এ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বচসা হয়। অমল তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে,—এরকম করলে ভবিষ্যতে তার অনিষ্ট হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

রায়বাহাদুর হাসিমুখে ছেলেকে বলেন,—এ বয়সে মাথাটা গরম থাকার জন্যে অনেকেই একথা বলে থাকে। তুমি পার্টির কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ি বসে থাক।

—আমি আপনার বাড়িতে থাকতে চাই না।

সেইদিনই অমল রায়বাহাদুরকে কোন কথা না বলে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তারপর অনেকদিন সে এবাড়ির দিকে পা বাড়ায় নি। এমনকি সে কোথায় থাকত সে কথাটাও রায়বাহাদুর জানতে পারেন নি।

তারপর রায়বাহাদুরের মৃত্যুর আগের দিন ভোরে হঠাৎ অমল এবাড়িতে এসে উপস্থিত হল। রায়বাহাদুর তার সঙ্গে কোন কথা বলেন নি—অবশ্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেও বলেন নি।

ছেলেমেয়ে ছাড়া রায়বাহাদুরের বাড়িতে থাকত তাঁর এক দূরসম্পর্কের ভাইপো বিলাস আর তার স্ত্রী কণিকা। কণিকার একটিমাত্র ছেলে—নাম অজিত। বয়স তার ষোলোর কাছাকাছি। রায়বাহাদুরের মেয়ে শ্যামলীরও একটি ছেলে আছে। তার নাম সরিৎ।

এছাড়া এবাড়িতে থাকে দুটি চাকর, দারোয়ান, ঝি অন্নদা, আর পাচকঠাকুর রঘুনাথ।

দশ

পরদিন বেলা আটটা।

টেলিফোনের ঘন ঘন আর্তনাদ প্রখ্যাত ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জীকে চঞ্চল করে তুলল। এত সকালে কে আবার তাকে বিরক্ত করছে।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে দীপক গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করে,—হ্যালো, চ্যাটার্জী স্পিকিং, আপনি কোত্থেকে কথা বলছেন?

—আমি মিস্টার গুপ্ত কথা বলছি।

—গুড্ মরনিং মিস্টার গুপ্ত। তারপর খবর কী?

—খবর খুব সিরিয়াস। রায়বাহাদুর অনাদি সোমকে কে বা কারা তাঁর ঘরের ভিতর হত্যা করেছে। পুলিস মর্গে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে জানা গেল যে, মৃত্যু হয়েছে বিষের ক্রিয়ায়।

—এ মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে কোন তথ্য কি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে?

—তা এখনও জানা যায় নি। এমনকি কীভাবে যে হত্যাকারী তাঁকে হত্যা করল তাও বোঝা যাচ্ছে না।

—তার মানে?

—মানে মৃত্যুর পর জানলা দরজা সব বন্ধ ছিল। জানলা দুটোতে মোটা গরাদে দেওয়া। দরজা দুটোই ভেতর থেকে বন্ধ। তবুও কী করে যে তাঁকে হত্যা করল এবং হত্যাকারী গা-ঢাকা দিল তা আদৌ বোঝা যাচ্ছে না।

—তাহলে ক্রমশঃ কেসটার ভিতর অনেক জটিলতা দেখে আপনারা ঘাবড়ে গেছেন আর শেষ পর্যন্ত আমার শরণাপন্ন হয়েছেন।

—কথাটা ঠিক। আমি আশা করি আমাদের যা কিছু ভুল হয়েছে এই তদন্তের বিষয়ে, আপনি তা নিশ্চয়ই সল্ভ্ করতে পারবেন।

—কিন্তু মিষ্টার গুপ্ত, এ কথাটা বোধহয় আপনার জানা আছে যে সমস্ত কাজের ভার আমার উপর ন্যস্ত করলে আমি তা গ্রহণ করি। তবে আমার প্রয়োজনে আমি আপনাদের সাহায্য নেব।

—সে কথা আমি ভালো করেই জানি মিস্টার চ্যাটার্জী। আপনি এক্ষুনি লালবাজার পুলিস হেডকোয়ার্টার্সে চলে আসুন। আমি আপনার সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। আর একটা কথা—

—কী কথা—বলুন।

—পুলিশ তরফ থেকে আমরা একটা রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছি। রায়-বাহাদুরের হত্যাকারীকে যে গ্রেফতার করিয়ে দেবে সে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে। আর আপনি এ কেসের তদন্তভার নিচ্ছেন বলে আপনার খরচ বাবদ এক হাজার টাকা অগ্রিম দেবার ব্যবস্থা করেছি।

—ওসব আবার কেন করতে গেলেন, মিস্টার গুপ্ত?

—এটা আমাদের ডিউটি।

—আচ্ছা, তাহলে আমি এক্ষুনি আসছি।

আধ ঘন্টা পর।

দীপকের গাড়ি এসে থামে লালবাজার পুলিস হেডকোয়ার্টার্সের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে গিয়ে মিঃ গুপ্তের সাথে দেখা করে দীপক। ও. সি. মিঃ তালুকদারও মিঃ গুপ্তের আহ্বানে লালবাজারে পুলিস হেড-কোয়ার্টার্সে এসে অপেক্ষা করছিলেন।

মিঃ গুপ্ত দীপকের সাথে মিঃ তালুকদারের পরিচয় করিয়ে দেন।

দীপক বলে,—কেসটার বিষয়ে মোটামুটি অনেকটা আমি মিস্টার গুপ্তের কাছে জানতে পেরেছি। এবার তদন্তের ব্যাপারে আপনি কতটা এগিয়েছেন তা জানতে চাই।

—মোটামুটি সাধারণ তদন্ত দ্বারা আমি এগিয়েছিলাম, মিস্টার চ্যাটার্জী। বাড়ির প্রত্যেকটি লোককে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু তবুও আসল খুনীর কোন হদিস পাই নি।

—আচ্ছা, দরজা বন্ধ থাকা অবস্থায়ও কী করে একজন লোকের মৃত্যু হল এরই রহস্যের সমাধান করতে পেরেছেন কি?

—আজ্ঞে না।

—প্রথমে কার ওপর আপনার সন্দেহ কেন্দ্রীভূত হল মিস্টার তালুকদার?

—রায়বাহাদুরের ছোটছেলে অমলই বোধ হয় হত্যাকারী।

—এ ধারণার কারণ?

—বাবাকে ইতিপূর্বে সে ভয় দেখিয়েছিল এবং ঠিক হত্যার আগের দিন সে বাড়ি ফিরে আসে।

—তা থেকেই কি প্রমাণ করতে পারেন যে সে হত্যাকারী?

—ঠিক তা নয়, মিস্টার চ্যাটার্জী। কিন্তু সন্দেহটা অনিবার্য কারণে ওর উপর এসে পড়ে না কী?

—কতকটা অবশ্য তাই। তা ছাড়া এসব ব্যাপারে সন্দেহের হাত থেকে কেউ রেহাই পায় না।

—আমি অবশ্য আর কাউকেই সন্দেহ করতে পারি নি।

—যাক সে কথা, রায়বাহাদুরের মৃত্যু সম্পর্কে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কি বলে?

—এই দেখুন পোস্টমর্টেম রিপোর্ট। মিঃ তালুকদার তাঁর জরুরী ফাইল থেকে রিপোর্টটা বের করে দিলেন।

দীপক পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটা বেশ ভালো করে দেখে—ইন্‌স্ট্যান্টানিয়াস ডেথ ডিউ টু দি ইন্‌জেকশান্ অফ্ স্ট্রং মেটালিক পয়জন্।

দীপক রিপোর্টটা মিঃ তালুকদারের হাতে ফেরত দিতে দিতে বলে,—রায়বাহাদুর কি মৃত্যুর আগে কোন উইল করেছেন?

—হ্যাঁ। তাঁর বিষয় সম্পত্তি তিনি তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। আজ বেলা দশটার সময় তাঁর অ্যাটর্নি মিস্টার চ্যাটার্জী উইলটা রায়বাহাদুরের আত্মীয়দের পড়ে শোনাবেন।

—তাঁরা এর আগে উইলের বিষয় কিছু জানতেন না?

—না, তাঁরা বলেছেন, তাঁরা এ বিষয়ে অজ্ঞ। তবে আসলটা যে কী তা আমি জানি না।

—তাহলে এক কাজ করতে হবে মিস্টার তালুকদার। আজ বেলা দশটার সময় আমাদের একবার রায়বাহাদুরের বাড়িতে যেতে হবে। উইলের বিষয় আমাদেরও জানা দরকার। আর তদন্তের ব্যাপারে ওই উইল আমাদের খুব সাহায্য করবে।

—বেশ আমি সেই ব্যবস্থাই করছি।

—ধন্যবাদ।

মিঃ গুপ্ত ও মিঃ তালুকদারের সাথে করমর্দন করে দীপক উঠে দাঁড়ায়।

এগারো

রায়বাহাদুরের পরিবারের সকলে এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকলেই হলঘরে জমায়েত হয়েছিল।

মেজছেলে ও মেজমেয়েই শুধু এঁদের সেই সভায় যোগ দিতে পারে নি। তাদেরও টেলিগ্রাম করা হয়েছে। দু-একদিনের মধ্যে তারা এসে পড়বে। সেজছেলে বিলাতে বাস করে বলে অনাবশ্যক ভেবে তাকে কোন খবর দেওয়া হয় নি।

অ্যাটর্নি মিঃ চ্যাটার্জী যথাসময়েই এ বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

মিঃ চ্যাটার্জী আসার সাথে সাথেই এ বাড়িতে একটা সাড়া পড়ে যায়। সকলেই একটু সন্ত্রস্ত ও চকিত হয়ে ওঠে।

দীপক জানে যে, এসব ক্ষেত্রে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে যে কোন অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে পারে। সে যথেষ্ট সতর্ক হয়ে প্রত্যেকটি লোকের গতিবিধি ও কার্যকলাপের ওপর নজর রাখছিল।

বিশ্বম্ভরবাবু সমস্ত আত্মীয়ের সাথে অ্যাটর্নি মিঃ চ্যাটার্জীর পরিচয় করিয়ে দেন। সবার শেষে মিঃ তালুকদার ও দীপকের সাথে তিনি পরিচিত হন।

তাদের দুজনকে দেখে তিনি বেশ সহজেই অনুমান করতে পারেন যে কেসটা বেশ জটিল। জটিলতাপূর্ণ মারাত্মক কেস না হলে পুলিস বিভাগের সঙ্গে খ্যাতনামা দীপক চ্যাটার্জী এখানে উপস্থিত থাকতেন না।

—আপনার সাথে আমার একটা কথা ছিল মিস্টার চ্যাটার্জী।—দীপক বলে।

—বলুন।

—যে সময়ে আপনি উইল পড়বেন, সে সময় বেশ একটু সাবধানে থাকতে হবে আমাদের।

—তা ত নিশ্চয়ই।

—আচ্ছা উইলের শর্তগুলি কী জানা আছে আপনার?

—না।

—কেন?

—উনি মৃত্যুর আগে একটা বড় লেফাপার ভিতর উইলটা পুরে সীলমোহর করে রেখেছিলেন। ওঁর মৃত্যুর আগে যাতে কেউ সেটা দেখতে না পার আমাদের উপর এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

—বুঝেছি। এতে আমাদের কাজের সুবিধাই হল।

—কেন?

—হঠাৎ উইলের শর্ত শুনে কার মনের উপর সেটা কিরূপ কার্যকরী হল সেটা বোঝা যাবে। যাকগে এবার আপনি উইলটা পড়তে শুরু করুন।

উইলটা খুলে মিঃ চ্যাটার্জী পড়তে শুরু করলেন:

আজ কয়েকদিন ধরে কে বা কারা আমাকে গোপনে হত্যা করবার চেষ্টা করছে। তাই মৃত্যুর আগে আমি ঘোষণা করছি, সেই অদৃশ্য আততায়ীকে যে গ্রেফতার করতে পারবে তাকে বিশ হাজার টাকা আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

এ ছাড়া আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যার দাম কম করে বিশ লক্ষ টাকার অনেক বেশী তা পাবে আমার দুই মেয়ে শ্যামলী ও হ্যাপি, ছেলে বিশ্বম্ভর ও ভাগনে তপন। এই চার ভাগে ভাগ করা হবে। আর মৃত্যুর আগে আমি যে ত্রিশ হাজার টাকা দামের রক্তহীরা তৈরি করেছি, যা শোবার ঘরে সিন্দুকে রয়েছে—

গুড়ুম! গুড়ুম!

রিভলভারের শব্দ আর ধোঁয়া।

ঝনঝন করে সার্সির কাঁচ ভেঙে গেল।

রিভলভারের শব্দে মিঃ চ্যাটার্জী উইল পড়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন,—কী ব্যাপার মিস্টার চ্যাটার্জী?

—ব্যাপার অতি সাধারণ,—দীপক হাসতে হাসতে বলে,—একটি ছায়া জানলার ওপার থেকে এ ঘরের প্রতিটি কথা শুনছিল। প্রতিটি কার্যকলাপের উপর নজর রাখছিল। আমি গুলি করবার পূর্ব্বেই সে মাথাটা নীচু করে নিয়ে এ যাত্রা আমার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

—কিন্তু ছায়ার পেছনে আসল কায়াটি কার?

—আই অ্যাম ইন দি ডার্ক, মিস্টার চ্যাটার্জী। তবে মনে হয় এ বাড়িরই কোন লোক।

—কিন্তু বাড়ির সব লোক তো এখানেই। আর যারা আসে নি তারা তো থাকে অনেক দূরে।

—কিন্তু আমি definite, মিস্টার চ্যাটার্জী, সে নিশ্চয় এ বাড়িটির প্রতিটি অংশের খবর রাখে।

—বাট হাউ?

—সেটা আমি জানি না। যাকগে তার আগে একটা বড় কাজ আছে। উইলের শেষ অংশে যে রক্তহীরার কথা আছে সেটার বিষয়ে কী করা যেতে পারে বলুন।

—কিন্তু সেটা কোথায়? এ বাড়ির সব তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার কোন সন্ধান পাই নি।—বললেন বিশ্বম্ভরবাবু।

—সিন্দুক থেকে হীরা উধাও হয় নি নিশ্চয়ই।

—না, সিন্দুকে যে এটা থাকতে পারে তা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু সিন্দুক এখনও খোলা হয় নি।

—তবে চলুন, আগে সেটা দেখে আসি।

সকলে মিলে রায়বাহাদুরের ঘরে গিয়ে সিন্দুক খুলে হতবাক্ হয়ে যায়। সিন্দুকে কোন হীরা পাওয়া যায় না।

এবার দীপক বলে,—হীরেটা যে সরিয়েছে সেই যে খুনী একথা আমি বলছি না তবে আমি আপনাদের বেশ কিছুটা সময় দিচ্ছি, আপনারা ইচ্ছে করলে হীরেটা আবার স্বস্থানে রেখে আসতে পারেন। আমি তাকে একটা সুযোগ দিতে চাই। তাই আজ আপনারা কেউ এ ঘরে যাবেন না দয়া করে।

আর একটা কথা। রায়বাহাদুরের মৃত্যুর পর আপনারা যাঁরা এ বাড়িতে ছিলেন তাঁরা কেউই তদন্ত শেষ হবার আগে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন না। যদি

কেউ চলে যান তবে তিনি যে খুনের সঙ্গে জড়িত এটাই প্রমাণিত হবে। আশা করি বিনা কারণে কেউ মিথ্যা সন্দেহকে নিজের সঙ্গে জড়িত করতে চাইবেন না। তাহলে এবেলার মত আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

দীপক উঠে দাঁড়ায়। সকলে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দীপক দ্রুত বেরিয়ে যায় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা জীপ গাড়িটার দিকে।

দীপকের নজর হঠাৎ আটকে যায় গাড়ির দিকে। সেখানে একটা সাদা কাগজ পিন দিয়ে আঁটা।

কাগজে স্পষ্ট হরফে লেখা ঃ

প্রিয় ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী,

সত্যি আপনার অসাধারণ বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির তারিফ করি। আপনি হীরা চোরকে ধরবার জন্য অনেকটা এগিয়েছেন। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে শেষবারের মত সাবধান করে দিচ্ছি। এই নিয়ে আর যদি এগোবার চেষ্টা করেন তবে আপনি ভীষণ বিপদে পড়বেন।

মনে রাখবেন এটা হচ্ছে আমার আলটিমেটাম্।

আশা করি কোন্ পথে চলতে হবে সেটা স্থির করবার মত বুদ্ধি আপনার আছে। ইতি—

আপনার পুরোনো বন্ধু।

চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে দীপক বলে,—যত সব রাবিশ!

—আপনি ঠিকই বলেছেন মিস্টার চ্যাটার্জী।—মিঃ তালুকদার বলেন।

দীপক মৃদু হেসে বলে,—এ ক্রিমিন্যাল খুবই চতুর লোক সন্দেহ নেই—কিন্তু সে ভুলে গেছে যে আমিও রহস্যভেদী দীপক চ্যাটার্জী।

বারো

বেলা পাঁচটার সময় দীপকের শেভ্রোলে মোটর এসে দাঁড়াল রায়বাহাদুরের বাড়ির সামনে। পরপর দুবার হর্ন বাজাবার পর একজন চাকর এসে সেলাম জানাল।

—বিশ্বম্ভরবাবু কোথায়?

—তিনি একটু বাইরে গেছেন।

—আর সবাই?

—চায়ের টেবিলে।

কথা শেষ হতে না হতেই রায়বাহাদুরের ছোটছেলে অমলকে দেখা গেল সেখানে।

—একি, দীপকবাবু যে, তারপর আপনার কাজ কতখানি এগোলো?

—অনেকখানি।

—তাই নাকি? হীরা চোরকে ধরতে পেরেছেন?

—পারি নি, তবে মোটামুটি আন্দাজ করেছি।

—আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল দীপকবাবু।

—জানি।

—চলুন তবে একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে আমাদের কথাবার্তা শেষ করি।

বাগানের ঘাসের উপর বসে দুজনে কথা শুরু করে।

—এবার তাহলে শুরু করুন অমলবাবু।

—হ্যাঁ, প্রথম থেকেই আরম্ভ করছি আমি। দীপকবাবু, আমি আপনার কাছে স্বীকার করছি আমিই সেই লোক—যে হীরাটা চুরি করেছিল।

—আপনি?

—হ্যাঁ।

—আর আপনার বাবার হত্যাকারী?

—জানি না আমি। সব জানালা দরজা বন্ধ অবস্থায় আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম, বাইরে থেকে দরজার চাবি খুলবার যন্ত্রের সাহায্যে দরজা খুলে।

—কিন্তু কেন দরজা খুলেছিলেন?

—হীরেটা চুরি করবার জন্যেই।

—বেশ, তারপর?

—আমি চাবির ফাঁক অর্থাৎ keyhole দিয়ে দেখতে পাই যে, বাবা মেঝের উপর পড়ে আছেন। কিন্তু এটা যে একটা দুর্ঘটনা তা বুঝতে আমার দেরি হয় না। আমার তখন ভীষণ অবস্থা। যেমন করেই হোক টাকার যোগাড় আমাকে করতেই হবে। তবে আমি ঠিক এই সুযোগটাকে কাজে লাগালাম।

কিন্তু আপনার এত বেশী টাকার প্রয়োজন হল কেন?

—তাহলে অনেক কথাই বলতে হয় দীপকবাবু—আমি একটা পলিটিক্যাল পার্টিতে থাকতাম। বাবা এ বিষয়ে আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন। কিন্তু টাকার ব্যাপারে তিনি তেমন মুক্তহস্ত ছিলেন না। আমাদের একটা নতুন পলিটিক্যাল মুভ নেবার ব্যাপারে আমি দুশো টাকা সাহায্য করবার প্রতিশ্রুত হই।

কিন্তু বাবা আমাকে একশো টাকাও দিতে রাজি হলেন না। তখন আমি রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গিয়ে কয়েকদিন এক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। ভাবলাম বাবা আমার অভিমান ভেঙে দিয়ে আমাকে সাহায্য করবেন।

কিন্তু তা যখন হল না তখন আমি নতুন কোন আশ্রয় না পেয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে।

—আপনার সে অদ্ভুত যন্ত্রটি কোথায় পেলেন?

—সেটি বাবার গোপন সেল্‌ফে ছিল। বাবার অনুপস্থিতিতে তাঁর সিন্দু থেকে টাকা সরাবার মানসে আমি সেটা সরিয়ে ফেলি।

—তাহলে আপনি ভেতরে ঢুকে সিন্দুক থেকে হীরেটা নিয়ে দরজা ব করে দিয়ে বেরিয়ে আসেন?

—আপনি ঠিকই ধরেছেন।

—আপনার বাবার মৃত্যুর বিষয়ে জানাজানি হল তার কতক্ষণ পরে?

—আমি ছুটে গিয়ে বড়দাকে বললাম যে, বাবার ঘর থেকে একটা শ শুনতে পেয়েছি। ভয় পেয়ে বাবার নাম ধরে ডেকেও কোন সাড়াশব্দ পাই নি। তারপর সকলে ছুটে এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকল।

—কিন্তু পিছনের দরজার কথা কেউ ভেবে দেখেন নি কেন?

—কারণ সেটাও বন্ধ ছিল বলে কেউ ধারণা করতে পারে নি যে, এটা খুনে কেস হতে পারে।

—কিন্তু একটা কথা অমলবাবু। আপনার আগে একজন লোক যা বাহাদুরকে খুন করে পালাল কোন্ পথে?

—তা অবশ্য আমি বুঝতে পারছি না।

—আর একটি কথা—হীরেটা এখন কোথায়?

—আমি সেটা আমার ঘরের দেরাজে এনে লুকিয়ে রাখি। আজ সক থেকে সেটা খুঁজে পাচ্ছি না।

—খুঁজে পাচ্ছেন না?

—না। তন্ন তন্ন করে সব খুঁজলাম। কিন্তু সেটা যেন কর্পূর হয়ে হাওয় মিলিয়ে গেছে।

—কিন্তু আপনার এ কথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না।

—তা আমি জানি। কিন্তু বিশ্বাস করুন যা সত্য তাই আপনাকে সব খুলে বললাম।

—নাথিং মোর?

—না, আর কিছু আমার বলবার নেই।

দীপক উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে,—দেখা যাক, এর পর কত দুর কী করতে পারি। হীরে চোর আর খুনী যে একই লোক, তা আমি আগে আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু প্রথমবারের হীরে চোর যে আপনি তা বুঝতে পারি নি।

—আর দ্বিতীয় হীরে চোর?

—তাকে খুঁজে বের করতেও আমার খুব বেশী দেরি হবে না, অমলবাবু। হি উইল বি কট্ রেড-হ্যাণ্ডেড্। আচ্ছা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি অমলবাবু। আশা করি সত্য উত্তর দেবেন।

—বলুন।

—খুনী বলে এ বাড়ির কাউকে আপনার সন্দেহ হয়।

—সঠিক করে বলতে পারি না। তবে আমার মনে হয় এ বাড়িরই কেউ এই খুনের সঙ্গে জড়িত।

—আপনাকে আর একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে?

—বলুন।

—হত্যাকারী ধরা না পড়া পর্যন্ত আপনার সাহায্য দরকার হলে আপনি আমাকে সে সাহায্য করবেন।

—করব।

দীপক আর কথা বলে না, নীরবে কী যেন চিন্তা করে।

তেরো

চায়ের টেবিলে সকলকেই পাওয়া গেল—এক বিশ্বম্ভরবাবু ছাড়া। শোনা গেল, তিনি গেছেন অ্যাটর্নী মিঃ চ্যাটার্জীর সাথে কোন জরুরী বিষয় আলোচনা করতে।

সকলেই দীপককে অভ্যর্থনা জানায়।

হ্যাপি বলে,—দীপকবাবু, এদিকের খবর শুনেছেন তো?

—খবর?

—হ্যাঁ, বড়বউদির ঘরে একটা কাঁচের সিরিঞ্জ পাওয়া গেছে।

—কোথায় সেটা? এখনি সেটা নিয়ে আসুন। ওটা ভালো করে কেমিক্যাল অ্যানালিসিস্ করে দেখতে হবে। আমার মনে হয় ওতে বিষ পাওয়া যাবে।

মিঃ তালুকদার বলেন,—ওটা বিশ্বম্ভরবাবুর ঘরে গেল কেমন করে?

দীপক মৃদু হেসে বলে,—খুনী মাঝে মাঝে বড্ড কাঁচা কাজ করে ফেলেছে।

—কেন বলুন তো?

—খুনী ভেবেছে ওটা বিশ্বম্ভরবাবুর ঘরে রেখে তার ওপর আমাদের নজর আকর্ষণ করবে।

—কেন, তা কি সম্ভব নয়?

—আদৌ নয়।

—কেন?

—বিশ্বম্ভরবাবু সত্যি খুনী হলে বোকার মত সিরিঞ্জটা নিজের ঘরের মেঝেয় ফেলে রাখতেন না।

—তাও তো বটে।

—আসলে এটা হচ্ছে খুনীর বড় রকমের একটা ধাপ্পা।

এমন সময় হ্যাপি সিরিঞ্জটা নিয়ে ফিরে আসে। দীপকের হাতে সেটা তুলে দিয়ে বলে,—আপনার সাথে আমার একটা গোপন কথা আছে দীপকবাবু।

...এদিকের খবর শুনেছেন তো? [পৃষ্ঠা ৫৪

—বেশ চলুন ওপাশের ফাঁকাটায় যাই। মিস্টার তালুকদার আমি এক্ষুনি ফিরছি।

বাগানে দুজনে পাশাপাশি বসে।

হ্যাপি প্রথমে কথা শুরু করে,—আমার কিন্তু একটা সন্দেহ হচ্ছে দীপকবাবু। আমার মনে হয় ছোড়দাই বাবাকে খুন করেছে।

—আপনার এ সন্দেহের কারণ?

যেদিন বাবা মারা যান সেদিন ছোড়দাকে আমি বাবার ঘরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলাম। তাকে সেদিন কেমন উত্তেজিত বলে মনে হয়েছিল।

—আচ্ছা, উইল অনুযায়ী উনি যে সম্পত্তি পাচ্ছেন, তা কি উনি জানতেন?

—তা ঠিক করে বলতে পারি না। তবে জানাও কিছু অসম্ভব নয়। আর তখন ছোড়দা টাকার জন্যে যেরকম ডেসপারেট্ হয়ে পড়েছিল তখন তার হীরে চুরি করাও কিছু অসম্ভব নয়।

—কিন্তু তা থেকেই মনে হয় না উনি রায়বাহাদুরকে হত্যা করেছেন। আর তা ছাড়া হীরেচোর আর খুনী যে এক ব্যক্তি নয় তা আমরা জানতে পেরেছি। আপনার আর কিছু বলবার আছে?

—না।

হ্যাপির কথাগুলো হেসে উড়িয়ে দিলেও মনের মধ্যে একটা কথা খচখচ করতে লাগল।

ঘটনাচক্রে যা দাঁড়াচ্ছে তা আসল অপরাধী এই বাড়ির মধ্যেই কেউ। কিন্তু সে কে?

সবকিছু ঘটনার জট্ দীপকের মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল করে দেয়।

হ্যাপিকে চায়ের টেবিলে পাঠিয়ে দীপক আপন মনেই বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটা গাছের পাশ দিয়ে যেতেই হঠাৎ শিকড়ে পা বেধে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

…এক ঝলক আগুনের স্রোত বয়ে গেল। [পৃষ্ঠা ৫৮

এভাবে পড়বার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার উপর দিয়ে যেন এক ঝলক আগুনের স্রোত বয়ে গেল।

একটা অজানা হাতের পিস্তলের গর্জন শোনা গেল—গুড়ুম!

দীপক নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। আচমকা পা পিছলে পড়ে না গেলে সে এ যাত্রা রক্ষা পেত কিনা সন্দেহ।

দীপক পকেট থেকে নিজের পিস্তলটা বের করে সামনের ঝোপটার দিকে তুলে ধরে ফায়ার করল।

প্রচণ্ড শব্দ!

দীপক সামনের ঝোপের ভিতর ঢুকে নাক বরাবর ছুটতে লাগল।

ঝোপ-ঝাড়, বন-বাদাড় পেরিয়ে সে ছুটল। বহুদূরে দেখা গেল একটা দেহ একটি পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল।

বাড়ির সকলেই সেখানে এসেছিল।

মিঃ তালুকদার চিৎকার করে উঠলেন,—কী ব্যাপার, মিস্টার চ্যাটার্জী?

—ব্যাপার সামান্যই।—দীপক হাসতে হাসতে বলে,—আর একটু হলেই পৃথিবীর মায়া কাটাচ্ছিলাম আরকি! নেহাতগাছের শিকড়ে বেধে পড়ে গিয়েই…

—কিন্তু কে সে?

—হাতেনাতে না ধরলে বলা যাচ্ছে না। তবে অনুমান একটা করেছি এবং কথা দিচ্ছি বেঁচে থাকলে অর্থাৎ শত্রুর গুলিতে প্রাণ না দিলে আজই এ রহস্যের কিনারা করব।

—ধন্যবাদ!

সকলে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

দীপক অমলের দিকে চেয়ে বলে,—আজ রাতে আমি আপনাদের বাড়িতেই থাকব এতে আপনাদের কারও কোন আপত্তি নেই তো—

—না না, এখনি আমরা আপনার থাকবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

চোদ্দ

সেদিন সকাল থেকেই আকাশ ছিল ঘনঘটাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরছিল অঝোরে।

চিন্তাযুক্ত দীপক চুপচাপ ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাড়ির চারপাশে। সে বিনা কারণে ঘুরছিল না। সে হত্যাকারীর পায়ের ছাপ পাবার আশা করছিল।

কিন্তু তার চেষ্টা সফল হয় না। ভিজে ঘাসের উপর পায়ের ছাপ তেমন ভালো ভাবে ওঠে না।

দীপক আপন মনেই চিন্তায় তলিয়ে গিয়েছিল, এমন সময় যেন কোত্থেকে ফিসফিস শব্দ শুনতে পায়। দুজন লোক বোধহয় ঝোপের ভিতর দাঁড়িয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে কী বিষয়ে আলোচনা করছিল।

কে এরা দুজন? কী বিষয়ে আলোচনা করছে? দীপক উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

একজন বলে,—আগে থেকে আমাদের একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। তা যখন হয় নি তখন মিথ্যে চিন্তে করে লাভ কী?

অন্যজন বলে,—হীরেটা নেবার ইচ্ছে আমার আদৌ ছিল না।

—এটার দাম কত জান?

—দাম যতই থাক—কিন্তু বিক্রি করা তো এখন মহা মুশকিল।

—তা তো বটেই কিন্তু এটা এখন রাখি কোথা?

—ও আলোচনা পরে করা যাবে। এখন এদিকের কী করা যাবে দীপক চ্যাটার্জীকে তো শেষ করতে পারলাম না। এত তাড়াতাড়ি এক অ্যাটেম্‌ট্ নেওয়াই আমাদের ভুল হয়েছে।

—কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। ও আমাদের বিষয়ে কতটা জানতে পেরেছে?

—যতটাই পারুক আমাদের বিপদে ফেলবার মত কিছুই সংগ্রহ করতে পারে নি।

—বোধহয় তা পারবেও না কোনদিন।

কথা শেষ হয়।

দীপক ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঝোপের মধ্যে দিয়ে এরা সন্তর্পণে সরে যায়, দীপক এদের দেখতে পায় না।

এতক্ষণে দীপকের সন্দেহ দূর হয়। হত্যাকারী আর দ্বিতীয় হীরেচোর একই লোক।

সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও হীরার কোন সন্ধান মেলে না।

অবশেষে দীপক এসে দাঁড়ায় লাইব্রেরি ঘরে। অজস্র বই সাজানো রয়েছে বড় বড় আলমারিতে। দালানের গায়ে পাশাপাশি লাগানো বড় বড় আলমারিগুলো।

দীপক জানে এখানে হয়ত সে হীরেটা সে খুঁজে পাবে না। কিন্তু তবুও ঘণ্টা তিন চার ধরে সমস্ত আলমারি সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

বিমল, নিরুপমা, অমল, হ্যাপি ইত্যাদি সকলেই দীপকের কাজ দেখে অবাক্ হয়ে যায়।

হ্যাপি বলে,—দীপকবাবু যে হীরেটা নিয়েই মেতে উঠলেন বলে মনে হচ্ছে।

দীপক বলল,—হীরেটা হস্তান্তরিত না হলে হয়ত এতটা চিন্তিত হতাম না আমি। কিন্তু—

—হীরে হস্তান্তরের সঙ্গে বাবার মৃত্যুর কী সম্পর্ক ?

—সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে। আমার মনে হয় চোরের উপর দ্বিতীয়বার বাটপাড়ি যে করেছে সেই প্রকৃত হীরেচোর।

—আপনার ধারণার কারণ ?

—কারণ কিছুই নেই। তবে অনেকটা ইনট্যুইশান বলতে পারেন। পৃথিবীর অনেক বড় বড় মিস্ট্রি সল্ভ্ হওয়ার মূলে রয়েছে ওই ইনট্যুইশান বা অনুভবশক্তি।

—তা আমিও জানি। কিন্তু অপরাধতত্ত্বের ব্যাপারেও যে ইনট্যুইশানের দাম আছে তা সত্যই জানতাম না দীপকবাবু।

দীপক কোন কথা বলে না। তাকে কেমন যেন গম্ভীর বলে মনে হয়। কিন্তু তার এই গাম্ভীর্যের আড়ালে যে অন্য কোনও চিন্তা তার মনে খেলা করছিল, তা বেশ ভালো ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন মিঃ তালুকদার।

লাইব্রেরি ঘরে খোঁজাখুঁজি করে দীপক বলল,—আর হীরেটা পাবার আশা করা দুরাশা। এখন যে সামান্য সার্চ বাকী আছে তা খাবার পরই শেষ করা যাবে।

খাওয়াদাওয়া সেরে দীপক গেল শোবার ঘরে। কিন্তু বিছানায় শুয়ে চুপচাপ সময় কাটাবার ছেলে দীপক চ্যাটার্জী নয়।

গভীর রাত্রি।

বাড়ির প্রত্যেকটি প্রাণী নিথর নিদ্রার কোলে নিঃশব্দে ঢলে পড়েছে।

প্রত্যেকটি ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কারও কোন চিন্তা বা উদ্বেগ নেই যেন।

একটি মানুষ কিন্তু এই ঘুমের রাজ্যের মধ্যে থেকেও অনেক চিন্তা বুকে নিয়ে কাটিয়ে চলেছে রাত্রির প্রহর।

ঢং ঢং......

রাত দুটো বেজে গেল। দূরে থেকে কোন একটা ঘড়িতে দুবার শব্দ তুলে জানিয়ে দিল সঠিক সময়।

লাইব্রেরি ঘরের একটা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে একটা লোক যেন ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে।

একজন লোক যেন ধীরে ধীরে এদিকে এগিয়ে আসছে না। ছায়ামূর্তিটিকে দেখা গেল লাইব্রেরির সামনে।

অতি সন্তর্পণে, পায়ে পায়ে ধীরে ধীরে লোকটি প্রবেশ করল লাইব্রেরি ঘরে।

তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সব সময় একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠছে যেন।

এক মিনিট……

লোকটা একটা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে কী একটা জিনিস বইগুলোর আড়ালে লুকিয়ে রাখছে।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। একবার ভালো করে দেখে নিল, শরীরের সঙ্গে সংলগ্ন রিভলভারটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা।

না, আর কোন চিন্তা নেই তার। রিভলভারটি স্থানচ্যুত হবার কোনও আশঙ্কা নেই আর। এবার সে সেটা হাতে নিয়ে এক লাফে ঘরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে এসে দাঁড়াল।

—হ্যাণ্ডস্ আপ, মাই ফ্রেণ্ড—তোমার লীলাখেলা আজ শেষ।

—কে? ছায়ামূর্তি নড়ে উঠল।

—উঁহু, এতটুকু নড়বার চেষ্টা করলে মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠবে মনে রেখো। ছায়ামূর্তি কী যেন ভাবে। তারপর নিজেই সুইচ টিপে আলোটা জ্বালে, বলে ওঠে—একি দীপকবাবু, আপনি হঠাৎ কী মনে করে?

দীপক দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে রায়বাহাদুরের দূরসম্পর্কের ভাইপো বিমল।

পনের

গোলমালের শব্দে বহু লোক এসে ঘরের মধ্যে জড়ো হয়েছিল। দীপক সকলের দিকে ভালো করে চেয়ে বলে,—আপনারা সকলে চলে যান এখান থেকে। আমার সাথে মিস্টার তালুকদারের একটু বিশেষ কথা আছে।

কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পারে না।

প্রত্যেকেই আপন আপন ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

দীপক ধীরে মিঃ তালুকদারকে বলে,—মিস্টার তালুকদার, এই নিন আপনার আসামী—রায়বাহাদুরের হত্যাকারী। অমলবাবু যে হীরা চুরি করেছিল তাও আবার তার হাত থেকে হস্তান্তরিত হয়েছিল। তার জন্যেও দায়ী এই ব্যক্তি।

—কিন্তু এ কে?

—ইনিই হচ্ছেন আপনাদের স্বনামধন্য, ত্রাস সৃষ্টিকারী দস্যু প্রলয়।

—দস্যু প্রলয়!

—হ্যাঁ। তার নাম শোনেন নি? কিছুদিন আগে যার কীর্তিকলাপ খবরের কাগজের পৃষ্ঠাগুলোকে বড় বড় হরফে অলংকৃত করেছিল—

—মনে পড়েছে বটে।

—ইনিই সেই দস্যু। আর বিমল হল ওর ছদ্মনাম।

—থ্যাঙ্ক ইউ। সত্যিই আপনার ক্ষমতা আমাকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে মিস্টার চ্যাটার্জী।

পরদিন সকাল।

ড্রইংরুমে সকলে জড়ো হয়েছিল দীপকের কাছ থেকে কাহিনীটা সম্পূর্ণ শোনবার জন্যে।

দীপক ধীরে ধীরে শুরু করে:

দস্যু প্রলয় হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসে। আসল ভাগনে আর ভাগনে-বউ বর্তমানে বর্মাতেই আছেন। কিন্তু এরা এমন অভিনয় করেছিল যে, কেউ সন্দেহ মাত্র করতে পারে নি।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে রায়বাহাদুর এদের সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন। তাই তাঁকে প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হল।

হ্যাপি এবার বলে, —দীপকবাবু, ওর স্ত্রীটিও কি দস্যু ?

—না, ভাড়াকরা মেয়েছেলে। ওর খুব বেশী শাস্তি হবে না।

এমন সময় হঠাৎ ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে ওঠে।

—হ্যালো, কে কথা বলছেন ?

—লালবাজার পুলিস হেডকোয়ার্টার্স থেকে…

—কি ব্যাপার ?

দস্যু প্রলয় পালিয়েছে! হঠাৎ কীভাবে যে তালা খুলে পালাল তা বোঝা যাচ্ছে না। হয়ত তার দলের কেউ তাকে রেসকিউ করে নিয়ে গেছে।

দীপক হেসে বলে,—পুলিস হেডকোয়ার্টার্সে তার লোক আছে কিনা তাই বা কে জানে!

রিসিভার নামিয়ে রাখে দীপক।

মনে মনে ভাবে—সত্যিই কি জাদু জানে এই দস্যু প্রলয় ?

এমন সময় একখানা প্রজাপতি আঁকা চিঠি তার সামনে এসে পড়ে।

তাতে লেখা :

প্রিয় ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী—

আপনার বুদ্ধির তারিফ করছি আবার। কিন্তু আপনার সাথে আমার আবার দেখা হবে। প্রলয়ংকর রূপ নিয়েই এবার আবির্ভূত হব। দেখব কার বুদ্ধি বড়।

আর একটা কথা বিশ্বাস করলেন তো যে, আমার লোক সর্বত্র। জেলের গারদেও আমাকে আটকে রাখা যায় না।

যাক আজকের মত এখানেই শেষ করছি। কার্যক্ষেত্রে আবার দেখা হবে। ইতি—

দস্যু প্রলয়।

—শেষ—

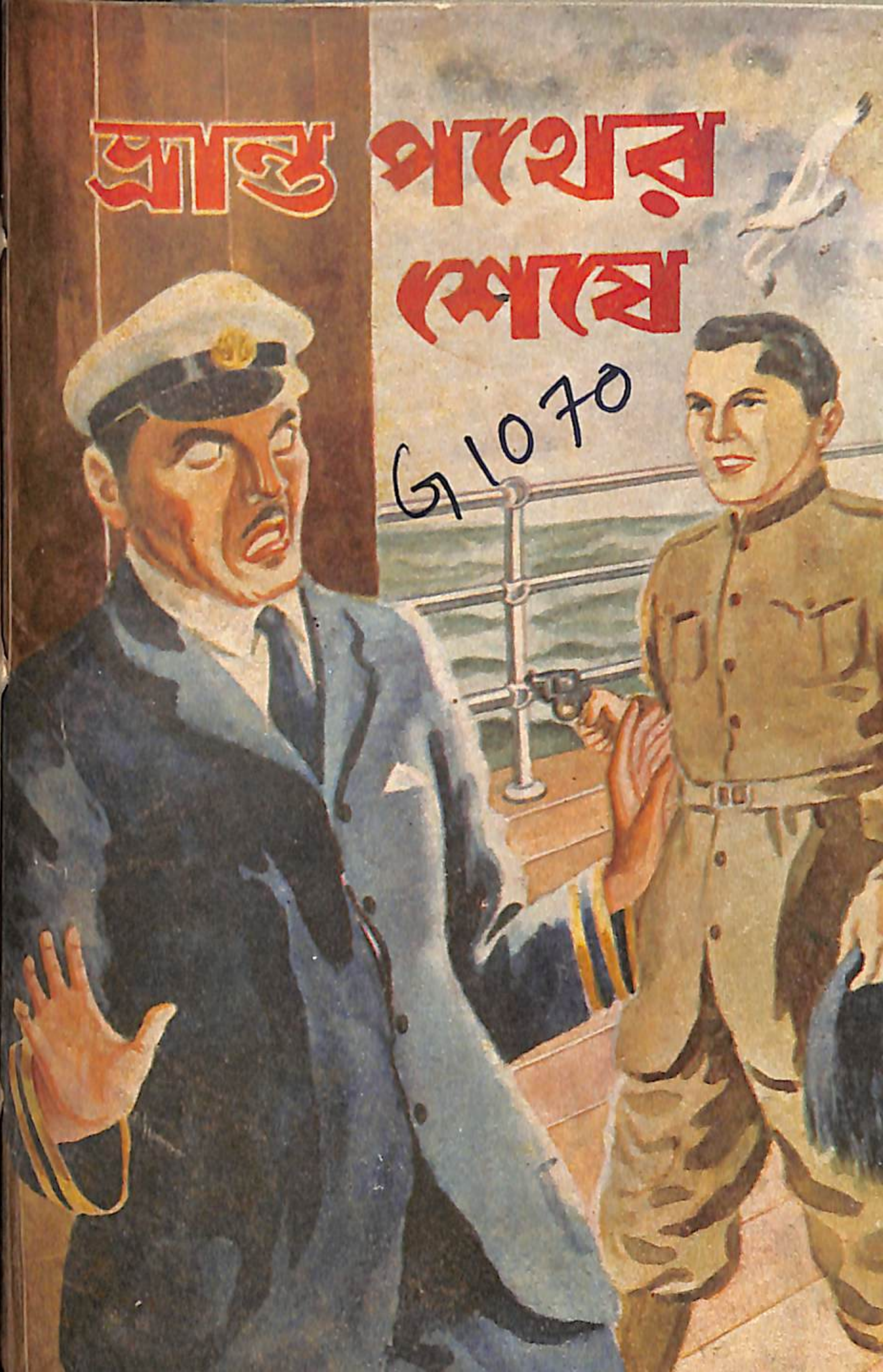

কলেজ ষ্টুডেন্টদের জন্য—

বিশ্ব-চক্র সিরিজের তৃতীয় বই

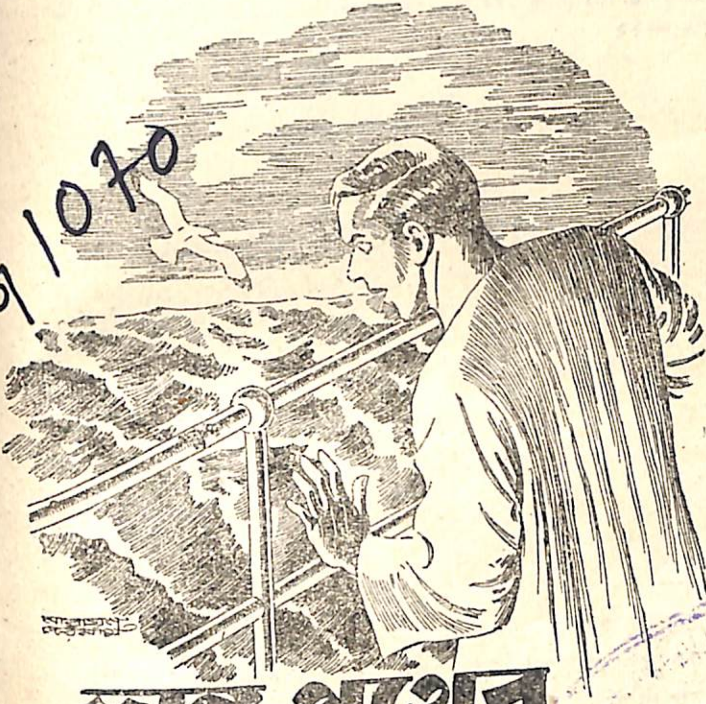

ভ্রান্ত পথের শেষে

শ্রীস্বপন কুমার

বিশ্ব সাহিত্য প্রকাশনী

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার
বিশ্ব-সাহিত্য প্রকাশনী
৬৮, কলেজ স্ট্রীট্,
কলিকাতা—১২

আষাঢ়
১৩৭২
৬

ছেপেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট্ লিমিটেড,
৬৮, কলেজ স্ট্রীট্,
কলিকাতা—১২

দাম—
৬০ পয়সা

Barthakur Home Library.
Jhanji P.O.
Sibsagar
Assam.

উপহার

ভ্রান্ত পথের শেষে

—এস্ এস্ মালাবার—

ঝক্ ঝক্…ঝক্ ঝক্…

ফেনা ভেঙে, তরঙ্গ তুলে, রাত্রির নিকষকালো আঁধার-ভরা বুককে সার্চলাইটের তীব্র আলোকরেখার আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়ে এগিয়ে চলেছে এস্ এস্ মালাবার। এই বিরাট যাত্রীবাহী জাহাজখানি বোম্বে থেকে এসে পৌঁছেছিল কল্‌কাতায়। তারপর রেঙ্গুন হয়ে সিঙ্গাপুরে গিয়ে হবে এর যাত্রাপথের শেষ।

জাহাজের অধিকাংশই ডেকের আরোহী। ডেকের আরোহীদের সংখ্যা সর্বসমেত প্রায় সাড়ে চারশো। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। মাত্র তিনজন প্রথম ও চারজন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর চারজনের মধ্যে দুজন যাত্রীকে দেখা গেল ডেকে দাঁড়িয়ে সাম্‌নের নীল সাগরের দিকে পরিপূর্ণ চোখ মেলে চেয়ে থাকতে।

এই দুজন আসলে আমাদের পরিচিত ডিটেকটিভ্ দীপক চ্যাটার্জী আর তার সহকর্মী ও বন্ধু রতনলাল।

ওদের দুজনকে হঠাৎ এই জাহাজে উপস্থিত দেখে আপনারা বিস্মিত হতে পারেন। কিন্তু বিস্ময়ের কিছু নেই। জরুরী কারণে বাধ্য হয়েই এদের দুজনকে এই জাহাজে করে সিঙ্গাপুর অবধি যেতে হচ্ছে। ভারত গভর্ণমেন্টের প্রায়

পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ এই জাহাজের একটি সেফ্ ভল্টে করে সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খবরটা অবশ্য সাধারণের কাছে অজ্ঞাত। কিন্তু গভর্ণমেন্টের কাছে পুলিশের ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে খবর এসেছিল যে দুজন বিখ্যাত দস্যু এই খবরটা পেয়ে এই জাহাজে চড়ে সিঙ্গাপুরের দিকে যাত্রা করবে এই স্বর্ণ লুণ্ঠন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। সেইজন্যেই স্পেশ্যাল দুজন মিলিটারী সার্জেণ্ট যদিও সেফ্ ভল্টের সাম্‌নে দিবারাত্র পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তবুও গভর্ণমেন্ট থেকে বিশেষ অনুরোধ করে প্রখ্যাত ডিটেকটিভ্ দীপক চ্যাটার্জী ও রতনলালকে পাঠান হয়েছে এই স্বর্ণের উপর বিশেষ নজর রাখবার জন্যে।

রাত ন'টা বাজল।

আকাশে শুক্লানবমীর চাঁদ।

তার ছড়িয়ে-পড়া আলো সাগরের নীল ঢেউগুলোর মাথায় মাথায় ছড়িয়ে পড়ে সাগরের বুককে অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে।

মৃদু জোলো হাওয়ায় দূর হয়ে যায় শরীরের সমস্ত ক্লান্তি।

অনুকূল পরিবেশের জন্যে এই ভ্রমণটা রতনলালের খুবই ভাল লাগছিল। সে মুগ্ধদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সুবিশাল জলরাশির দিকে তাকিয়ে থেকে একবার বলে উঠল—বাঃ, সিম্প্‌লি চার্‌মিং। কয়েক ঘণ্টা আগে ছিলাম কল্‌কাতার জনকোলাহলময় পরিবেশে, আর এখন নিঃসীম নীল সাগরের অগণিত ঢেউ গুণতে গুণতে চলেছি কোন্ অনির্দেশের পথে।

দীপক হেসে বলল—সাগরের সংস্পর্শে এসে তুই যে কবি হয়ে উঠলি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমরা কবি নই, আমাদের কি কাজ সেটা যেন সব সময় মনে থাকে!

রতন বলল—তাই বলে শুধুমাত্র কাজ…

ক্রিং ক্রিং ক্রিং…

রতনের কথা শেষ হবার আগেই দূরে খাবার ঘণ্টা বেজে ওঠার শব্দ শোনা গেল।

দীপক বলল—আর কবিত্ব করে কাজ নেই। ওদিকে খাবার ঘণ্টা বাজল শুনতে পাচ্ছিস্ ত? চল্ যাওয়া যাক্ গে।

রতন বলল—চল্। এত শীঘ্র সময়টা যে কিভাবে কেটে গেল তা' বুঝতে পারছি না।

রতনের কথা শেষ হতে না হতেই দীপক দূরে ডাইনিং রুমের দিকে গমনরত একজন লোকের দিকে রতনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল—এই যে ভদ্রলোকটি যাচ্ছেন ওঁকে চিনতে পারিস্?

রতন বলল—পরিচয় এখনও হয়নি। তবে শুনেছি রেঙ্গুনের একজন বিরাট ধনী লোক। ফার্স্ট্ ক্লাশের যাত্রী।

—কার কাছে শুনলি?

—জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গেও ওঁর আলাপ আছে কিনা, তাই—

—বাঃ, ভেরী গুড্! এর মধ্যেই সব খবর নিতে সুরু করেছিস দেখছি। শুধু কাব্য নিয়েই মেতে নেই!

রতন হেসে বলল—তোর কাছে আমি বুঝি চিরদিন এম্‌নি অকর্মাই থাকব?

দীপক বলল—না, তবে খবরের সবটা এখনও জানতে পারিস্‌নি কিনা তাই বলছি।

রতন বলল—সে কি?

দীপক বলল—শুধু বড়লোক শুনে লাভ কি? কি কাজ করেন, নাম কি, আসল নিবাস কোথায়—এ সব খবর প্রত্যেক যাত্রীর সম্বন্ধেই নিতে হবে।

রতন বলল—অতটা অবশ্য…

দীপক হেসে বলল—তবে শোন। আমি ওঁর সম্বন্ধে অনেকটা খবর ব…

দিতে পারি। উনি বর্মার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। তবে ব্যবসা যে কি তা জানে না কেউ। নাম শোনা গেল—অনঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার। মানে দক্ষিণ-ভারতের লোক—বর্মায় শুধু ব্যবসা করেন এই মাত্র। কিন্তু এর আগে ওঁকে যেন কোথায় দেখেছি। কোথায় সেটাই এখনো মনে করতে পারছি না। কি ঝামেলা বল্ তো!

কথা শেষ হতে না হতেই একটা খালাসীশ্রেণীর লোককে দেখা গেল হঠাৎ একটা থামের আড়াল থেকে বের হয়ে একপাশে সরে যেতে।

দীপক চুপ করে গেল।

রতনও অবাক হয়ে গিয়েছিল খানিকটা। লোকটা চলে গেলে বলল—কি ব্যাপার বল্ তো! লোকটা কি আমাদের কথা শুনছিল নাকি?

দীপক গম্ভীরভাবে শুধু বলল—বোঝা যাচ্ছে না। তবে শিকারী কুকুরের মত চোখ সব সময় খোলা রাখতে হবে—বুঝলি?

নিঃশব্দে তারা দুজনে ডাইনিং রুমে গিয়ে উপস্থিত হলো।

অনঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার নামে ভদ্রলোকটি দীপকদের আগেই এসে খেতে বসেছিল। দীপকরা গিয়ে বসল তারই ঠিক পাশে। খেতে খেতে একসময় হঠাৎ সে দীপকের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—সেদিন ক্যাপ্টেন মুলার সাহেব আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ কথাবার্তা হলো না।

দীপক হেসে বলল—হ্যাঁ, সেদিন একটু ব্যস্ত ছিলাম।

অনঙ্গস্বামী বলল—ও, আপনিও তবে আমার মতই ব্যবসায়ী?

—কি করে বুঝলেন?

—ব্যবসার ইংরাজী নাম হলো 'বিজিনেস্'—মানে যাতে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাই না?

দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল।

অনঙ্গস্বামী বলল—যাচ্ছেন কতদূর?

—আপাতত রেঙ্গুন। তবে প্রয়োজন হলে সিঙ্গাপুর অবধি যেতে পারি, কারণ সেটা নির্ভর করছে কাজের ব্যবস্থার ওপর। আপনি ত বোধ হয় রেঙ্গুনেই নামবেন?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি আপনাকে?

—নিশ্চয়ই। কি কথা বলুন।

—আপনাকে যেন আগে কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না।

অনঙ্গস্বামী হেসে বলল—অনেককে না দেখলেও হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন অনেকদিনের চেনা। ওটা কিছু নয়……

দীপক অন্যমনস্কভাবে বলল—কিন্তু অতটা ভুল অবশ্য……

মাঝপথেই কথা বন্ধ করে দীপক উঠে পড়ল। তার খাওয়াও শেষ হয়ে গিয়েছিল ততক্ষণে।

দুই

—মাঝরাতের আঁধারে—

রাত তখন দুটো।

সারা জাহাজ ঘুমিয়ে পড়েছে নিথর নিদ্রার কোলে।

সন্ধ্যার মুখোমুখি যে একখণ্ড গাঢ় কালো মেঘ জমে উঠেছিল দক্ষিণ দিগন্তে, ধীরে ধীরে তা আচ্ছন্ন করেছে সারা আকাশটাকে নিবিড় কালিমায়।

ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলকানি।

শোঁ শোঁ শব্দে চলেছে দামাল হাওয়ার উদ্ধত দুরন্তপনা।

খট্ খট্ খট্......

মিলিটারী বুটের শব্দ।

জাহাজের ওপর ঠিক স্ট্রং রুম ভল্টের সামনে পায়চারী করছে দুজন নির্ভীক সার্জেণ্ট। জীবনে বহুবার তারা দুরন্ত বিপদের মুখে নিজেদের দুঃসাহসিকতা প্রমাণ করে গভর্ণমেন্ট থেকে আজ এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হবার গৌরব অর্জন করেছে।

খট্ খট্ খট্...

চলেছে অবিশ্রান্ত পায়চারী। অনন্তকাল ধরে যেন চলতে থাকবে তাদের এই দুঃসাহসিক, দৃঢ় কর্তব্যনিষ্ঠা।

মহাকালের রোজনামচায় দুজন চিরন্তন নায়ক যেন।

জাহাজ কাঁপছে বাতাসের দোলায়।

শন্ শন্......শন্ শন্......শো-ও-ও-ও...

অবিশ্রান্ত চলেছে দুরন্ত বাতাসের মাতামাতি।

নিজের কক্ষে বসে একমনে কাজ করে চলেছেন ক্যাপ্টেন মূলার। স্ট্রং রুমের দরজায় যে দুজন প্রহরী আছে তাদের ওপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস।

কিন্তু মাঝরাতের অখণ্ড আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে যে দুজন লোক মার্জারের মত লঘুপায়ে ধীরে ধীরে এসে দুদিক থেকে প্রহরী দুজনের দুপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল সেদিকে খেয়াল ছিল না কারো।

কে জানে, কি এদের দুজনের সত্যিকারের পরিচয়?

প্রহরী দুজন নিজেদের মনে পায়চারী করে চলেছে। যান্ত্রিক পদক্ষেপ। একটানা কাজ চলেছে তাদের!

কিন্তু......

তাদের এই কাজ করবার অবকাশ আর বেশিক্ষণ মিলল না। পেছন দিক থেকে আকস্মিকভাবে দুজনে কাদের দ্বারা যেন আক্রান্ত হলো ঠিক একই সময়ে।

তাদের সে আকস্মিক আক্রমণ ক্ষুধার্ত বাঘের চেয়েও অনেক বেশি হিংস্র জিঘাংসায় পূর্ণ।

আঃ......

কাতর শব্দ। করুণ গোঙানী।

ধীরে আবার তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যায়।

তারপর চারিদিকে আবার বিরাজ করতে থাকে অখণ্ড নীরবতা।

বাইরের জোলো বাতাসের একঘেয়ে করুণ দীর্ঘশ্বাসের আড়ালে সে শব্দ সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়।

ঝপ্ ঝপ্......

ছুটি শব্দ শুধু।

জাহাজের রেলিং টপকে ওপারের নিঃসীম নীল সাগরের বুকে আশ্রয় গ্রহণ করে ছুটি নির্ভীক সৈনিকের প্রাণহীন দেহ। পৃথিবীর বুকে তাদের এই আত্মদানের সাক্ষী রইলো না কেউ।

আততায়ী দুজন প্রহরী দুজনের পোষাক আর রাইফ্‌ল্‌ দুটো আগেই ছিনিয়ে নিয়েছিল।

এবার তারা দুজনে সজ্জিত হয় নবসাজে। হিংস্র মুখের ওপর যেন চাপা পড়ে দুটি নিরীহ লোকের মুখোস।

আবার চলে পায়চারী—খট্‌ খট্‌ খট্‌।

জাহাজের বুকের ওপর শুধু পড়ে রইলো দুফোঁটা টক্‌টকে তাজা রক্ত এই হিংস্র ঘটনার করুণ সাক্ষ্য বহন করবার জন্যে।

ঠিক এমনি সময়ে একটা বেতারবার্তা পেলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন মিঃ মুলার।

বার্তা আসছে কলকাতা পুলিশ বিভাগ থেকে। পুলিশের বিশেষ বিভাগ জানতে পেরেছে যে দুজন দুর্ধর্ষ দস্যু এস্‌ এস্‌ মালাবারের বুকে আত্মগোপন করে চলেছে গভর্ণমেণ্টের পাঁচ লক্ষ টাকা দামের সোনা অপহরণ করবার জন্যে।

ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে পড়ে ক্যাপ্টেন মুলারের মুখ।

তাঁর মনে শুধু একমাত্র প্রশ্ন—কে এই দুজন দুরন্ত দস্যু? সত্যিই যদি তারা এই জাহাজে থাকে, তবে তাদের ছদ্মবেশ ধারণের কৌশল অপূর্ব, সন্দেহ নেই।

বেতারবার্তা ভেসে এলো : এই দুজন দস্যুর একজন হচ্ছে বিখ্যাত বার্মিজ দস্যু লিউসিন আর অন্যজন হচ্ছে তারই সহকারী সিন্‌ফো।

আশ্চর্য! নিজের মনেই ভাবতে থাকেন মিঃ মুলার। ধীরে ধীরে কপালের ঘাম মুছে ফেলেন তিনি।

তিন

—রতনলালের বিস্ময়—

বেশ একটু অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভেঙে যায় রতনলালের।

খুব ভোরে ওঠা তার বহুদিনের অভ্যাস। ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে রতন বেরিয়ে পড়ে ডেকের উদ্দেশ্যে। ডেকের ওপর বেড়িয়ে একটু সামুদ্রিক বাতাস উপভোগ করেই সে প্রাতর্ভ্রমণের কাজ শেষ করবে স্থির করেছিল।

আগের রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে কয়েক পশলা। শীত-শীত বোধ হচ্ছিল রতনের। বেরোবার সময় সে কোটটা গায়ে চাপিয়ে নিলো।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিন ছেড়ে হাল্কা পায়ে সে ডেকের দিকে এগিয়ে চলল।

মাঝপথে স্ট্রং রুমের সাম্নে পায়চারী করছিল প্রহরী দুজন। রতনকে দেখে একজন হঠাৎ ভক্তিভরে স্যালুট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তাকে কেন প্রহরীটি এভাবে স্যালুট করল তা রতন কিছুতেই বুঝতে পারল না। সে কেমন করে জানবে তার পরিচয়?

—তুমি আমাকে স্যালুট করলে কেন? রতন প্রশ্ন করল সেই প্রহরীটির দিকে চেয়ে।

প্রহরীটি ভাঙা হিন্দীতে যা বলল তার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে দেখেছে ক্যাপ্টেন সাহেব পর্যন্ত হুজুরকে সমীহ করে। তার থেকেই সে বুঝেছে যে হুজুর একজন বড় আদমী। তাই সে স্যালুট করল।

প্রহরীর বুদ্ধি দেখে রতন অবাক হলো।

কিন্তু প্রহরীটির কণ্ঠস্বর একটু ভারী লাগছে কেন? রতন প্রশ্ন করল—তোমার গলার স্বরটা একটু ভারী বলে আমার মনে হচ্ছে কেন?

প্রহরী বলল—ক'দিন একটানা খাটুনীর ফলে তার শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে। কাল থেকে সর্দি লেগেছে। সেজন্যেই গলাটা একটু ভারী—

রতন নিশ্চিন্ত মনে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

কিন্তু অদ্ভুত এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল রতনের জন্যে। বাঁ দিকের কোণটা যেখানে ঘুরতে হয় সেখানে জাহাজের ডেকের ওপর ফোঁটা ফোঁটা কালো রক্ত শুকিয়ে আছে।

রতন এগিয়ে গেল রেলিংয়ের ধারে। লোহার রেলিংয়ের ওপরেও এক-ফোঁটা রক্তের দাগ।

তবে কি কাউকে আঘাত করে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে? কিন্তু কে এই ভয়ানক কাজ করতে পারে?

রতনের মাথার চুলগুলো পর্যন্ত উত্তেজনায় যেন খাড়া হয়ে উঠল। দ্রুত-পদে সে ফিরে চলল কেবিনের দিকে।

হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে প্রহরীদের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল সে—আচ্ছা, ওখানে যে রক্ত জমে আছে দেখলাম তা এলো কোত্থেকে বলতে পার?

প্রহরী লম্বা স্যালুট ঠুকে বলল—আজ্ঞে না হুজুর।

—কাল রাতে কোনও শব্দ শুনেছিলে তোমরা?

—আজ্ঞে কোনও শব্দই ত আমরা শুনিনি।

রতন কথা না বাড়িয়ে ফিরে চলল কেবিনের দিকে। দীপককে জাগিয়ে এক্ষুণি কথাটা জানাতে হবে তাকে।

কিন্তু আরও একটা বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল রতনলালের জন্যে।

কেবিনে প্রবেশ করবার ঠিক আগেই তার দেখা হলো ক্যাপ্টেন মুলারের সঙ্গে। হন্ হন্ করে তিনি কেবিনের দিকে এগিয়ে আসছিলেন।

—কি ব্যাপার মিঃ মুলার? এত ভোরে যে ঘুম থেকে উঠেই হন্ হন্ করে আমাদের কেবিনের দিকে?

—হ্যাঁ, জরুরী ব্যাপার। মিঃ চ্যাটার্জী কি ঘুম থেকে উঠেছেন নাকি?

—না।

—কিন্তু এদিকে সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেছে। কাল রাতে মেসেজ এসেছে দুর্দান্ত বার্মিজ দস্যু লিউসিন আর তার সহকারী নাকি ছদ্মবেশে এই জাহাজের বুকে আশ্রয় নিয়েছে।

—সেকি?

—হ্যাঁ, কাল রাত প্রায় আড়াইটের সময় খবরটা পেলাম। কিন্তু কে এই ছদ্মবেশী লিউসিন?

—আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না বটে, কিন্তু নতুন একটা ঘটনার কথা জানাতে পারব আপনাকে।

—কি ব্যাপার রতনবাবু?

—ডেকের ওপর দেখলাম কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ। রেলিংয়ের ওপরেও দেখলাম তেমনি শুকনো রক্ত। নিশ্চয়ই কাল রাতে কাউকে আহত অবস্থায় সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় আমার।

—কি আশ্চর্য! আমার জীবনে কখনও কোনও জাহাজের বুকে এ ধরণের ঘটনা ঘটতে শুনিনি। বিনা কারণে কোন্ হতভাগ্যকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করল?

—খবর নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে মিঃ মুলার। কিন্তু সেটা সুসংবাদ নয়—দুঃসংবাদ।

চার

—ঘটনাচক্র—

দীপকের কথায় বাধা সৃষ্টি করে মিঃ মুলার বললেন—না মিঃ চ্যাটার্জী, আপনার এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

দীপক বলল—আমার কথার ওপর আপনার এই ধরণের অবিশ্বাস জন্মাবার হেতু?

—আমি এই ঘটনার পর তন্ন তন্ন করে জাহাজ অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু তবুও এমন কাউকেই দেখতে পাইনি যাকে সন্দেহ করা চলে।

—আপনি কি করে বলবেন যে, মেসেজ্‌টি মিথ্যা?

—সেটাই ঠিক বুঝতে পারছি না।

—লিউসিনকে আপনি তাহলে আজও চিনতে পারেন নি মিঃ মুলার।

—লোকটা নিশ্চয়ই মায়াবী নয়।

—মায়াবী নয়, তবে যাদুকর।

—কিন্তু যাদুবিদ্যার প্রভাবে আর যাই হোক্, সবার চোখের সাম্‌নে অদৃশ্য হয়ে থাকা যায় না।

—সে ত অদৃশ্য হয়ে নেই।

—সেকি?

—আমি ঠিকই বলছি।

—তবে সে কোথায়?

—সে আমাদের মধ্যেই ছদ্মবেশে অবস্থান করছে। কিন্তু আমরা তাকে সঠিক ধরতে পারছি না।

—কিন্তু কি করে আপনি এতটা নিঃসন্দেহ হলেন?

—কারণ আমি জানি সে কোথায় আছে।

—তাই নাকি?

—অবশ্যই।

—তবে এতক্ষণ তাকে ধরেননি কেন?

—কারণ প্রমাণ পাইনি। তাছাড়া প্রথমটা তাকে সঠিক চিনতেও পারিনি।

—বেশ এবার তবে বলুন সে কে?

—একটা প্রশ্নের উত্তর দিন আগে। আপনি কি সকালে মিঃ আয়েঙ্গারের ঘরে গিয়েছিলেন?

—না, তাঁর ঘরে যাবার প্রয়োজন নেই। তাঁর মত বিখ্যাত লোকের কাছে...

—বিখ্যাত তিনি বটে, তবে আসল মিঃ আয়েঙ্গার আর এই ভদ্রলোক এক লোক নয়।

—বিশ্বাস করি না। এতবড়ো একটা—

—হ্যাঁ, মিষ্টার মূলার, আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। বেশ, আমার সঙ্গে আপনি মিঃ আয়েঙ্গারের কক্ষে আসুন।

—কিন্তু মিথ্যা ওঁকে বিরক্ত করা—বেশ, আপনি যখন বলছেন তখন চলুন যাওয়া যাক্।

কেবিনের সাম্‌নে পৌঁছে দীপকরা দেখল কেবিন ভেতর থেকে তালাবদ্ধ। দীপক কড়াটা ধরে নাড়ল। কিন্তু কোনও শব্দই ভেসে এলো না।

বাধ্য হয়ে দীপক ও মিঃ মূলার পাশের জানালায় গিয়ে দেখতে পেলেন

জানালাটাও ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক কষ্টে তখন দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়লেন মিঃ মূলার।

কিন্তু ঘরের মধ্যে বিরাট এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তাঁদের জন্যে। কেবিনের মধ্যে পা দিয়েই তাঁরা দেখতে পেলেন সেখানে কোনও জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। অনঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার যেন হঠাৎ তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র পর্যন্ত নিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেছেন।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কারও মুখে কথা পর্যন্ত ফুটল না।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লে নিয়ে মিঃ মূলার বললেন—এতক্ষণে বুঝতে পারছি কাল রাতে কাকে জাহাজের রেলিং গলিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

দীপক প্রশ্ন করল—কিন্তু ওতে আততায়ীর লাভ কি, মিঃ মূলার?

—সেটা অনুমান করা আর এমন শক্ত কি! উনি একজন এতবড় ব্যবসায়ী লোক। নিশ্চয়ই ওঁর কাছে প্রচুর অর্থাদি ছিল। ওই দস্যুরা কোনওভাবে খবর পেয়ে তাঁর যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছে।

—তাহলে দস্যুরা যে এ জাহাজেই আছে তা স্বীকার করছেন ত? হাসিমুখে প্রশ্ন করে দীপক।

—সেটা ত মেসেজ্ পেয়েই বুঝতে পারছি। শুধু বুঝতে পারছি না তারা কোথায় আত্মগোপন করে আছে। এ জাহাজে এমন কোনও গুপ্তস্থানই নেই যা আমার অজ্ঞাত।

—কিন্তু একথাও আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারেন না মিঃ মূলার যে দস্যু লিউসিন এই জাহাজেই আছে।

—তা আমি অস্বীকার করি না মিঃ চ্যাটার্জী, কিন্তু কে যে সেই ছদ্মবেশী দস্যু......

মিঃ মুলারের কথায় বাধা দিয়ে দীপক বলল—সেটাই আপনাকে আরও ভাল ভাবে অনুসন্ধান করতে হবে মিঃ মুলার। আর তার ওপরেই নির্ভর করছে জাহাজের নিরাপত্তা। ভুলে যাবেন না পাঁচ লক্ষ টাকার সোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন এর ওপর।

হেসে মিঃ মুলার বললেন—অত সহজে ভয় পাবেন না মিঃ চ্যাটার্জী। যে ভল্টে সেই সোনা রাখা হয়েছে তার দরজা এমন শক্ত ইস্পাতের তৈরী যে একটি হাতী দিয়ে টানা হলেও তা ভাঙ্গবে না। আর তার চাবিটাও এমন গুপ্ত জায়গায় রেখেছি যে আমি ছাড়া অন্য কারও সাধ্য নেই যে সেটি খুঁজে বের করে।

—কিন্তু আপনার জীবনও ত বিপন্ন হতে পারে মিঃ মুলার!

—ইংরেজরা ভয় কাকে বলে তা কোন দিনই জানে না মিঃ চ্যাটার্জী।

—তবুও যতটা সম্ভব সাবধান থাকা উচিত। কথায় বলে, সাবধানের মার নেই।

মিঃ মুলার একটু ভেবে বললেন—আচ্ছা, ভল্টের সামনে গভর্ণমেণ্টের যে দুজন লোক পাহারা দিচ্ছে এদের ছাড়া আরও দুজন অতিরিক্ত লোক রাখলে কেমন হয়?

দীপক বলল—তাতে ওরা দুজন রাগ করতে পারে। ওরা হয়ত মনে করবে যে ওদের ওপরে সন্দেহ করেই আমরা দুজন নতুন লোককে নিযুক্ত করলাম। তার চেয়ে এক কাজ করলে ভাল হয়।

—কি কাজ বলুন।

—ওদের বলা হোক্ যে ওদের দুজনকেই দিনরাত ওখানে পাহারা দিতে হচ্ছে। তার চেয়ে যদি আপনার দুজন লোক ওদের সঙ্গে দেওয়া

হয় তা হলে ওদের কাজের চাপ অনেক কমে যাবে। একজন শুধু দিনের বেলা পাহারা দিতে পারবে—অন্যজন রাতের বেলা। প্রত্যেকের সঙ্গে আপনার লোক একজন করে থাকবে সব সময়।

—হ্যাঁ, এ যুক্তিটা অবশ্য সত্যিই ভাল। যদিও আমি ততটা ভয় পাইনি, তবুও যতটা সম্ভব সাবধানতা এখন থেকেই আমাদের অবলম্বন করা উচিত।

মিঃ মুলার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবার জন্যে দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

পাঁচ

—দস্যু লিউসিনের চিঠি—

সেদিন বিকেল।

দীপক ধীরে ধীরে স্ট্রং রুমের সাম্‌নে গিয়ে উপস্থিত হলো চারদিক বেশ ভাল করে পর্যবেক্ষণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে একটা জিনিস দেখে সে একটু অবাক্ হলো। সে দেখল স্ট্রং রুমের সাম্‌নে তিনজন লোক পাহারায় নিযুক্ত।

ক্যাপ্টেনের নিযুক্ত যে লোকটি সে দীপককে সেলাম করল। অন্য দুজন চুপচাপ পূর্ব্ববৎ পাহারা দিয়ে চলল নিশ্চল প্রহরীর মত। দীপক বুঝতে পারল যে ওরা দুজনে সবসময় একত্র পাহারা দিতে কৃতসংকল্প। একজনের পরিবর্তে ওরা কেউই স্থানত্যাগ করতে রাজী নয়।

ক্যাপ্টেনের লোকটির দিকে চেয়ে দীপক প্রশ্ন করল—তুমি কখন থেকে এখানে পাহারা দিচ্ছ?

লোকটি বলল—বেলা দশটা থেকে। সন্ধ্যার পর আমার বদলে অন্য একজন লোককে এখানে রাখা হবে।

দীপক এগিয়ে যাচ্ছিল। লোকটি তার দিকে চেয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে হুজুর।

দীপক বলল—কি কথা বলতে পার।

লোকটি দীপককে সঙ্গে নিয়ে একপাশে সরে গেল। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলল—এই প্রহরী দুজনের গতিবিধিটা আমার ভাল লাগছে না হুজুর।

অবাক হয়ে দীপক বলল—কেন?

লোকটি বলল—ক্যাপ্টেন বলা সত্ত্বেও ওরা কেউই বিশ্রাম নিতে রাজী হলো না। বলল, আমরা দুজনে দিবারাত্র পাহারা দিতেই থাকব।

দীপক বলল—সে হয় ত নিরাপত্তার জন্যেই—

—না না, তাছাড়া আরও ব্যাপার কিছু আছে হুজুর। ওরা নিজেদের মধ্যে অবোধ্য ভাষায় কি সব কথা বলাবলি করে।

—তুমি কিছু বুঝতে পারনি?

—না হুজুর। তাছাড়া আমরা পাহারা দেব একথা শুনে ওরা যেন অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ওরা বারবার কারণে অকারণে আমাকে বিশ্রী সব ধমক দিচ্ছে।

—আচ্ছা, সে যাতে না করে তার ব্যবস্থা আমি করব। কিন্তু এদের কিছু বলো না তুমি। ওরা গভর্ণমেণ্ট থেকে নিযুক্ত করা সার্জেণ্ট। গভর্ণমেণ্ট যোগ্যতার পরীক্ষা না করে ওদের নিযুক্ত করেনি।

—তা ত বটেই স্যর।

—যাও, বেশ মনোযোগ দিয়ে পাহারা দাও। আমি বরং ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করব।

কিন্তু ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে দীপককে বেশি বেগ পেতে হলো না।

সন্ধ্যার পরেই ক্যাপ্টেন মূলার নিজে এসে দীপকের কেবিনের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কড়াটা নাড়লেন।

দীপক তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলেই সাম্‌নে মিঃ মূলারকে দেখে জিজ্ঞাসা করল—এত রাতে হঠাৎ যে এভাবে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন ?

মিঃ মূলার গম্ভীরমুখে বললেন—হ্যাঁ দীপক বাবু। বড্ড জরুরী কথা আছে আপনার সঙ্গে। দরজাটা বন্ধ করুন।

দীপক দরজাটা বন্ধ করে দিলে মিঃ মূলার ধীরে ধীরে তাঁর পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দীপকের সামনে ধরে বললেন—মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়লেই সব বুঝতে পারবেন।

দীপক ধীরে ধীরে কাগজটা খুলে দেখল সেটা একখানা চিঠি।

দীপক মিঃ মূলারের দিকে তাকিয়ে বলল—এটা কখন পেলেন আপনি ?

মিঃ মূলার বললেন—আমি মিনিট কুড়ি আগে কাজ শেষ করে আমার ঘরে গিয়ে দেখি যে টেবিলের ওপর এটি পেপারওয়েট্ চাপা দেওয়া আছে। আমি এটা চিঠি বলে বুঝতে পারিনি। খুলে দেখি যে এটি আসলে আমাকে ভয় দেখিয়ে লেখা একটি পত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

দীপক নিবিষ্টভাবে চিঠিতে মনঃসংযোগ করল।

ছোট্ট চিঠি ঃ

প্রিয় ক্যাপ্টেন মূলার,

আমি জানি, এই জাহাজের সেফ্ ভল্টের চাবিটি আপনার কাছে আছে। ওই পাঁচ লক্ষ টাকা আমার চাই। চিঠি পাবার ঠিক দশ ঘন্টার মধ্যে যদি আপনি চাবিটা আমার হাতে সমর্পণ না করেন, তবে আপনার পরিণামের কথা চিন্তা করতেও ভয়ে শিউরে উঠছি আমি।

আপনি বিশেষ করেই জানেন, আমার কথার সঙ্গে কাজের বিশেষ তফাৎ থাকে না। আমি যে আপনাদের সকলের দৃষ্টি উপেক্ষা করেও এই জাহাজে অবস্থান করছি তা থেকেই বুঝতে পারছেন যে আমার ক্ষমতা আপনাদের চেয়ে কত বেশি। আপনার সঙ্গে কোনও শত্রুতা নেই আমার। আপনি যদি কাউকে এই চিঠির কথা না জানিয়ে স্বেচ্ছায় ওই চাবিটি টেবিলের ওপর রেখে দেন তবে আপনার কোনও ভয় নেই। অন্যথায় যে করেই হোক্ চাবিটা আমি হস্তগত করতে বাধ্য হব।

আপনার জীবনের যদি কোনও মূল্য থাকে তবে আশা করি চিঠিটার কথা গোপন রাখবেন।

ইতি

আপনার বন্ধু

লিউসিন।

চিঠি শেষ করে দীপক মিঃ মূলারের দিকে চেয়ে বলল—আপনি যে চিঠির কথা গোপন না রেখে আমাকে জানালেন ?

মিঃ মূলার গর্বের হাসি হেসে বললেন—আপনাকে ত আগেই বলেছি মিঃ চ্যাটার্জী যে ভয় কাকে বলে তা আমরা জানি না। যাক্ সে কথা, এখন পরবর্তী কার্যপদ্ধতি স্থির করবার জন্যেই আমি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।

দীপক বলল—এতে আপনার বিপদ কিন্তু অনেকগুণে বেড়ে গেল মিঃ মূলার। যাক্ সে কথা, সেফ্ ভল্টের চাবি কোথায় আছে নিশ্চয়ই একমাত্র আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না ?

মিঃ মূলার বললেন—না। আর ঠিক সেইজন্যেই ওরা চাবিটা পাবার জন্যে এত বেশি উতলা হয়ে উঠেছে।

দীপক বলল—আপনি কি সারা জাহাজ খুব ভাল ভাবেই সার্চ করেছিলেন ?

মিঃ মূলার বললেন—হ্যাঁ, কিন্তু আশ্চর্যের কথা প্রত্যেকটি যাত্রী সম্বন্ধে

খুঁটিনাটি খোঁজ নিয়েও কাউকেই সন্দেহ করবার কোনও কারণ খুঁজে পাইনি। তাছাড়া জাহাজের সমস্ত গুপ্তস্থানগুলিও ভালভাবে খোঁজ করে দেখেছি।

—কিন্তু এভাবে অনিশ্চিত বিপদ মাথার ওপরে নিয়ে চলাও ত বিপজ্জনক।

—তা ত বটেই।

—যা হোক্, আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে জাহাজ যতক্ষণ রেঙ্গুন না পৌছয় ততক্ষণ খুব হুঁসিয়ার থাকা। তারপর রেঙ্গুন থেকে আরও কয়েকজন ভাল বিশেষ প্রহরীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

—কিন্তু জাহাজ রেঙ্গুনে পৌছতে ত এখনো প্রায় দেড় দিন লাগবে।

—তার আগেই যদি আপনি বিপদের আশঙ্কা করেন, তবে একজন দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করুন। এখন থেকে আপনার নিরাপত্তার ওপরে অনেক কিছু নির্ভর করে।

মিঃ মূলার বললেন—যাক্, আপনিও একটু ভালভাবে চারদিকে নজর রেখে কাজ করুন। আমি বরং ইঞ্জিন-রুমে গিয়ে জাহাজের গতিটা আরও কিছু বাড়িয়ে দিতে বলি।

মিঃ মূলার চিন্তিতমুখে প্রস্থান করলেন।

ছয়

—ছদ্মবেশী—

মিঃ মূলার চলে যাওয়ার পরই দীপক রতনের দিকে চেয়ে বলল—তোর ওপর এবার একটা গুরুতর কাজের দায়িত্ব নির্ভর করবে। আশা করি সাফল্যের সঙ্গেই সম্পন্ন করতে পারবি।

রতন বলল—কি কাজ বল। আমি আশা করি আমার কাজে কোনও শৈথিল্যই প্রকাশ পাবে না।

দীপক হেসে বলল—সর্বপ্রথমে তুই একজন খালাসীর ছদ্মবেশে নিজেকে সজ্জিত করে ফেল্।

রতন প্রশ্ন করল—তার পর ?

—তার পর মিঃ মূলারের কক্ষের কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে তুই গোপনে ওঁর ওপরে নজর রাখবি। আমি আশঙ্কা করছি তিনি হয়তো কোনও বিপদে পড়তে পারেন।

—কিন্তু দশ ঘণ্টার সময় তাঁকে ত দিয়েছে দস্যু লিউস্নিন।

দীপক হেসে বলল—কিন্তু মিঃ মূলার যে চিঠির কথা আমাদের কাছে জানিয়েছেন এবং তিনি চাবিটা কোনক্রমেই সমর্পণ করবেন না বলে স্থির করেছেন এটা নিশ্চয়ই তাদের জানতে বাকি নেই।

—কিন্তু এটা তুই-ই বা কি করে জান্‌লি ?

—ঠিক জানি না, কতকটা আন্দাজ বলতে পারিস্। যাক্, তুই ওদিকে দেখ্, আমাকে আবার এদিকে আজ রাতের মত সেফ্ ভল্টের ওপর নজর রাখতে

হবে। ওদিকেও যাতে ঠিকমত পাহারা দেওয়া চলে সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে।

ছদ্মবেশধারণরত রতনের দিকে চেয়ে দীপক ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করে চলে যায়।

রাত তখন দুটো।

জাহাজের কোন্ একটা ঘড়ি থেকে দুটো বাজার শব্দ ঢং ঢং করে সারা সাগরের বুককে ক্ষণিকের জন্য অদ্ভুত একটা শব্দে ভরিয়ে তোলে।

রতনলাল তখনও নীরবে আপন কাজে রত। খালাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করে সে অদূরস্থ ক্যাপ্টেন মুলারের কক্ষটির ওপর নজর রেখেছে।

খট্ খট্ খট্…

ধীরে ধীরে পা ফেলে সাহেবী পোষাকে ভূষিত এক ব্যক্তি রতনের দিকে এগিয়ে আসে।

রতন ভাল করে তার দিকে তাকায়। কিন্তু আধো-অন্ধকারে এই অপরিচিত ব্যক্তি যে কে তা ঠিকমত ঠাহর করতে পারে না।

—এত রাতে এখানে কেন খালাসী? ওদিকে গিয়ে কাজকর্মে মনোযোগ দেবার চেষ্টা কর। এখুনি ঝড় উঠবে বোধ হয়।

রতন ভাবে—সত্যিই ত, এমন অসময়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ যাত্রীর চোখে বিসদৃশ লাগতে পারে বৈকি! আনমনে সে বলে—হ্যাঁ হুজুর, আমি ওধারেই যাব।

রতন দু এক পা এগোতেই লোকটি পেছন থেকে তাকে ডাকে—শোন

খালাসী, সন্ধ্যার পর থেকেই আজ ক্যাপ্টেন সাহেবকে একটু যেন ব্যস্ত দেখতে পাচ্ছি। কেন বলতে পার?

রতন বলল—তা আমি কি করে বলব হুজুর। ওসব খবর-টবর আমি রাখি না।

—তা বটে। তবে আমি শুনলাম কোন্ এক ডাকাত নাকি ক্যাপ্টেন সাহেবকে ভয় দেখিয়েছে।

উপেক্ষার ভাব দেখিয়ে রতন বলে—না হুজুর, অত সহজে ভয় পাবার লোক আমাদের ক্যাপ্টেন নয়!

—তাই নাকি? তবে তিনি যে অত বেশি সাহসী লোক তা জানলে কবে থেকে?

—তা আমাদের বহুদিন জানা। এর আগেও অনেক ব্যাপারে দেখেছি ত!

লোকটি বলল—দেখেছ? আচ্ছা এই জিনিসটা কি দেখ ত! ওধারে যাবার সময় কুড়িয়ে পেলাম।

রতন দেখল লোকটি একটি রুমাল বের করে তাকে দেখাচ্ছে। রতন কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু লোকটি তার আগেই রুমালটা অকস্মাৎ তার দিকে এগিয়ে দিল। তারপর রতন কিছু বলবার আগেই সেটা চেপে ধরল রতনের নাকে।

রতন প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু লোকটির বজ্রমুষ্টি একটুও শিথিল হলো না।

ধীরে ধীরে হাতদুটি আল্‌গা হয়ে এলো। সুন্দর একটা মিষ্টি গন্ধ ক্রমেই তার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল রতন সেই ডেকের ওপর।

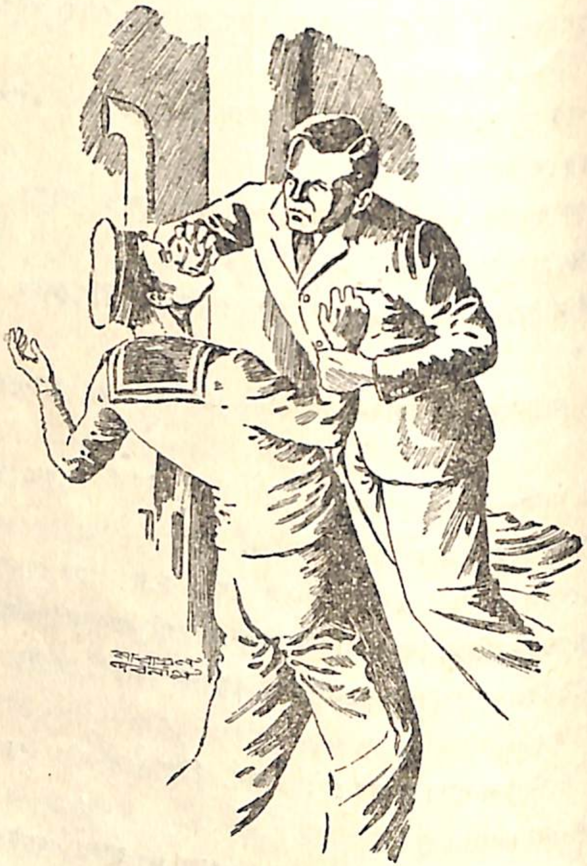

......চেপে ধরল রঞ্জনের নাকে

(পৃষ্ঠা ২৯)

লোকটির মুখে ফুটে উঠল শুধু একটা অবজ্ঞার হাসি।

দীপক চ্যাটার্জী ওধারে স্ট্রং রুমের সাম্‌নে গিয়ে হাজির হয়ে দেখতে পেল ক্যাপ্টেনের নিযুক্ত একজন লোক এবং সার্জেন্টদের একজন মাত্র পাহারায় নিযুক্ত আছে।

দীপককে দেখেই ক্যাপ্টেনের লোকটি তাকে লম্বা সেলাম করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

দীপক জিজ্ঞাসা করল—ওদের দুজনের মধ্যে মাত্র একজনকে দেখছি কেন?

ক্যাপ্টেনের লোকটি কিছু বলবার আগে সার্জেন্টটি এগিয়ে এসে দীপকের দিকে চেয়ে হিন্দুস্থানী ভাষায় বলল—আমার সঙ্গীটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে হুজুর।

দীপক বলল—তাহলে ত তোমার খাটুনী আরও বেড়ে গেল!

—হ্যাঁ। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। এম্‌নি করেই চালিয়ে যেতে পারব। আর ক্যাপ্টেনের লোক ত রয়েছে দুজন। ওদের এক একজন এক একবার করে পাহারা দিচ্ছে আমার সঙ্গে।

—খুব হুঁসিয়ারসে খাড়া রহো। রেঙ্গুনে পৌছে বরং লোকের ব্যবস্থা করা যাবে।

—তার দরকার হবে না হুজুর।

—তোমার সঙ্গীর অসুখ কি খুব কঠিন?

—হ্যাঁ হুজুর। কাজ করতে একেবারেই পারল না।

—তবে লোক না হলে চলবে কেমন করে?

—কাল পরশুর মধ্যেই ও বোধ হয় সেরে উঠবে।

লোকটির কথাবার্তায় দীপক একটু অবাক হলো। যার কঠিন অসুখ সে কাল পরশুর মধ্যে সেরে উঠবে কি করে?

যা হোক্, কথা না বাড়িয়ে দীপক এগিয়ে চলল ডেকের দিকে।

হঠাৎ একজন লোক এসে দীপকের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলল—কয়েকটা কথা ছিল স্যর।

দীপক চেয়ে দেখল, ক্যাপ্টেনের যে দুজন লোককে পাহারার জন্য রাখা হয়েছে, এ তাদের দ্বিতীয়জন। প্রথমজনকে সে একটু আগেই পাহারায় ব্যস্ত অবস্থায় দেখে এসেছে।

দীপক বলল—কি কথা বলতে চাও বল।

লোকটি বলল—আপনাদের সার্জেন্টদের হাবভাব আমাদের ভাল লাগছিল না হুজুর। আপনি কিছু বলতে নিষেধ করেছেন বলে কিছু বলিনি। কিন্তু দিনরাত কি ফুসফাস করছিল আর যেন কতো সব ষড়যন্ত্র আঁটছিল। আমরা কোনও কিছু বলতে গেলেই অহেতুক যা তা গালাগালি করছিল আমাদের।

—সে সব ত আগেই শুনেছি।

—তারপর আজ বিকেলে—ঠিক সন্ধ্যার মুখোমুখি ওদের একজনের হঠাৎ অসুখ করে বসল। অসুখবিসুখ কিছু দেখতে পেলাম না। সে শুধু শুয়ে পড়ে এমন ভাব দেখাল যেন তার শরীরে অসহ যন্ত্রণা হচ্ছে।

—তারপর?

—তারপর সে যে চলে গেল, তখন পর্যন্ত তার আর কোনও পাত্তাই পেলাম না। কখন আবার হয়ত ইচ্ছেমত দু-একদিন পরে এসে বলবে—অসুখ সেরে গেছে।

—যাক্‌গে, তোমরা যেমন আছ পাহারা দিয়ে যাও। আমি ওবিষয়ে ক্যাপ্টেনকে বলব। তোমরা মিথ্যা কোনও গোলমাল করো না যেন।

লোকটি সেলাম করে চলে গেল।

তারপর রাতের অবশিষ্ট সময় দীপক স্ট্রং রুমের আশেপাশে পাহারা দিয়ে কাটাল বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পেল না।

ভোরবেলা সে ধীরে ধীরে তার নির্দিষ্ট কেবিনের দিকে যখন ফিরে চলল, তখন সারা রাত্রির জাগরণের ফলে তার সমস্ত শরীর কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।

* * *

P.O.

সাত

—অসুস্থ মিঃ মূলার—

সেদিন রাতে রতন যখন কেবিনের সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ল, তখন জাহাজের ক্যাপ্টেন মূলার নিজের কেবিনে গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছিলেন।

কেবিনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

মাথার দিকের জানালাটা ছিল খোলা। একটি মূর্তিকে দেখা গেল ধীরে ধীরে জানালার বাইরে এসে দাঁড়াতে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে কি যেন ভেবে নিল। তারপর একটা রুমাল কি-একটা তরল পদার্থে ভিজিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ক্যাপ্টেনের মাথার কাছাকাছি নাড়তে লাগল।

মিনিট খানেক ওরকম করবার পর কাপ্টেন আরও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

লোকটি তখন লঘুপদে এগিয়ে গেল কেবিনের দিকে। একটা ধারালো ছুরি দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে হুকটা খুলে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

খুট্!

কিছুক্ষণ চেষ্টার পরই হুকটা খুলে গেল।

দরজা খুলে লোকটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। তারপর চারদিকে একবার চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে দরজাটি ধীরে ধীরে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল।

ঘরের মধ্যে জ্বলছিল মৃদু একটি নীল আলো। তার নীলাভ আভা যেন ঘরের মধ্যে এক রহস্যলোকের সৃষ্টি করেছিল।

(পৃষ্ঠা ৩৪)

......মাথার কাছাকাছি নাড়তে লাগল

লোকটি ধীরে ধীরে সুইচ্‌বোর্ডের দিকে অগ্রসর হলো।

ঝপ করে কক্ষের আলোটি নিভে গেল অকস্মাৎ।

লোকটি পায়ে পায়ে এগোল গভীর নিদ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন ক্যাপ্টেন মূলারের দিকে। তার মুখে ফুটে উঠল বিচিত্র রহস্যময় এক হাসি। পৃথিবীর কোনও জীবন্ত লোক সেই হাসিটি দেখতে পেলে হয়ত ভয়ে শিউরে উঠত। বিশ্বের হিংসা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তার ছুটি চোখের দৃষ্টিতে।

পরদিন সকাল। বেলা সাতটা।

প্রভাতের প্রথম সোনালী রোদ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে সুরু করেছে নীল সাগরের বুকে।

সূর্যকিরণের ছোঁওয়ায় রতনের ঘুম ভেঙে গেল। সে ধীরে ধীরে উঠে বসতে চেষ্টা করল।

জাহাজের ডেকের ওপর তখন আরও কয়েকজন যাত্রী রতনকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে সেখানে এসে ভিড় করেছিল। রতনকে উঠে বসতে দেখে তারা আশ্বস্ত হলো।

তারা ভাবল বোধ হয় গত রাত্রে লোকটি অত্যধিক নেশা করে এভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে রতন দেখতে পেল জাহাজের ডেকের ওপর সে শুয়ে আছে।

গত রাতের কথা তার একে একে মনে পড়ল। সেই অপরিচিত লোকটি যে তার সঙ্গে আলোচনা করছিল···তারপর তার নাকে রুমাল চেপে ধরা··· মিষ্টি গন্ধ···

রতন বুঝতে পারল লোকটি নিশ্চয়ই সেই দস্যুদলের একজন হবে। কিন্তু

কি বোকা সে! তাকে চোখের সাম্‌নে দেখতে পেয়েও সে সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারেনি।

একটা অবসাদ রতনের দেহ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ধীরে ধীরে উঠে বসে সে নিজের কেবিনের দিকে পা বাড়াল।

কেবিনে পৌছে সে দেখতে পেল দীপক সারারাত্রির পরিশ্রমের পর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

রতন তাকে বিরক্ত করল না।

সর্বপ্রথমে বাথরুমে প্রবেশ করে সে স্নান শেষ করল। স্নানের পরে বেশ একটু সুস্থ বোধ করল সে। তার পর বেশভূষা শেষ করে কেবিনের ভৃত্যকে চা এবং খাবার আনতে বলল।

ছুটি সিদ্ধ ডিম, টোস্ট আর চা খেয়ে তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হলো। দেহের শক্তিও যেন ফিরে পেল অনেকটা। এতক্ষণে দীপকের ঘুমও ভেঙে গিয়েছিল। চোখ মেলেই সে রতনকে সাম্‌নে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করল—কিরে, রাত কি রকম কাটল?

রতন বলল—খুব ভাল। নতুন একটা অভিজ্ঞতা লাভ হলো।

—কি রকম?

—কাল একেবারে খোদ লিউসিনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—সেকি রে?

—হ্যাঁ, কিন্তু প্রথমে চিনতে পারিনি।

—তারপর?

—তারপর আমার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে কথায় কথায় আমার নাকে হঠাৎ রুমাল চেপে ধরে আমাকে অজ্ঞান করে ফেলেছিল।

—তুই বাধা দিলি না?

—চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সফল হইনি। তারপরে আর জ্ঞান ছিল না। ঘুম ভাঙল আজ সকালে।

—বাঃ, একেবারে ছোট্ট ছেলের মতো তোকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে কাজ হাসিল করল ?

—অনেকটা তাই। তবে ভবিষ্যতে আর ভুল হবে না।

—ক্যাপ্টেনের খবর নিয়েছিলি ?

—না, আজ সকালে আর সময় পেলাম না।

—চল্, ব্রেক্‌ফাস্ট শেষ করে আমিও ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করব। তাঁকে সব কথা খুলে বলতে হবে ত! আর একথাও বলতে হবে যে যার অস্তিত্বের কথা চিন্তা করে এবং চিঠি দেখতে পেয়েই তিনি ভয়ে অস্থির ছিলেন, সেই দস্যু লিউসিন স্বয়ং এসে দেখা দিয়েছিল।

দুজনেই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল।

ব্রেক্‌ফাস্ট শেষ করে দীপক ও রতনলাল একত্রে গিয়ে উপস্থিত হলো ক্যাপ্টেন মুলারের কক্ষের সাম্‌নে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা অবাক হয়ে দেখতে পেল, একজন নতুন লোক ঘরের সাম্‌নে পাহারা দিচ্ছে।

দীপক ভাবল যে ক্যাপ্টেন মুলারকে সাবধানে থাকার জন্য যে একজন বডিগার্ড নিযুক্ত করার কথা হয়েছিল, এই বোধ হয় সেই লোক।

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। দীপক লোকটির দিকে চেয়ে বলল—আমি ক্যাপ্টেন মুলারের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

লোকটি বলল—ক্যাপ্টেন মুলার অসুস্থ। তিনি আজ কারও সঙ্গেই দেখা করতে পারবেন না।

দীপক বলল—কিন্তু আমার জরুরী দরকার ছিল। তুমি তাঁকে গিয়ে বল, মিঃ চ্যাটার্জী দেখা করতে চান।

লোকটি ভিতরে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এসে বলল—শরীর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কারও সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়।

দীপক ও রতন হতাশ হয়ে ফিরে চলল নিজেদের কেবিনের দিকে।

*
* *

P.O. JHARIA

আট

—রেঙ্গুন বন্দরে—

দীপকের সঙ্গে কেবিনে ফিরে এসে রতন বলল—উঃ, জীবনে অনেক জটিল কেসের মুখোমুখি আমরা গিয়ে পড়েছি বটে, কিন্তু এধরণের গোলকধাঁধার মধ্যে পড়তে হয়নি কখনও।

দীপক অন্যমনস্কভাবে কি যেন চিন্তা করছিল। আনমনে বলল—কেন?

রতন বলল—সাধারণ কোনও চোর ডাকাত খুনে হলে পারা যায়—কিন্তু এ যে দেখছি সারা জাহাজ জুড়েই সুরু হয়ে গেছে রহস্যের খেলা। সবই যেন কেমন হেঁয়ালী বলে মনে হচ্ছে। উঃ, এই ধরণের সব ঘটনা ঘটবে আগে জানলে কি আর প্রাণ হাতে করে এ ভাবে রওনা হই?

দীপক বলল—ধাঁধার কি দেখতে পেলি আমি ত বুঝছি না!

—ধাঁধা নয়? প্রথমেই আলাপ হলো অনঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার নামে ভদ্র-লোকের সঙ্গে। তিনি নিখোঁজ। তারপর ডেকে রক্তের দাগ। গভর্ণমেণ্ট প্রহরীদের উল্‌টা-পাল্‌টা কথাবার্তা ও ব্যবহার। ভয়দেখানো চিঠি। আবার চিঠি পেয়েই ক্যাপ্টেন হয়ে পড়লেন অসুস্থ। এমন কি তিনি আমাদের সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করলেন না।

—তা তিনি ইচ্ছে করলে না করতেও পারেন। ভুলে যেও না রতন, জাহাজের বুকে ক্যাপ্টেন যা করবেন সেটাই সবচেয়ে বড়ো। ওঁর উপরে কথা বলবার মতো এখানে কেউ নেই। দরকার হলে উনি তোমাকে

আর আমাকে বন্দী করেও রাখতে পারেন। অবশ্য ডাঙ্গায় পৌঁছেই ওঁকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কিন্তু সে পরের কথা। যতক্ষণ জাহাজে আছ, ততক্ষণ ক্যাপ্টেন যা বলবেন সেইটাই আইন বলে গণ্য হবে।

—তা অবশ্য সত্য। কিন্তু অসুস্থ থেকে দেখা না করার জন্য অবশ্য কোনও কৈফিয়ৎই দিতে হবে না ওঁকে।

—সে ত বটেই।

—সে কথা বলছি না আমি। আমার প্রশ্ন এই—মিঃ মূলারের ব্যবহারে হঠাৎ এ ধরণের পরিবর্তনের কারণ কি সেটাই আমার কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হচ্ছে।

—মনে হলেও তোমাকে চুপ করেই থাকতে হবে। তবে আমি অবশ্য ওর মধ্যে ততটা আশ্চর্যের কিছুই দেখছি না। হয়তো উনি সত্যিই অত্যন্ত বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আর অসুস্থ অবস্থায় কোনও মানুষের মনের অবস্থাই সাধারণ থাকতে পারে না।

রতন কোনও উত্তর না দিয়ে আপন মনে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। তবে তার ভাব দেখে মনে হলো যে সে এই ঘটনাগুলিতে অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

সেদিন দিনের বেলায় জাহাজের কেউই ক্যাপ্টেন মূলারের দে পেল না।

জাহাজশুদ্ধ সমস্ত কর্মচারী ক্যাপ্টেন মূলারের এই আকি অসুস্থতার খবর পেয়ে বেশ একটু বিচলিত হয়ে পড়ল। তিনি সারাদি মধ্যে কারও সঙ্গেই দেখা করলেন না। শুধু ইঞ্জিনরুমে একবার

পাঠালেন যে জাহাজের গতি যেভাবে চলছে সেই ভাবেই চলতে থাকবে।

খবর পেয়ে সকলে আগের মতই কাজ করে চলল। তবে সমস্ত জাহাজেই যে একটা উৎকণ্ঠার ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে তা বুঝতে কারও দেরী হলো না।

তবে আশার কথা এই যে সন্ধ্যার পরেই জাহাজ রেঙ্গুন বন্দরে গিয়ে ভিড়বে। সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে—এমন কি প্রয়োজন হলে নতুন লোকের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। অবশ্য যদি ক্যাপ্টেন মূলার নিজের অসুস্থতার জন্য অবসর গ্রহণ করতে চান।

জাহাজের যাত্রী ও কর্মচারীদের এই সব জল্পনাকল্পনার মধ্যে জাহাজ ঠিক মতই এগিয়ে চলল।

আর দীপক চ্যাটার্জী ও রতন শুধু একবার স্ট্রং রুম এবং একবার ক্যাপ্টেনের ঘরের সাম্‌নে ঘোরাফেরা করেই তাদের কর্তব্য পালন করে চলল।

সন্ধ্যার ঠিক পরই জাহাজ এসে রেঙ্গুন বন্দরে ভিড়ল।

আলোকোজ্জ্বল রেঙ্গুন নগরীর দৃশ্যাবলী যেন জাহাজের আরোহীদের মনে বহন করে নিয়ে এলো আশা এবং আনন্দের বাণী।

জাহাজের সমস্ত আরোহী বিগত কয়েকদিন ধরে অবিশ্রান্ত জলের মধ্যে বাস করে কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। এবার তারা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

পরদিন বেলা আটটার আগে জাহাজ ছাড়বে না। আরোহীদের অনেকে তাই বোটে চড়ে রেঙ্গুন শহরটা দেখে আসবে বলে স্থির করল।

একদল ডক পুলিশ জাহাজে উঠে এলো প্রত্যেকের পাস্‌পোর্ট ও অন্যান্য সব কিছু পরীক্ষা করে তাদের নামবার অনুমতি দেবার জন্যে।

দীপক এবং রতন এগিয়ে গিয়ে ডক পুলিশের কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বলল—জাহাজ থেকে যে সব যাত্রীরা নামবে আমরাও তাদের একবার পরীক্ষা করে দেখব বলে স্থির করেছি।

ডক পুলিশ কর্মচারী হাসিমুখে তাতে সম্মতি দিল।

যাত্রীরা একে একে প্রায় দেড়শোজন নেমে গেল রেঙ্গুন সহর দেখবার জন্যে। সকলে নেমে গেলে দীপক কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিম্নস্বরে রতনকে বলল—এদের মধ্যে কাউকেই সন্দেহজনক বলে কিন্তু মনে হলো না।

রতন বলল—না। তবে জাহাজে যারা আছে তাদের মধ্যেই বা দস্যু লিউসিন কে তা আমার মাথায় এখনো ঢুকল না।

দীপক কোনও উত্তর দিল না।

ডক পুলিশেরা যাত্রীদের ছেড়ে দিয়ে জাহাজের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর দিকে চেয়ে বলল—ক্যাপ্টেন মূলারের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

কর্মচারীটি বলল—তিনি আজ সকাল থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কারও সঙ্গেই দেখা করতে পারবেন না।

ডক পুলিশেরা আর কোনও কথা না বলে তার দিকে চেয়ে বলল—আপনি ওঁকে বলবেন যে যদি কোনও ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য প্রয়োজন হয় তবে যেন এখানকার ডক পুলিশের কর্তা স্যাম্পসন সাহেবকে জানা[illegible] হয়।

কর্মচারীটি তাদের কথায় সম্মতি জানালে তারা নেমে গেল এ[illegible] একে।

দীপকের দিকে চেয়ে রতন প্রশ্ন করল—এরা ত নেমে গেল, এবার নিশ্চয়ই আর কোনও যাত্রীকেই নামতে দেওয়া হবে না?

রতনের কথার উত্তরে দীপক জানাল—না, আজ রাতের মত আর কেউই জাহাজ থেকে নামতে পারবে না।

—আমরাও তাহলে কাল সকালের আগে রেঙ্গুন সহরে যেতে পারব না।

—এবারকার মত রেঙ্গুন সহর দেখবার আশা স্থগিত রাখো বন্ধু। দীপক হেসে উত্তর দিল।

—কিন্তু জাহাজের সেফ্ ভল্টের খোল ত কেউ পরীক্ষা করে দেখল না!

—যতক্ষণ ক্যাপ্টেন না জানাচ্ছে যে সোনার কোনও ক্ষতি হয়েছে বা ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে, ততক্ষণ কেউ সেটা পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না। তবে সিঙ্গাপুরে পৌছে অবশ্যই সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে। আর যদি সোনার কোনও ক্ষতি হয় তবে তার জবাবদিহিও ক্যাপ্টেনকে করতে হবে সিঙ্গাপুরে।

জাহাজ থেকে যাত্রীদের নামাওঠা বন্ধ হবার পরে দুএকজন কুলী শুধু কতকগুলি মালপত্র নিচে নামাচ্ছিল। তাদের দিকেও একবার সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে দীপক দেখল, কেউ ছদ্মবেশী দস্যুদের লোক কিনা।

সবদিক থেকে নিঃসন্দেহ হয়ে দীপক রতনকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলল ডাইনিং রুমের দিকে।

একটু পরেই বেজে উঠল খাবার ঘণ্টা।

নয়

—ক্যাপ্টেনের গতিবিধি—

জাহাজ রেঙ্গুন বন্দর ছাড়ল।

বেলা তখন সাড়ে আটটার কিছু বেশি।

দলে দলে যাত্রীরা রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে বিলীয়মান বেলাভূমির দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আবার সুরু হলো তাদের জলযাত্রা।

অবশ্য যে সব যাত্রীদের লক্ষ্যস্থল ছিল রেঙ্গুন বন্দর তারা আর জাহাজে ফিরে এলো না।

জাহাজ রেঙ্গুন বন্দর ত্যাগ করে নীল জল কেটে এগিয়ে চলল সাবলীল ছন্দে।

দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রতন বলল—এই জলরাশির মধ্যে ঘটেছে অনঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারের সমাধি—যিনি একদিন রেঙ্গুনে এসে পৌছবেন আশা নিয়ে যাত্রা করেছিলেন।

দীপক হেসে বলল—অত বেশি ভাবালুতা ভাল নয়!

—কেন?

—ভাবালুতা মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়।

—যথা?

—অনঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার মারা যাননি।

—সেকি? অবাক হয়ে রতন প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, তোর অজ্ঞাতে ডক পুলিশের কাছ থেকে খবর নিয়ে জানতে পেরেছি যে অনঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার নামে বিখ্যাত ব্যবসায়ী গত ছ' মাসের মধ্যে রেঙ্গুন ছেড়ে বের হননি।

—তবে যে লোকটি মারা গেল সে কে?

—এই জাল অনঙ্গস্বামীটি কে তা এখনও জানতে পারিনি। আর তিনি এভাবে অদৃশ্যই বা হলেন কেন?

—হয়তো জাল লোককেই আসল লোক মনে করে দস্যুরা হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে।

—রক্তের দাগ সেকথাই বলে বটে, তবে এ সম্বন্ধে সবকিছু না জানা পর্যন্ত একটি কথাও প্রকাশ করা অনুচিত।

দীপক ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ক্যাপ্টেনের ঘরের দিকে, ক্যাপ্টেন এতক্ষণে কতটা সুস্থ হয়েছেন তা জানবার জন্যে।

কিন্তু ক্যাপ্টেনের ঘরের সাম্‌নে প্রহরারত লোকটি বলল—ক্যাপ্টেনের শারীরিক অবস্থা একটু উন্নত হলেও এখনও বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করবার মত অবস্থা তাঁর আসেনি।

কিছুটা চিন্তা করে দীপক অগত্যা ফিরে চলল স্ট্রং রুমের দিকে—যেখানে ক্যাপ্টেনের একজন লোক ও একজন প্রহরী তখনও পাহারা দিচ্ছিল।

পুলিশ প্রহরীর মন আজ একটু ভাল বলে মনে হলো। দীপককে দেখে সে এগিয়ে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

দীপক প্রশ্ন করল—তোমার একা থাকতে কষ্ট হচ্ছে না ত?

লোকটি বলল—না হুজুর, মিলিটারীতে কাজ করবার সময় দশ দিন দশ রাত পর্যন্ত বহুবার একভাবে পাহারা দিতে হয়েছে।

—তোমার সঙ্গীর শরীরের অবস্থা কেমন?

—আগের চেয়ে একটু ভাল।

—কবে থেকে কাজে লাগতে পারবে বলে মনে হয়?

—তার ঠিক নেই। তবে দু-একদিনের মধ্যেই কাজে লাগবে। ওর শরীর ভাল হলে আমি একটু বিশ্রাম নেব হুজুর।

দীপক বলল—আচ্ছা, তুমি বেশ ভাল করে এখনকার মত পাহারার কাজ চালাও।

—আচ্ছা হুজুর। লোকটি সেলাম ঠুকে চলে গেল।

দীপক এবার ক্যাপ্টেনের লোকটিকে একপাশে ডেকে জিজ্ঞাসা করল—কি খবর? এখন নিশ্চয়ই আর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না?

লোকটি বলল—না হুজুর। কাল ক্যাপ্টেন এসে এই লোকটাকে একটু ধম্‌কে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে ও চুপচাপ মুখ বুজে পাহারা দিচ্ছে।

—ক্যাপ্টেন? দীপক অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ হুজুর। কাল রাত দশটার সময় তিনি এধারে এসেছিলেন।

—কিন্তু তিনি ত অসুস্থ।

—হ্যাঁ, আমি তাঁকে সে প্রশ্ন করায় তিনি ধম্‌কে বললেন যে, সে খোঁজে আমার দরকার কি? তারপর জানালেন যে তাঁর শরীরের এখন যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং এর পর তিনি নিয়মিতভাবে জাহাজের কাজ দেখাশুনা করবেন।

—তারপর? দীপক আগ্রহপূর্ণভাবে প্রশ্ন করে।

—তারপর তিনি বলেন যে রেঙ্গুনে এসে জাহাজ যখন নোঙ্গর করেছে, তখন আর একবার সেফ্‌টি ভল্টটি পরিদর্শন করবেন তিনি। এই বলে তিনি চাবি দিয়ে সেফ্‌টি ভল্টের তালা খুলে ভিতরে যান এবং দরজা বন্ধ করেন। তারপর ভিতরে গিয়ে তিনি কি করেন তা অবশ্য আমরা জানি না। অবশেষে বের হলেন প্রায় আধঘণ্টা পর। বেরিয়েই গম্ভীরমুখে তিনি চলে গেলেন।

—তারপর আর তিনি এধারে আসেননি ?

—না হুজুর।

দীপক লোকটির সঙ্গে আর কোনও কথা না বলে গম্ভীরভাবে রতনকে সঙ্গে নিয়ে নিজের কেবিনের দিকে চলল।

রতন প্রশ্ন করল—ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আর একবার দেখা করবার চেষ্টা করবি না ?

গম্ভীরভাবে দীপক উত্তর দিল—না, কোন লাভই হবে না তাতে।

—কেন ?

—ক্যাপ্টেন মূলার আমাদের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবেন না।

—কিন্তু তাঁর এই ধরণের অন্যায়ের সমর্থন করা কোনওক্রমেই উচিত নয়।

—কিন্তু ক্যাপ্টেনের উপরে আমাদের কোনও হাত নেই একথা ভুলে যেও না বন্ধু।

—হাত নেই বলেই কি চুপচাপ থাকব ?

—বেশি উত্তেজনা প্রকাশ করলে আমাদের বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

—তাহলে এভাবে আমাদের পাহারা দেবার অর্থ কি ?

—সেটা সিঙ্গাপুরে পৌঁছে রিপোর্ট করলে ক্যাপ্টেনকে তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু তার আগে তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করতে পারেন।

কোনও কথা না বলে চিন্তিত মনে রতন পায়চারী করতে লাগল।

দশ

—দীপক ও রতন বন্দী—

বেলা এগারোটা বাজল।

ডাইনিং রুমের বেল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সচকিত করে তুলল। তারা সকলেই একে একে এগিয়ে গেল ডাইনিং রুমের দিকে।

রতনের দিকে চেয়ে দীপক চ্যাটার্জী বলল—তুইও ডাইনিং রুমের দিকে যা। আমার একটু জরুরী কাজ আছে। সেটা শেষ করে তারপর যাব।

রতন একটু চিন্তা করে বলল—কি জরুরী কাজটা একবার শুনি! এভাবে তুই নিজে কাজ করবি আর আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখব, এটা বিশ্রী লাগছে আমার।

দীপক হেসে বলল—সব সময় কৌতুহল ভাল নয়। যথাসময়ে যা কিছু জানাবার ঠিকই জানাব।

—কিন্তু একা বিপদের মধ্যে জড়ানো···

—সেটাতে চিন্তার কারণ নেই কিছু। বিপদ ঘটলে আমাদের দুজনের এক-সঙ্গেই ঘটবে। কিন্তু এখন তোর ডাইনিং রুমে যাওয়া অবশ্যই উচিত।

—বেশ।

কোনও আপত্তি না করে রতন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডাইনিং রুমের দিকে চলল।

রতন চলে গেলে দীপক একাই এগিয়ে চলল ওয়্যারলেস অপারেটরের ঘরটির দিকে।

জাহাজের এককোণে দোতলার উপরে ওয়্যারলেস অপারেটরের ঘর।

ঘরখানি ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। দীপক বাইরে থেকে তিনবার টোকা দিল—টক্ টক্ টক্…

দরজা খুলল।

দ্বারপথে দাঁড়িয়ে অপারেটর মিঃ সেনগুপ্ত। দীপককে দেখে তিনি সাদরে আহ্বান জানালেন—আসুন মিঃ চ্যাটার্জী। তারপর হঠাৎ আমার ঘরে আপনার শুভ পদার্পণ? কি ব্যাপার বলুন ত!

দীপক হেসে বলল—ব্যাপার একটু আছে স্যর। কিন্তু সেটা অত্যন্ত গোপনে রাখতে হবে।

—কি ব্যাপার?

—আপনি সিঙ্গাপুরে পার্সোন্যাল রিম্‌কে একটা মেসেজ্ পাঠাতে পারবেন?

—কিন্তু ক্যাপ্টেনের অনুমতি ছাড়া…

—উপায় নেই মিঃ সেনগুপ্ত। ক্যাপ্টেন কিছুতেই এ ব্যাপারে অনুমতি দেবেন না।

—কেন?

—কারণ মেসেজ্‌টা তাঁরই বিরুদ্ধে।

—সে কি মিঃ চ্যাটার্জী?

—হ্যাঁ। আপনাকে সিঙ্গাপুরে মেসেজ্ প্রেরণ করতে হবে যে ক্যাপ্টেন মূলার কাল রাত্রে গভর্ণমেণ্টের সেফ্‌টি ভল্ট খুলে ভেতরে ছিলেন আধঘণ্টার ওপর। অথচ নিজে অসুস্থ বলে কারও সঙ্গেই দেখা করছেন না তিনি। তাঁর এই আচরণ সন্দেহজনক।

—বুঝলাম মিঃ চ্যাটার্জী। কিন্তু আমাকে এর জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারে। আর ক্যাপ্টেন জানতে পারলে আমাকে পদচ্যুত করবেন।

—সেজন্যেই ত এটা করতে হবে অত্যন্ত গোপনে, আর আপনার নিজস্ব দায়িত্বে।

—বেশ, আপনার কথায় রাজি হলাম মিঃ চ্যাটার্জী। কারণ অন্যায়কে আমি কোনও দিনই প্রশ্রয় দিই না।

—কিন্তু ধরা পড়লে আপনার শাস্তি হতে পারে এটা জেনেই ও কাজে হাত দেবেন মিঃ সেনগুপ্ত।

—বেশ, আমি প্রস্তুত।

মিঃ সেনগুপ্ত মেসেজ্ পাঠাতে সুরু করলেন। দীপক দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। এতবড়ো একটা ঘটনায় সে যে যথেষ্ট বিহ্বল হয়ে পড়েছে এটা তার দিকে চাইলেই বোঝা যায়।

খট্ খট্ খট্…

দরজায় কড়া নড়ে উঠল।

—কে? দরজা খুললেন মিঃ সেনগুপ্ত। অবাক বিস্ময়ে তিনি লক্ষ্য করলেন ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে স্বয়ং ক্যাপ্টেন মূলার। হাতে তাঁর উদ্যত একটি রিভলভার।

মিঃ মূলার সক্রোধে বললেন—আপনাকে আমি সাস্‌পেণ্ড করলাম মিঃ সেনগুপ্ত। ওয়্যারলেস রুমের দরজা এখন থেকে বন্ধ থাকবে। তারপর তিনি সঙ্গী দুজন লোকের দিকে চেয়ে বললেন—ওকে বন্দী কর।

দুজন রাইফেলধারী প্রহরী এসে দীপককে বন্দী করে নিয়ে চলল।

জাহাজের নিচের একখানা ঘরে দীপককে পুরে বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে দেওয়া হলো।

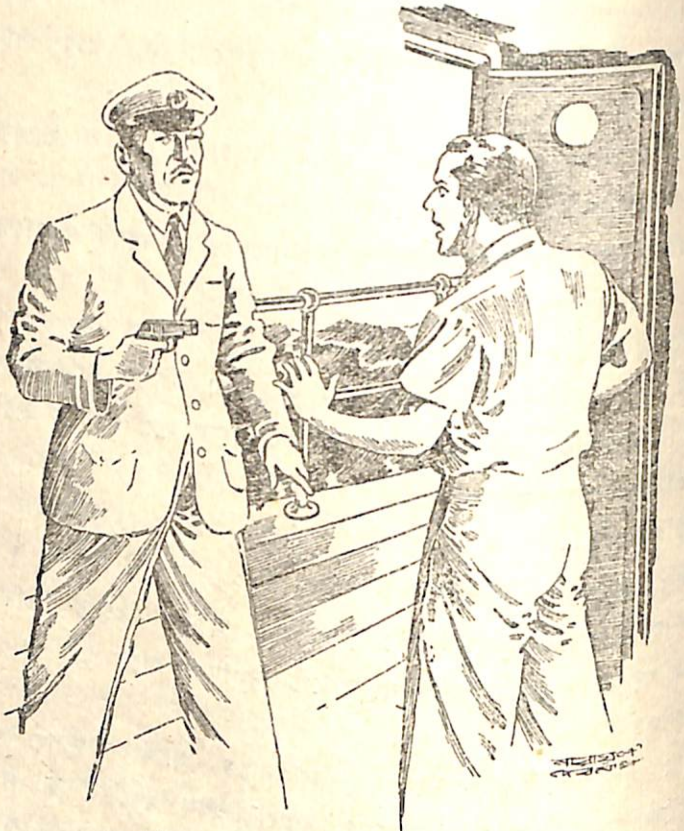

হাতে তার উদ্যত একটি রিভলভার...... (পৃষ্ঠা ৫১)

দীপক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল রতনকে তার আগেই বন্দী করে সেখানে রাখা হয়েছে।

ক্যাপ্টেন মুলার একজন প্রহরীর দিকে চেয়ে বললেন—তুমি এখানে পাহারা দাও। দেখো যেন ওরা দুজন পালাতে না পারে। তোমাকে মোটা বকশিস দেবার ব্যবস্থা করব।

প্রহরীটি লম্বা সেলাম ঠুকতেই মিঃ মুলার অন্য সঙ্গীটিকে নিয়ে অদৃশ্য হলেন।

এগারো

—অপারেটর মিঃ সেনগুপ্ত—

দীপক ও রতনকে বন্দী করে ক্যাপ্টেন মূলার দ্রুতপদে চললেন ইঞ্জিন-ঘরের দিকে।

সেখানে তখন জাহাজের দুজন কর্মচারী এবং আরও কয়েকজন লোক কাজ করছিল।

ক্যাপ্টেন মূলারকে দেখে সকলেই উঠে দাঁড়াল সসম্ভ্রমে।

ক্যাপ্টেন মূলার একজন কর্মচারীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—জাহাজ এখন কত স্পীডে চলছে?

ইঞ্জিনরুমের প্রধান কর্মচারী মিঃ রক্ষিত বললেন—ঘণ্টায় বাইশ মাইল স্যর।

—এত কম?

—এ জাহাজের পক্ষে ওটাই যে খুব বেশি স্পীড্ তা ত আপনি জানেন স্যর!

—না, এতে চলবে না। ঘণ্টায় অন্ততঃ চল্লিশ মাইল স্পীডে চালান। ক্যাপ্টেন মূলারের স্বরে দৃঢ়তা।

—কিন্তু এতে জাহাজের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে স্যর। এমন স্পীড্ এ জাহাজ কোনও মতেই সহ্য করতে পারবে না। এতগুলি যাত্রীর জীবন বিপন্ন হবে। মিঃ রক্ষিতের স্বরে ভয়ার্ত ভাব ফুটে উঠল।

—এস্ এস্ মালাবারের দায়িত্ব এখন আমার হাতে মিঃ রক্ষিত। এত

বছর ধরে আমি এর ক্যাপ্টেনসি করছি—আমি জানি কতটা স্পীড্ এ সহ্য করতে পারে। আমার আদেশ না মানলে অন্য লোককে আমি আপনার স্থানে কাজ করাতে বাধ্য হব।

গম্ভীর মুখে মিঃ রক্ষিত বললেন—আপনার আদেশই প্রতিপালিত হবে স্যর।

ক্যাপ্টেন মূলার আর কোনও কথা না বলে হন্ হন্ করে নিজের ঘরের দিকে চল্‌লেন।

জাহাজের স্পীড্ বাড়িয়ে দিলেন মিঃ রক্ষিত। আকস্মিক বেগের প্রাবল্যে সারা জাহাজটা যেন থরথর করে একবার কেঁপে কেঁপে উঠল।

সমস্ত জাহাজের কর্মচারী আর যাত্রীদের মধ্যে পড়ে গেল উদ্বেগ আর চাঞ্চল্যের সাড়া। এস্ এস্ মালাবার এত বেশি বেগ কোনও মতেই সহ্য করতে পারবে না।

মিঃ রক্ষিতের এ্যাসিস্টাণ্ট তাঁর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—ক্যাপ্টেন মূলারের কি হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেছে স্যর?

—কেন বলো তো?

—তিনি হঠাৎ যেন অসুখ থেকে উঠে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। তাঁর মেজাজ গেছে বদলে। সেই সুন্দর নম্র মানুষ যে কি করে এভাবে পরিবর্তিত হতে পারেন বুঝতে পারছি না।

জাহাজের অন্য কয়েকজন কর্মচারীও মিঃ রক্ষিতকে ঘিরে ধরেছিল। তাদের একজন বলল—এ ধরণের অন্যায়কে আমরা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না স্যর।

আপনি জাহাজের গতি কমিয়ে দিন। ক্যাপ্টেনের মাথা খারাপ হবার জন্যে এতগুলো লোককে মিথ্যা মরতে হবে কেন?

এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন অপারেটর মিঃ সেনগুপ্ত। তাঁর দিকে চেয়ে মিঃ রক্ষিত প্রশ্ন করলেন—আপনি এখানে কেন?

—আমাকে সাস্‌পেণ্ড করেছেন মিঃ মুলার। আর বিখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী ও রতনলালকে তিনি বন্দী করেছেন।

কর্মচারীদের মধ্যে গুঞ্জনের সাড়া পড়ে গেল। এ সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রয়োজন হলে আমরা বিদ্রোহ করে ক্যাপ্টেনকে বন্দী করব। কিন্তু......

মিঃ সেনগুপ্ত বললেন—বেশ, আপনারা আমাকে অপারেটিং রুমের চাবি খুলে দিন, আমি এক্ষুণি সব কথা সিঙ্গাপুরে জানিয়ে দিচ্ছি।

—কিন্তু ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে এভাবে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করা কি উচিত হবে? মিঃ রক্ষিত চিন্তান্বিত স্বরে বললেন—নিশ্চয়ই উনি কৈফিয়ৎ দিতে পারবেন। তা নইলে...

—না মিঃ রক্ষিত। মিঃ সেনগুপ্ত বললেন—ওঁর মাথা যে এখন সুস্থ নয় তা বেশ বুঝতে পারছি। চলুন আমরা জাহাজের গতি কমিয়ে এক্ষুণি অপারেটিং রুমে যাই এবং সব কথা হেড্ অফিসে জানাই।

তক্ষুণি জাহাজের গতি কমিয়ে দেওয়া হলে যাত্রীরা যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। তারপর সকলে মিলে চলল অপারেটিং রুমের দিকে। প্রয়োজন হলে তালাটি ভেঙে ফেলে অপারেটিং রুম খুলে সব কথা হেড্ অফিসে জানাতে হবে।

মিঃ রক্ষিত ও মিঃ সেনগুপ্ত এগিয়ে চললেন সবার আগে—তার পেছনে জাহাজের অন্যান্য কর্মচারীরা।

একজন শুধুমাত্র রইলো ইঞ্জিনরুমের চার্জে।

বারো

—দীপকের কারসাজি—

ধীরে ধীরে সময় কেটে চলেছে—সেকেণ্ড...মিনিট...ঘণ্টা...

অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে রতনলাল। এইভাবে যে ক্যাপ্টেন মুলারের আদেশে তাদের বন্দী হতে হবে এ কথা সে বোধ হয় কল্পনাতেও স্থান দেয়নি।

দীপক কিন্তু অদ্ভুতভাবে শান্ত। তার ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যায় যে সে এর জন্যে পূর্বেই প্রস্তুত ছিল।

বিকাল হয়ে এলো। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দীপক দেখল বেলা চারটে।

দারুণ ক্ষুধায় পেটটা চোঁ চোঁ করছিল দীপকের। রতনের দিকে চেয়ে সে বলল—কেন তোকে তখন ডাইনিং রুমে পাঠিয়েছিলাম এখন বুঝতে পারছিস ত? তুই দিব্যি খেয়ে এলি আর আমার পেট ক্ষিদেয় জ্বলছে।

—কিন্তু আপাততঃ আমারও যে এক কাপ চায়ের প্রয়োজন বন্ধু। রতন বলল।

—সে চিন্তা করে লাভ নেই ভাই। পেটের ক্ষুধাটা পেটেই চেপে রাখতে হবে।

—কিন্তু কোনও উপায়ই কি নেই?

—হ্যাঁ, একটা উপায় হয়তো আছে। সেটাই এখন চেষ্টা করে দেখব।

দীপক জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে খট্ খট্ করে টোকা দিতে থাকে। জানালার নিচের ছোট্ট একটা অংশ খুলে যায়। ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে প্রহরীটি বলে—কি চাই ?

দীপক একটা পাঁচ টাকার নোট ছিদ্র দিয়ে বের করে দিয়ে বলে—কিছু খাবার বন্ধু।

নোটটি নিয়ে লোকটি চলে যায়। একটু পরে সে গোটা দুই মামলেট, একখানা রুটি আর দুকাপ চা জানালাটা খুলে ভিতরে দেয়।

রতনের দিকে চেয়ে দীপক বলে—আপাততঃ এতেই তৃপ্ত থাকতে হবে বন্ধু। নাও চা-টা খেয়ে নাও। এভাবে উৎকোচ দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায় !

ধীরে ধীরে খাবারের দিকে মনঃসংযোগ করে ওরা।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে দীপক আবার খট্ খট্ করে টোকা মারতে থাকে। জানালাটা খুলে যায়। দীপক প্লেটগুলো বের করে দেয়। তারপর দশ টাকার একখানা নোট জানালাপথে গলিয়ে দিয়ে বলে—রাতের খাবার চাই কিন্তু। রাত ঠিক নটার সময়।

প্রহরী হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে জানালাটা বন্ধ করে দেয়।

ক্যাপ্টেন মুলার জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে এসে জাহাজের কর্মচারীদের দিকে চেয়ে বলেন—আপনারা আমার কথামত কাজ করবেন কিনা, আমি শেষবারের মত তা জানতে চাই।

মিঃ রক্ষিত বলেন—জাহাজের গতি যদি এইভাবে বজায় থাকে তাহলে কাজ চলবে। তা না হলে আমরা নিজেদের হাতে জাহাজের দায়িত্ব গ্রহণ করব। আপনার পাগলামীকে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে না।

—কি করতে চান আপনারা ?

—জাহাজের গতি বাড়াতে বলা হলে আমরা আপনাকে বন্দী করতে বাধ্য হব। তারপর অপারেটিং রুমের তালা ভেঙে আমরা মেসেজ্ পাঠাব।

—আর যদি জাহাজ এই গতিতেই চলে ?

—তা হলে আমরাও পূর্ব্ববৎ কাজ করব।

—বেশ, তাহলে এভাবেই চলুক। কিন্তু পরে আপনাদের এর জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

গজ্ গজ্ করতে করতে প্রস্থান করেন ক্যাপ্টেন মুলার। জাহাজের কর্মচারীরা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

অভিশপ্ত জাহাজের বুকেও রাত নামে। ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে রাতের নিবিড় কালো আঁধার।

রাত ন'টা।

ঠক্ ঠক্ ঠক্···

দীপকদের দরজার ওপর টোকা পড়তে থাকে।

—কে ? দীপক প্রশ্ন করে।

—খাবার এনেছি স্যর। বাইরের তালা খুলে দিয়েছি। দরজার খিল খুলুন।

দরজা খুলে দিতেই রিভলভার উঁচিয়ে ধরে থালা হাতে প্রহরীটি প্রবেশ করে। তারপর খাবার রেখে প্রস্থান করে। দরজা আবার পূর্বের মত বন্ধ হয়ে যায়।

খাওয়া শেষ করে রতন টোকা দেয়—খাওয়া হয়ে গেছে, থালা নিয়ে যাও।

রিভলবার উঁচিয়ে ধরে লোকটি প্রবেশ করে।

কিন্তু ঘরের কোণে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ভঙ্গিতে ওৎ পেতে বসেছিল দীপক।

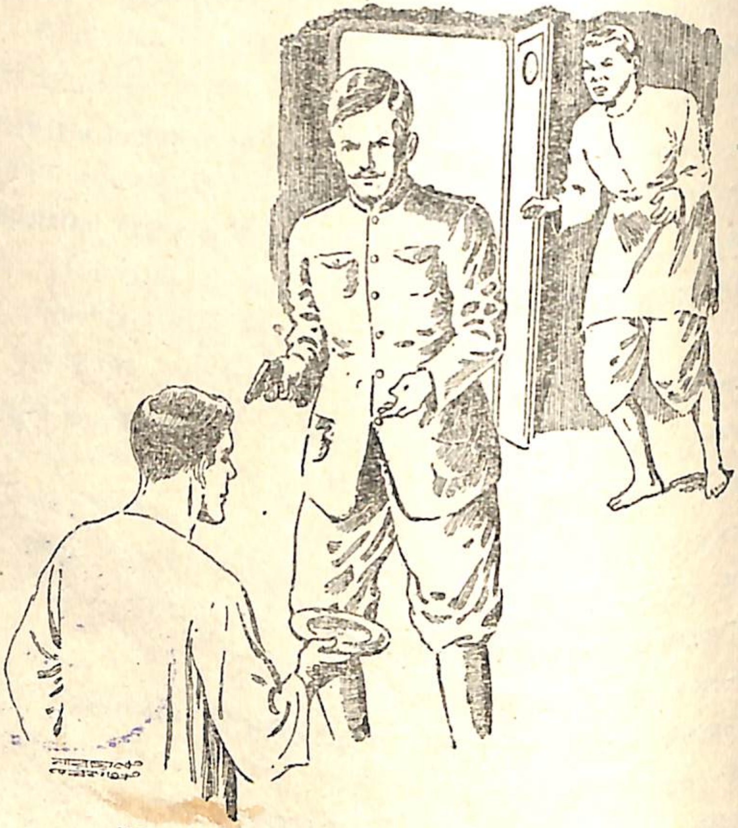

ঘরের কোণে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ভঙ্গিতে ওৎ পেতে বসেছিল দীপক

লোকটি প্রবেশ করতেই তীব্রবেগে তার দেহের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে রিভলভারটি কেড়ে নেয়। তারপর লোকটিকে বন্দী করে তার পোষাকে নিজেকে সজ্জিত

ভ্রান্ত পথের শেষে

করে নিতে বেশিক্ষণ লাগে না। দুজনে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা দিয়ে দেয়।

প্রহরীর পরিবর্তে এবার পায়চারী করতে থাকে ছদ্মবেশী দীপক চ্যাটার্জী।

রাত বারোটা।

ক্যাপ্টেন মুলার আসেন জাহাজ পরিদর্শন করতে। প্রহরীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন—বন্দীরা কি করছে এখন ?

দীপক কণ্ঠ পরিবর্তন করে বলে—ঘুমোচ্ছে হুজুর।

ক্যাপ্টেন মুলারের ঠোঁটে ফুটে ওঠে বিজয়ীর হাসি। বলেন—ঘুমোক। ভালোভাবে পাহারা দাও তুমি। প্রচুর বকশিস দেবার ব্যবস্থা করব।

দীপক সেলাম ঠুকে বলে—জী হজোর !

ক্যাপ্টেন মুলার দ্রুতপদে প্রস্থান করেন।

রিভলবার উঁচিয়ে ধরে লোকটি প্রবেশ করে।

কিন্তু ঘরের কোণে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ভঙ্গিতে ওৎ পেতে বসেছিল দীপক।

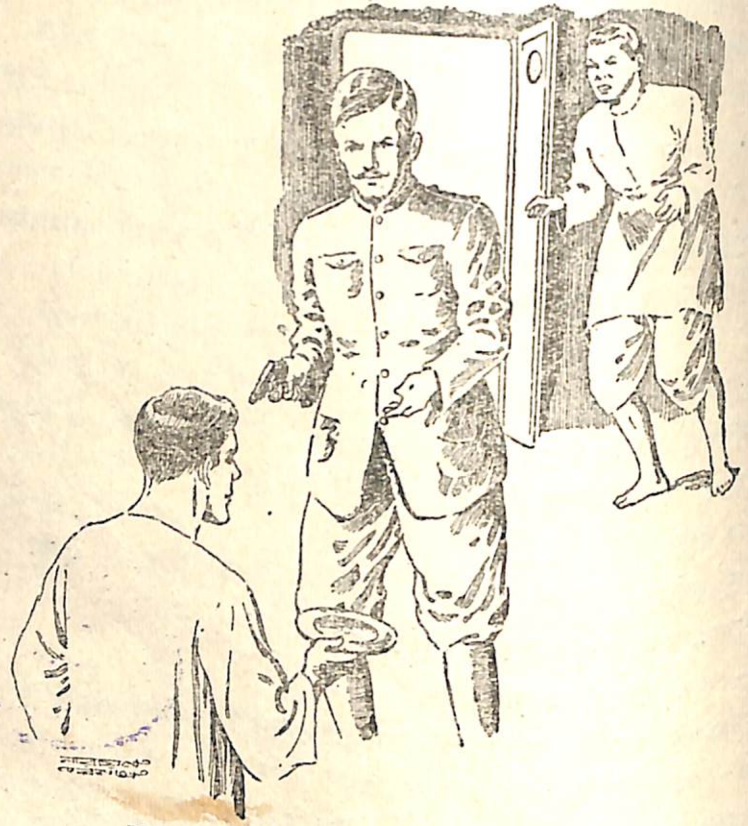

ঘরের কোণে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ভঙ্গিতে ওৎ পেতে বসেছিল দীপক

লোকটি প্রবেশ করতেই তীব্রবেগে তার দেহের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে রিভলভারটি কেড়ে নেয়। তারপর লোকটিকে বন্দী করে তার পোষাকে নিজেকে সজ্জিত

করে নিতে বেশিক্ষণ লাগে না। দুজনে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা দিয়ে দেয়।

প্রহরীর পরিবর্তে এবার পায়চারী করতে থাকে ছদ্মবেশী দীপক চ্যাটার্জী।

রাত বারোটা।

ক্যাপ্টেন মুলার আসেন জাহাজ পরিদর্শন করতে। প্রহরীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন—বন্দীরা কি করছে এখন?

দীপক কণ্ঠ পরিবর্তন করে বলে—ঘুমোচ্ছে হুজুর।

ক্যাপ্টেন মুলারের ঠোঁটে ফুটে ওঠে বিজয়ীর হাসি। বলেন—ঘুমোক। ভালোভাবে পাহারা দাও তুমি। প্রচুর বকশিস দেবার ব্যবস্থা করব।

দীপক সেলাম ঠুকে বলে—জী হুজোর!

ক্যাপ্টেন মুলার দ্রুতপদে প্রস্থান করেন।

তেরো

—পরিশেষ—

জাহাজ এসে নোঙ্গর করে সিঙ্গাপুরে।

গভর্ণমেণ্টের লোক, পুলিশ, মিলিটারীতে জাহাজ যেন ভর্ত্তি হয়ে যায়।

পুলিশের চীফ্ অফিসার ক্যাপ্টেন মুলারের সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড করে বলেন—আশা করি কোনও অসুবিধা হয়নি।

—না। ক্যাপ্টেন মুলার হেসে উত্তর দেন।

—চলুন সেফ্ ভল্টের সোনাগুলি এবার পরীক্ষা করা যাক্।

—আপনারা যান। আমি একটু পরে আসছি। ক্যাপ্টেন মুলার উত্তর দিলেন।

পুলিশের চীফ্ তাঁর দলের লোকদের নিয়ে এগোতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ কেবিনের প্রহরীটি বলে উঠল—দাঁড়ান স্যর, একটা কথা আছে।

সকলে বিস্ময়ে হতবাক।

প্রহরী হঠাৎ রিভলভারটি ক্যাপ্টেন মুলারের বুকের উপর উঁচিয়ে ধরে বলে উঠল—এঁকে গ্রেপ্তার করুন স্যর—ইনিই হচ্ছেন ছদ্মবেশী দস্যু লিউসিন।

—সেকি? তাঁদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে বিস্ময়।

—বিশ্বাসঘাতক! চীৎকার করে ওঠেন ক্যাপ্টেন মুলার।

প্রহরী মাথার পরচুলা খুলে ফেলে দেয়। দেখা যায় সেই-ই ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী স্বয়ং।

ছদ্মবেশী ক্যাপ্টেন মুলার এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখে। তারপর হঠাৎ গোল একটা বস্তু ছুঁড়ে দেয় মেঝের ওপর।

—স্মোক্ বম্ব! চীৎকার করে ওঠে দীপক। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় সারা কক্ষ।

ধোঁয়ার আবরণ সরে গেলে দেখা যায় ছদ্মবেশী ক্যাপ্টেন মুলার ওরফে দস্যু লিউসিন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তক্ষুণি পুলিশের চীফ্ ও দলবল নিয়ে দীপক ছোটে ক্যাপ্টেনের ঘরের দিকে। সেখানে পাওয়া যায় কয়েকটি ব্যাগের মধ্যে সমস্ত সোনা বোঝাই করা। তারপর নিচের একটি গুপ্ত কক্ষে পাওয়া গেল বন্দী অবস্থায় আসল ক্যাপ্টেন মুলারকে। তাঁকে বন্দী করেই দস্যু লিউসিন ক্যাপ্টেন মুলারের ছদ্মবেশ ধরেছিল।

ধীরে ধীরে সব ঘটনা প্রকাশ পায়।

দস্যু লিউসিন ও তার সহকারী সিন্‌ফো প্রথমে ছিল দুজন খালাসীর ছদ্মবেশে। তারপর তারা গভর্ণমেণ্ট সার্জেণ্টদের হত্যা করে নিজেরা সেই স্থান অধিকার করে। অবশেষে লিউসিন স্বয়ং ক্যাপ্টেনকে সরিয়ে তার স্থান দখল করেছিল।

ছদ্মবেশী সিন্‌ফোকে গ্রেপ্তার করা হলো। কিন্তু দস্যু লিউসিনকে ধরা গেল না।

মিঃ মূলার শুধু বললেন—আমার দুঃখ হচ্ছে বেচারী গভর্ণমেণ্ট সার্জেণ্ট দুজনের জন্যে। নীল সাগরের অতল গহ্বরেই এদের সমাধি রচিত হলো!

পুলিশ চীফ্ বললেন—মিঃ চ্যাটার্জী না থাকলে সোনাগুলিও লিউসিনের হস্তগত হতো। তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্যেই এযাত্রা ওগুলি রক্ষা পেল।

মিঃ মূলার বললেন—অযথা ধন্যবাদ দিয়ে এঁকে আমি ছোট করতে চাই না। উনি যা করেছেন তা তুলনাহীন।

রতন শুধু বলল—এ ক'দিন যা খাওয়ার কষ্ট গেছে—উঃ···

তার এ ধরণের কথায় সকলেই হো হো করে হেসে ওঠে। *

শেষ

* গল্পাংশে বিদেশী ছায়া আছে।

বিশ্বচক্র সিরিজ—স্বপনকুমারের ডিটেক্‌টিভ গ্রন্থমালা

প্রত্যেকখানির মূল্য ·৬০ পয়সা

১। অদৃশ্য সঙ্কেত
২। দুরাত্মার ছল
৩। ভ্রান্তপথের শেষে
৪। চলন্ত ছায়া
৫। হিংসার অন্ধকার
৬। অব্যর্থ সন্ধান
৭। বিষাক্ত হাসি
৮। মিথ্যা চমক
৯। চায়না লজ
১০। বিজয়িনী তন্দ্রা
১১। শ্বেতপদ্ম
১২। অদৃষ্টের পরিহাস
১৩। ব্যথার প্রদীপ
১৪। মৃত্যুহীন প্রাণ
১৫। রক্তকমল
১৬। নূতন অতিথি
১৭। পৃথিবী থেকে দূরে
১৮। হারান ডাইরী
১৯। বিকেল ছ'টার 'শো'তে
২০। বিফল স্বপ্ন
২১। বাগান-বাড়ী
২২। প্রবালপুরী
২৩। জীবন-মৃত্যু
২৪। পরপারের পথিক
২৫। জমাট অশ্রু
২৬। পরাজয়ের গ্লানি
২৭। আলো-আঁধার
২৮। তিন বন্ধু
২৯। ছায়ার আর্ত্তনাদ
৩০। রাঙ্গাজবা
৩১। এক পেয়ালা চা
৩২। বেনামী চিঠি
৩৩। রত্নমালার কাহিনী
৩৪। ঝড়ের সঙ্কেত
৩৫। জবানবন্দী
৩৬। ব্যর্থ অভিযান
৩৭। হারানো মাণিক
৩৮। অদৃশ্য বন্ধু
৩৯। হরতনের নওলা
৪০। গৃহপ্রবেশ
৪১। জোয়ার-ভাঁটা
৪২। বেয়াইনী দখল
৪৩। রূপমহল
৪৪। পরশ-পাথর
৪৫। চোখের ভুলে
৪৬। চারশো বিশ
৪৭। রঙ্গিন সূতা
৪৮। বিষকন্যা
৪৯। শুধু দুটি হাত
৫০। সন্ধ্যা-মালতী
৫১। বন্দী বাসুকী
৫২। শেষ রাতের কাহিনী
৫৩। বলয়গ্রাস
৫৪। ছন্দহারা
৫৫। মায়া-কানন
৫৬। ছদ্মবেশী
৫৭। তেরো নম্বর বাড়ী
৫৮। বন্দিনী বিশাখা
৫৯। একটি চোখের রহস্য
৬০। মুখার্জী ভিলা
৬১। চীনের পুতুল
৬২। কালো মুখোস
৬৩। গ্রীন ড্রাগন
৬৪। নাইট ক্লাব
৬৫। সোনার হরিণ
৬৬। তিন নম্বর ফ্ল্যাট
৬৭। ঘূর্ণি হাওয়া
৬৮। বিষের বাঁশী
৬৯। ভাড়াটে বাড়ী
৭০। ঘুম ভাঙা রাত
৭১। শেষ অঙ্ক
৭২। লাল কুঠী
৭৩। নিশি মালঞ্চ
৭৪। পাগল হাওয়া
৭৫। ঝরা বকুল
৭৬। চৈত্রের পলাশ
৭৭। সাগর বেলায়
৭৮। আণবিক রশ্মি
৭৯। পাহাড়তলীর বাংলো
৮০। ছাপা হইতেছে
৮১। ছাপা হইতেছে
৮২। জীবন-দোলা

কলেজ স্টুডেন্টদের জন্য—

বিশ্ব-চক্র সিরিজের ৮৯ নম্বর বই—

আঁধার রাতের পথিক

শ্রীস্বপন কুমার

বিশ্ব সাহিত্য প্রকাশনী

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার
বিশ্ব-সাহিত্য প্রকাশনী
৬৮, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

বৈশাখ—
১৩৭৫

ছেপেছেন—
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড
৬৮, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য—
৬০ পয়সা

আঁধার রাতের পথিক

এক

সাধারণ যে কোনও মানুষের থেকে একেবারে পৃথক্ ধরনের লোক রামলাল।

ওর মত আরও কত লোক প্রায়ই দেখা যায় হয়তো, কিন্তু তাদের থেকে পৃথক্ এর চরিত্র।

রামলালের মত সস্তা দামের হাওয়াই শার্ট আর ট্রাউজার পরা মোটর ড্রাইভার দেখা যায় অনেক, তবে ও তাদের থেকে পৃথক্ হলো শুধু তার চরিত্রের জন্যে।

দৃঢ় চরিত্রের মানুষ রামলাল—তাই এর মত সাধারণ একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের জীবনে যখন ঘটল এই সব আশ্চর্য ঘটনা, তখন ও বিস্মিত হলো কিন্তু বিভ্রান্ত হলো না।

সাধারণ ট্যাক্সি ড্রাইভার রামলাল।

মাসকয়েক ড্রাইভারী শিখে লাইসেন্স পেয়ে চুপচাপ বসে থাকার মতো ছেলে রামলাল নয়।

সে রীতিমত ছয় বছর ধরে ট্যাক্সি চালাচ্ছে নিয়মিত।

তাই বাইরে থেকে তাকে বোকা বলে মনে হলেও খুব বেশী বোকা যে সে নয় তা অনেকেই আন্দাজ করতে পারে।

অবশ্য নিজে গাড়ি কেনেনি রামলাল।

অন্যের গাড়ি নির্দিষ্ট টাকায় দৈনিক চুক্তি করে নিয়ে সে গাড়ি চালায়

নির্দিষ্ট টাকার ওপর যা লাভ থাকে তা থেকে নেহাত কম উপার্জন হয় তা নয়। মাসে শ' তিনেক টাকা তো বটেই।

সেদিন বিকেল ছ'টা।

রামলাল তার গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখেছিল রেসকোর্স থেকে কিছু দূরে। শনিবার।

একটু পরেই মাঠ থেকে দলে দলে লোক বের হবে।

আর যারা দু'পয়সা রেস খেলে পাবে তারা বেরিয়েই সামনের একটা গাড়িতে চেপে বসবে।

ওরকম খদ্দেররা দিলদরিয়া মেজাজে দু'পাঁচ টাকা বকশিশও করে ফেলে প্রায়ই।

রামলাল তাই বেশ নিশ্চিন্ত মনেই ছিল। আজ তার ভাগ্যে বেশ দু'পয়সা জুটবে।

কিন্তু সবার অলক্ষ্যে নিয়তি বোধহয় তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বিদ্রূপ করেছিল।

মাঠ থেকে বের হলো মেমসাহেব ধরনের একটি মেয়ে আর তার সঙ্গী দু'জন ভদ্রলোক।

মেয়েটিকে মেমসাহেব গোছের বলা হচ্ছে বটে, তবে সে সত্যিকারের ইংরেজ মেয়ে নয়।

পরনে যদিও বিলিতী ধরনের পোশাক, মাথার চুলও বব্ ও কার্লিং করা, তবু দেখে বোঝা যায় যে মেয়েটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।

লোক দুটির পরনেও বিলিতী ধরনের পোশাক। নিজেদের মধ্যেই তারা যে ভাষায় কথা বলে চলেছিল তা রামলালের কাছে অবোধ্য নয়।

—কোন্ দিকে যাব স্যার? রামলাল প্রশ্ন করে।

—সিধা চলো পার্ক স্ট্রীটসে, থোড়া আগাড়ী······

—বহুৎ আচ্ছা······

রামলাল গাড়ি ছেড়ে দেয়।

গাড়িখানা রামলালের হাতে যেন প্রাণ পেয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললো।

চৌরঙ্গীর মোড়ে এসে বাঁদিকে বাঁক নেয় গাড়িখানা।

দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে পার্ক স্ট্রীট অভিমুখে।

পার্ক স্ট্রীট থেকে ফ্রী স্কুল স্ট্রীট। গাড়ি বাঁ দিকে মুখ ফেরায়।

পেছনের সিটে প্যাসেঞ্জার তিনজন তখনও চুপচাপ বসে। সন্ত রেসের মাঠ থেকে বেরিয়ে যে উচ্ছ্বাস সাধারণতঃ যাত্রীদের মধ্যে দেখা যায়, তার এতটুকু নেই তাদের মধ্যে।

ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের মধ্যে কিছুটা এগিয়ে একটা মাঝারী আকারের বাড়ির সামনে গাড়িটা এসে দাঁড়াতেই ওদের মধ্যে একজন বলে উঠলো— একদম রোখো।

—জী সাব,—

রামলাল গাড়ি দাঁড় করায়।

ওরা তিনজন গাড়ি থেকে নেমে একেবারে বাড়ির ভিতরে ঢুকে যায়।

রামলাল চুপচাপ বসে কি যেন ভাবছে এমন সময় দোতলার ওপর থেকে একজন লোক ডেকে বললো—ড্রাইভার, ভিতরে এসো, ভাড়া নিয়ে যাও।

রামলাল বুঝতে পারে এতক্ষণ ধরে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে কথা বললেও মেমসাহেব গোছের লোকটা ও সঙ্গী লোক দু'জন বাঙালী ছাড়া অন্য কিছু নয়।

রামলাল বাড়িটার ভেতরে প্রবেশ করে।

কিছু আগে সন্ধ্যা নেমে এসেছে পৃথিবীর ওপর। বাড়িটার কোণে কোণে তাই কেমন যেন ঝাপসা অন্ধকার জমে আছে।

রামলাল বুঝতে পারে ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে।

এমন একটা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে তাকে কোনদিনও এমন অপ্রস্তুত হতে হয়নি। সামান্য একজন ড্রাইভার সে। তাই ছোটখাট একটা ব্যাপারে তাকে এতো চিন্তা করলে চলে না।

রামলাল দোতলায় উঠে যায় ছোট সিঁড়ির পথ ধরে। ঠিক দোতলায় যেতেই একজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। সে রামলালের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো—

—মিটার কত উঠেছে?

— দেড় টাকা হুজুর।

লোকটা ভিতরে ঢুকে যায়। একটু পরেই ফিরে এসে লোকটা রামলালের হাতে একখানা পাঁচ টাকার নোট এনে দেয়। বাকিটা তোমার বকশিশ।

লম্বা সেলাম ঠুকে রামলাল বলে—বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

বলে সে সবেমাত্র পিছন ঘুরেছে এমন সময় তার মনে হলো পিঠের উপরে কার হাত।

চমকে পেছন ফিরে তাকায় রামলাল। কোলকাতা শহরে প্রকাশ্যভাবে যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে এ তার কল্পনার অতীত।

লোকটা একটা পিস্তল তার দিকে উদ্যত করে রেখেছে। পিস্তলের নল ঠেকেছে তার পিঠে।

—কি হে দেখছ কি? আমাদের হুকুম মত চলবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ তাহলে সোজা গাড়িতে চলো।

লোকটা তার হাতের পিস্তলটা একটা কাপড়ের আবরণে এমনভাবে কৌশলে লুকিয়ে রাখে যে, কারো চোখে সেটা সহজে পড়বে না সন্ধ্যার আঁধারে।

রামলালের পিছনে পিছনে সে গাড়িতে এসে বসে। ঠিক রামলালের পাশেই সে বসে পড়ে। পিস্তলের নলটা চেপে ধরে রাখে রামলালের পাঁজরে।

একটু পরে বাড়ির মধ্যে থেকে মেমসাহেব এবং তার আর একটি সঙ্গী বেরিয়ে আসে। লোকটি পাঁজাকোলা করে একটি বেঁটেমত স্যুটপরা সাহেবকে গাড়িতে এনে তোলে। কিন্তু আশ্চর্য বেঁটে সাহেবটা কোনও চিৎকার করে না। এমন কি টু শব্দটি পর্যন্ত নয়।

লোকটি বলে—মিলি দরজা খোলো!

মিলি অর্থাৎ সেই মেমসাহেব গোছের মেয়েটি ট্যাক্সির দরজাটা খুলে ধরে। বেঁটে সাহেবটিকে গাড়িতে বসিয়ে লোকটা তার পাশে বসে। তার ওপাশে অর্থাৎ কোণের দিকে মিলি।

রামলাল এতক্ষণে বুঝতে পারে বেঁটে সাহেবটার মুখ বাঁধা তাই সে কোন কথা বলতে পারছে না। কিন্তু তাকে ওভাবে কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা সে কল্পনা করতে পারে না।

এভাবে অন্যের নির্দেশমত চলতে বাধ্য হয়নি কোনদিন রামলাল। কিন্তু এক্ষেত্রে নিরুপায় হয়েই তাকে চুপ করে থাকতে হবে।

—গাড়ি চালাও। পিস্তলটা বুকের পাঁজরে একবার চেপে ধরে লোকটা হুকুম দেবার ভঙ্গিতে বলল।

—আচ্ছা স্যার।

গাড়ি আবার ছুটলো।

গতি-সীমানার বাঁধন না মেনে যেন গাড়ি ছুটে চলে।

কোনো দিকে খেয়াল করবার মতো এতটুকু সময়ও থাকে না রামলালের। কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করে পূর্ণ বেগে গাড়ি চালিয়ে চলে সে।

—বাঁয়ে।

মেমসাহেব গোছের মেয়েটি ট্যাক্সির দরজাটা খুলে ধরে। [পৃষ্ঠা ৯

পাশের লোকটি নির্দেশ দেয়।

আবার বাঁক নেয় গাড়ি। গতি সমান রেখে রামলাল গাড়ি চালায়।

পৃথিবীর কোন কিছুরই প্রতি এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

যেন গাড়ি চালিয়ে যেতেই সে জন্ম নিয়েছে পৃথিবীতে।

আর কোন কিছুরই দিকে তাকাবার কোন প্রয়োজন নেই তার।

হঠাৎ পাশের লোকটি বলে—গাড়ি থামাও—গাড়ি থামাও।

কোথায় কেন গাড়ি থামাচ্ছে সে বিষয়ে এতটুকু খেয়ালও থাকে না। রামলাল দ্রুত হাতে ব্রেক কষে।

ঘস্ ঘস্ করে শব্দ হয় দুবার। গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে।

সাথে সাথে পাশের লোকটা একটা ভিজে রুমাল রামলালের নাকে চেপে ধরে।

একটা মিষ্টি গন্ধ। উগ্র ঝাঁঝ যেন মিশে আছে সে গন্ধে। রামলালের কিছু বোঝার আগেই তার মাথার মধ্যে ঝাঁঝাঁ করতে থাকে।

জ্ঞান হারিয়ে সে গাড়ির গদীর উপরেই লুটিয়ে পড়ে।

সমস্ত স্মৃতি যেন ঝাপসা হয়ে আসে তার মনের মধ্যে।

61070

দুই

ধীরে ধীরে রামলালের মাথাটা একটু পরিষ্কার হয়ে আসে।

মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে তখনও। ভাল করে চারদিকে তাকিয়ে সে দেখে কোন কিছু দেখা যায় কিনা। কিন্তু কিছুই সে ভালোমত বুঝতেপারে না।

হাতড়ে হাতড়ে সে চারদিকে কি আছে তা বোঝবার চেষ্টা করে। কিন্তু সামনে শুধু সীমাহীন আঁধার।

তাই কোন কিছু চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠে না। আঁধারে ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে দৃষ্টি।

হঠাৎ কি একটা জিনিস যেন তার হাতে ঠেকে।

নরম পেলব স্পর্শ।

রামলাল অনেক কষ্টে নিজেকে আর একটু সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

জ্ঞান ফিরে আসছে ধীরে ধীরে।

যে জায়গাতে সে নরম জিনিসের স্পর্শ পেয়েছিল সেই জায়গাটাতে আবার সে হাত দেয়। একটা মানুষের জীবন্ত দেহ।

একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ খেলে যায় রামলালের সমস্ত দেহে।

সে একটা মৃতদেহে হাত দিয়েছে। এটা মৃত মানবের দেহ না হলে কখনও এতো ঠাণ্ডা হতে পারে না।

কিন্তু এখানে মৃতদেহ এলো কোথা থেকে? সে এখন কোথায়?

রামলালের হঠাৎ একটা কথা মনে হয়। তার পকেটে একটা দিয়াশালাই আছে। সেটা জ্বেলে সে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে। ম্লান আলোয় যা দেখা যায় তাতে তার অন্তরাত্মা শিউরে ওঠে।

একটা মৃতদেহ পড়ে আছে ঠিক তারই পাশে।

পথের ধারে একটা পার্কে পড়ে আছে সে আর ঐ মৃতদেহটা। মৃতদেহটা দেখে আরও একটা কথা মনে পড়ে যায়। তা হচ্ছে মৃত ব্যক্তি বেশ ধনী। চেহারার মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। দামী ধুতি আর পাঞ্জাবি তার পরনে।

কিন্তু এভাবে মৃতদেহের পাশে এত রাতে তাকে যে দেখবে সেই তো সন্দেহ করবে।

রামলাল উঠে দাঁড়ায়। তারপর প্রাণপণ ছুটতে শুরু করে দেয়। বিনা দোষে সে নিজেকে একজন খুনী বলে ধরা দিতে চায় না।

পার্কের গেটের কাছ থেকে মাত্র সে দশ পনের পা হেঁটেছে এমন সময় একটি বীটের কনস্টেবল তার বেশভূষা দেখে তাকে প্রশ্ন করে—এই কৌন হো তুম?

রামলাল তার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা বের করে কনস্টেবলকে দেখায়। তারপর বলে অনেক রাত পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে এই ফিরছি।

কনস্টেবল আর কোনও কথা বলে না।

সোজা ফিরে আসে রামলাল তার বাড়িতে। কিন্তু বিগত রাতের স্মৃতির কথা পরদিন সকালে তার মন থেকে মুছে যায় না।

* * * *

পরদিন সকাল।

রামলাল অন্যান্য দিনের মতোই তার বাড়ির কাছাকাছি একটা ছোট চায়ের দোকানে বসে এক কাপ চায়ের অর্ডার দেয়। তারপর খবরের কাগজটা খুলে চোখের সামনে ধরতেই একটা খবর তার চোখে বেশ স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে।

আবার দস্যু বলবন্ত !

কোলকাতায় দেশবন্ধু পার্কে ধনী আততায়ীর মৃতদেহ। আততায়ীকে এখনও গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নাই।

তার ঠিক নীচে ছোট ছোট অক্ষরে যে কথাগুলি লেখা ছিল তা বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ে ফেলে রামলাল।

মহানগরী কোলকাতা এবং তার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানগুলিতে দস্যু বলবন্ত নাম শোনেনি এমন লোকের কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

সম্প্রতি সে এমনভাবে একের পর এক বিভিন্ন হত্যাকাণ্ড অবাধে সংঘটিত করে চলেছে যে তা ভাবতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। শোনা যায় দস্যু বলবন্ত পুলিসের আইন বা শৃঙ্খলা মানে না। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে ধরা তো দূরের কথা জীবন্ত দেখতে পেয়েছে এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। কিন্তু সে তার বিশাল দলবলের সাহায্যে ইচ্ছামত একের পর এক বেআইনী কাজ করে চলেছে অবাধে।

ইতিপূর্বে সে বিভিন্ন ধনী লোককে ভয় দেখিয়ে তাদের সর্বস্ব অপহরণ করে নির্বিবাদে গা ঢাকা দিয়েছে। মহানগরীর প্রতিটি লোক তার ভয়ে তটস্থ হয়ে পড়েছে।

প্রত্যেক ধনী লোক ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। কখন তাদের কাছে হয়ত দস্যু বলবন্ত ভয় দেখান চিঠি এসে পড়তে পারে।

দিন তিনেক আগে উত্তর কলকাতার বিশিষ্ট ধনী নিতাইসুন্দরকে একখানা চিঠি দিয়েছিল দস্যু বলবন্ত। চিঠিতে লেখা ছিল চব্বিশ

ঘন্টার মধ্যে দশ হাজার টাকা তার হাতে তুলে দিতে হবে, না হলে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

নিতাইসুন্দর একটু নির্ভীক, সাহসী প্রকৃতির লোক তা ছাড়া অন্যায়কে তিনি কোনদিন সমর্থন করেন না। দস্যু বলবন্ত যে নির্দেশ দিয়েছিল

তাই তিনি টাকা দেননি। তা তিনি পালন করেননি। তাই কাল ভোরে উত্তর কোলকাতার দেশবন্ধু পার্কে তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

স্থানীয় একজন লোক মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিসে সংবাদ জানান। পুলিস বাহিনী মৃতদেহ পোস্ট মর্টেমে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

পোস্ট মর্টেমে জানা গেছে যে, পিস্তলের গুলিতে নিতাইসুন্দর-বাবুর মৃত্যু ঘটেছে।

এই ধরনের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের জন্য যে সমস্ত লোক দায়ী যাতে তারা অবিলম্বে ধরা পড়ে সে জন্যে পুলিস বিভাগকে আমরা অনুরোধ করছি।

তা না হলে সাধারণ মানুষের জীবন নিরাপদ নয়। সাধারণ মানুষ কোন্ ভরসায় এর পরে নিরাপদে জীবন যাপন করবে ?

তিন

প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর কর্মপদ্ধতির সাথে সাধারণ রহস্যগল্প পাঠকের পরিচয় নেই একথা আমি কল্পনা করতেও পারি না।

সকালে চায়ের পেয়ালার সঙ্গে তার অতি প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে একখানা খবরের কাগজ।

কিন্তু সাধারণ কতকগুলো বাঁধা খবর আর রাজনৈতিক আলোচনাগুলো পড়বার জন্যে খবরের কাগজ পড়ে না দীপক। তার কাজ হচ্ছে দুনিয়ার যতো রহস্যমূলক ঘটনাগুলোর সন্ধান করা। একে একে সব ঘটনার সূত্র সে একটা ছোট ডায়েরীতে লিখে রাখে।

ঠিক সেই নিয়মেই সে যেসব সূত্র যেদিন লিখে রাখছিল তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হচ্ছে দস্যু বলবন্তর কাহিনী।

দস্যু বলবন্তর ইতিবৃত্ত পরিপূর্ণ ভাবে লিখে রাখল দীপক। অবশেষে এক কোণে বড় বড় ইংরেজী হরফে লিখে রাখল, ইনটারেস্টিং।

সবে লেখা শেষ করে সে কি করবে তাই ভাবছে, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো ঘন ঘন।

দীপক ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল।

—হ্যালো কে?

—আমি ডেপুটি পুলিস কমিশনার মিঃ রায় কথা বলছি।

—মিঃ রায়? কি ব্যাপার বলুন তো? এত সকালে উঠেই হঠাৎ অধমকে শরণ!

মিঃ রায় হো হো করে হেসে উঠে বলেন—কারণ না থাকলে কি আর এমনি শরণ করছি আপনাকে।

—কারণ যে আছে তা অনুমান করতে পারছি।

—ব্যাপার খুব সাধারণ। যে ধরনের বিশেষ কারণ ঘটলে আপনার সাহায্য নিতে আমরা বাধ্য হই, ঠিক সেই ধরনের কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে সম্প্রতি। তাই বাধ্য হয়ে এক্ষেত্রেও আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে।

—ও বুঝেছি।

—কি ব্যাপার বলুন তো?

—নিশ্চয়ই দস্যু বলবন্তর ব্যাপারটা সলভ্ করবার জন্যে আমার সাহায্য যেন পান আপনি?

—ঠিক তাই!

—আমি আজকের খবরের কাগজ দেখেই বুঝেছি, যে এবার আপনি আমাকে অবিলম্বে আহ্বান করবেন। কাগজওয়ালাদের খোঁচা না খেলে তো আর আপনাদের চেতনা হয় না।

—তা যা বলেছেন।

—যাক, কেসটা কেমন বুঝছেন?

—খুবই জটিল। একের পর এক ও ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে, অথচ আমরা বন্ধ করতে পারছি না। আরও একটা ঘটনা··

—নতুন নাকি?

—না পুরোনো। গত দু'দিন থেকে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে মিঃ চৌধুরী নামে একজন ভদ্রলোককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে শুনলাম এর মধ্যেও নাকি দস্যু বলবন্তের হাত আছে।

—কি করে বুঝলেন?

—মিঃ চৌধুরীর ড্রয়ারে একটা চিঠি পাওয়া গেছে। ওর এক বান্ধবীর লেখা চিঠি। সেই বান্ধবীর নাম মিলি। হঠাৎ চৌধুরী যেদিন অদৃশ্য হন সেদিন

আমরা তাঁর ঘর সার্চ করে চিঠিটা পাই। তাই দেখে আমরা চেষ্টা করি সেই মিলিকে খুঁজে বের করতে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার ঠিকানা পাইনি। পরে তদন্ত করে বুঝতে পারলাম মিলি হচ্ছে দস্যু বলবন্তের ডান হাত। দস্যু বলবন্ত তার সাহায্যে দলের লোকের কাছে খবরাখবর পাঠায়। মিলি হচ্ছে দস্যু বলবন্তের মিডিয়াম।

—এগুলো কোত্থেকে যোগাড় করলেন ?

—এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রীট আর ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের কয়েকটা নৈশ আড্ডায় হানা দিয়ে।

—যাক সুখবর সন্দেহ নাই। কিন্তু মিঃ চৌধুরীর ওপর হঠাৎ এই দস্যু বলবন্তর নজর পড়ল কেন ?

—শুনলাম চৌধুরী ছিলেন বড় কৃপণ প্রকৃতির লোক। তিনি বোধ হয় প্রচুর টাকা জমিয়েছিলেন তাঁর হাতে। তাই হয়ত বলবন্তর নজর তাঁর ওপর গিয়ে পড়েছিল। আর মিলির মাধ্যমে হয়ত সে খবরও পেয়েছিল ভিতরে ভিতরে।

—তা অবশ্য সম্ভব ! কিন্তু মিলির সঙ্গে চৌধুরীর যোগাযোগ ঘটল কেমন করে তা জানেন ?

—হ্যাঁ, তাও সংগ্রহ করেছি।

—চৌধুরী যদিও কৃপণ ছিলেন খুব, তবু তাঁর একটা নেশা ছিল। তিনি ছিলেন একনম্বরের রেসুড়ে। প্রতি সপ্তাহে তিনি রেসের মাঠে যেতেন। সেই সূত্রেই তাঁর সাথে মিলির আলাপ।

—সে কি ? মিলিও রেস খেলে নাকি ?

—হ্যাঁ, খেলত বলেই শুনেছি।

—এখন খেলে না ?

—তা ঠিক জানি না। তবে রেসের মাঠে যে একবার যায় সে কি সহজে

ছাড়তে পারে। হয়ত গ্র্যাণ্ডে না গিয়ে সে অল্পদামের টিকিট কিনে সেকেণ্ডে ঢোকে। একেবারে ছেড়ে দেবে তা বিশ্বাস করতে পারি না আমি।

—মিলির কোনও ছবি আপনার কাছে আছে ?

—না।

—তবে অবশ্য তাকে আইডেনটিফাই করা খুবই মুশকিল। দু' একজন সাক্ষী যোগাড় করতে পারলে হয়ত সুবিধে হতো। যাক আরও কয়েকটা নাইট এ আলোচনা করা প্রয়োজন।

—ধন্যবাদ।

—তাহলে ছেড়ে দিচ্ছি ?

—আচ্ছা।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখে।

* * *

সেদিনই বিকেলে।

দীপক তার নিজস্ব মার্কারী এইট্ গাড়িতে চড়ে দ্রুত চলেছে ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে।

তার একটু পিছনে নিরাপদ দূরত্ব রেখে আর একটা গাড়ি যেন তাকে অনুসরণ করছে বলে মনে হলো তার।

কে এরা ? কেনই বা তারা তাকে বিনা কারণে অনুসরণ করে চলবে ? দীপক ভাবতে থাকে।

দীপক গাড়ি থামায়।

পেছনের গাড়িও বেশ একটু দূরে থেমে যায়।

এক মিনিট···

দীপক আবার গাড়িতে স্টার্ট দেয়। গাড়ি চলতে থাকে। পেছনের গাড়িও অদৃশ্য দু'টি চোখের দৃষ্টি মেলে তাকে অনুসরণ করে চলেছে বলে মনে হয় তার।

দীপক গতি বাড়িয়ে দেয়।

পেছনের গাড়ি অনেক পেছনে পড়ে যায়। দীপক তখন নানা আঁকা বাঁকা পথ পেরিয়ে লালবাজারে হেড কোয়ার্টারের মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে দেয়।

পেছনের গাড়ি আর দেখা যায় না

চার

দীপক মিঃ রায়ের চেম্বারে বসে বসে মিনিট দুয়েক আলোচনা করেছে এমন সময় একজন অফিসার এসে বললো—আপনার সাথে একটু দেখা করতে চান একজন ভদ্রলোক।

—নাম কি?

—বলল রামলালবাবু।

—বেশ ডেকে দাও। কি ব্যাপার বলো তো?

—সেদিনের পর কতজনই এই ঘটনা নিয়ে দেখা করে গেল? রামলালও বোধ হয় তাদের মত কোনও কারণেই এসে থাকবে।

—কতজন এ পর্যন্ত এসেছে এ কেসের ব্যাপারে?

—তা আট দশজন তো বটেই!

—তা হবে হয়ত। কিন্তু আট দশজন লোক···

—সে কি? কম হবে কেন? আমি নির্দিষ্ট সময়ে কথামত ডিউটি করে যাচ্ছি। আপনি তো ঘরে সব সময় থাকেন না। ইনি বোধ হয় অষ্টম ব্যক্তি।

—ঠিক আছে, ডেকে দাও ওকে?

কনস্টেবল বেরিয়ে যায়।

মিঃ রায় দীপকের দিকে চেয়ে বলেন—এ এক মন্দ ব্যাপার হয়নি কিন্তু দীপকবাবু।

—কি ব্যাপার বলুন তো!

—আমরা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম এ কেসে যে হত্যাকারীকে গ্রেফতার করতে সাহায্য করবে তাকে পাঁচ শো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের লোভে দলে দলে লোক আসছে বলবন্তর খবর নিয়ে।

—কারও কোন খবর কাজে লেগেছে ?

—রাম বল ! সব বাজে খবর। শুধু টাকার লোভে সব ঘোরাঘুরি শুরু করেছে।

—যাকগে। বলবন্তকে আপনারা এত ছোট-খাট লোক বলে ভাবছেন। কেন বলুন তো ? তা হোক ! আমি যে একাজে হাত দিতে চলেছি তা পর্যন্ত যাদের অজ্ঞাত থাকে না, তাদের ওপরে টেক্কা দেওয়া কি এত সোজা ?

—আপনি এ কেসে হাত দিয়েছেন তা ওরা জেনেছে ?

—হ্যাঁ !

—কি করে ?

—আমাকে একখানা গাড়ি ফলো করছিল লালবাজারে ঢোকার কিছু আগে।

—কাউকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছেন ?

—না। তবে এরা দলের কর্তা নয় নিশ্চয়ই। কোনও চুনোপুঁটি কর্তার আদেশ পেয়ে আমাদের পিছনে লেগেছে হয়ত।

—তা হতে পারে।

—যাক, এবার কাজের কথায় আসুন। বলবন্তের কীর্তি কাহিনী তো শুনলেন। এবার কি কাজ উদ্ধার করতে পারবেন বলে মনে করেন ?

—তা তো করিই। তবে এখন আমি সম্পূর্ণ আঁধারে। সূত্র দু' চারটে যদি মিলে যায় তবে সঠিক করে বলা যেতে পরে সফল হবো কিনা···

এমন সময় রামলাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

মিঃ রায় রামলালের দিকে তাকায়। লোকটাকে দেখে চট্ করে অবিশ্বাস করা যায় না।

—তোমার নাম কি হে ?

—আজ্ঞে রামলাল !···

—কি কাজ করো ?

—আজ্ঞে, মোটর ড্রাইভিং।

—কত দিন এ কাজ করছো ?

—চার পাঁচ বছর।

—বলবন্ত সম্বন্ধে কি জানো ?

—আজ্ঞে তা'হলে সেদিনকার সব ঘটনা বলতে হয় আপনাকে, যদি ধৈর্য ধরে শোনেন—

—বেশ বল।

রামলাল ধীরে ধীরে তার কাহিনী শুরু করে। মিনিট পাঁচ ছয় সে সেদিনের ঘটনাগুলি বলতে থাকে।

কথা বলে। তা শেষ হবার আগেই হঠাৎ দীপক চিৎকার করে ওঠে—বাইরে আসুন মিঃ রায়···শীগগীর···

মিঃ রায়, দীপক আর রামলাল এক লাফে বাইরে বেরিয়ে আসে।

প্রচণ্ড শব্দে ঘরের মধ্যে একটা বোমা বিস্ফোরিত হয়। সারা ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

—কে ? কে এটা ছুড়ল দীপকবাবু ? মিঃ রায় প্রশ্ন করেন।

—এইমাত্র জানালা দিয়ে একটা হাত বন্ধ ঘরের মধ্যে এসে পড়ল। তা দেখেই আমি আপনাকে বাইরে টেনে আনলাম।

—কিন্তু ওরা কারা ?

—তা ঠিক বলতে পারবো না। তবে নিশ্চয়ই বলবন্তর কোনও অনুচর। লালবাজার পুলিস হেড কোয়ার্টারের মধ্যেও ওদের অনুচরের অভাব নেই।

সকলে বাইরে বেরিয়ে আসে। সারা লালবাজার জুড়ে হইচই পড়ে যায়। সর্বত্র খোঁজাখুঁজি চলে। কিন্তু এমন কোন লোককে পাওয়া যায় না, যাকে সন্দেহ করা চলে।

দীপক বলে—রামলালবাবুর কথা সব সত্যি মিঃ রায়, তা না হলে ঠিক যে সময় উনি এসে ঘটনাগুলো বলছিলেন তখনই বোমা পড়ল কেন!

—আমরাও তাই বিশ্বাস মিঃ চ্যাটার্জী। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

—আই উইল হ্যাভ্ এন অনেস্ট ট্রাই···আমাকে বেশ ভালভাবে চেষ্টা করতে হবে এ কেস সল্‌ভ করবার জন্যে। দীপকের স্বরে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

পাঁচ

কোলকাতা থেকে মাইল দশেক দূরে বন-জঙ্গলের মধ্যে একটা পোড়ো বাড়ি। একজন লোককে দেখা গেল সতর্কভাবে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াতে। তারপর একটা অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র মুখের মধ্যে পুরে বিচিত্র একটা শব্দ করে উঠলো! শব্দটা অনেকটা পাখির ডাকের মত।

কয়েক সেকেণ্ড······

ভেতর থেকে তেমনি আর একটি শব্দ ভেসে এলো।

লোকটা পায়ে পায়ে বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করল।

বাড়িটা দেখে বাইরে থেকে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না যে এর মধ্যে কেউ বাস করে।

এমন ভীতিবহুল লোকবিরল অঞ্চলে কেউ কি থাকতে পারে?

বাড়ির সামনের উঠোন পার হয়েই বড় একটা ঘর।

ভেতরে চুন বালি খসে খসে পড়েছে। ইটগুলো দাঁত বের করে যেন হাসছে—তার বিগতশ্রীর কথা প্রচার করছে সকলের সামনে।

লোকটা হলঘরে পা দেবার সাথে সাথে কতকগুলো চামচিকা আর বাদুড় ডানা ঝটপট করতে করতে উড়ে গেল।

সবে সন্ধ্যা নেমে আসছে। তাই ঘরটা বেশ অন্ধকার। নিস্তব্ধ নিঝুম। শুধু কতকগুলি ঝিঁঝি পোকা ডেকে চলেছে একটানা করুণ সুরে। নিস্তব্ধতা ভাঙ্গাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে।

আকাশে মেঘ। জমাট অন্ধকার। বাইরে শোঁ শোঁ শব্দে হাওয়া বইছে। লোকটা একটু ভয় পেলো, তবুও ধীর পায়ে এগিয়ে চললো। ঘরের ঠিক মাঝখানে বসান আছে একটি মার্বেল পাথরের মূর্তি।

সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে লোকটা মনে মনে ভাবল—যাক এতদূর সে ঠিক এসেছে।

পাথরের মূর্তির মাথাটায় সজোরে চাপ দিতেই শোনা গেল একটা ঘটাং শব্দ।

তারপরেই লোকটা অনুভব করল যে মেঝেটার খানিকটা অংশ তাকে নিয়ে নীচের দিকে তালিয়ে যাচ্ছে।

লোকটার বিস্মিত ভাবটা সম্পূর্ণ কাটার আগেই ধপ করে মেঝের অংশটা এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

লোকটা অবাক হয়ে দেখলো মাটির নীচে একটা ছোট ঘরে এসে প্রবেশ করেছে।

ঘরের মধ্যে আরও তিনজন লোক বসে ছিল। চতুর্থ লোকটাকে দেখে তারা ইঙ্গিতে অভ্যর্থনা করে বসতে বললো।

চতুর্থ লোকটা বসতেই শোনা গেল একটা সুস্পষ্ট শব্দ। কে যেন চিৎকার করে কিছু বলছে। গমগম করছে স্বরটা লাউডস্পীকারের মতো।

শোনা গেল স্বরটা বলছে—যাক তোমরা চার জনেই এসেছ দেখে খুশী হলাম আমি। তোমরা অক্ষরে অক্ষরে আমার উপদেশ মেনে চলেছ। তোমাদের প্রত্যেককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হবে সেজন্যে। এই নাও।

কথার সাথে সাথে ঘরের ঠিক মাঝখানে চারটি নোটের তাড়া এসে পড়ল ধপ করে। যেন আকাশ ফুঁড়ে আবির্ভূত হল সেগুলি।

শোনা গেল স্বরটি বলছে—দস্যু বলবন্তকে তোমরা জানো। জীবনে প্রত্যেকদিন সে তার প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, কিন্তু সাবধান তাকে যেন কখনো ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না। এটাও জেনে রাখ যে বিশ্বাস-ঘাতককে আমি মাত্র একটি শাস্তিই দিই, তা হচ্ছে মৃত্যু।

আধো আলোয়, আধো অন্ধকারে দেখা গেল যে ঘরের মধ্যে চারজন লোকই বিস্ময়ে বিমূঢ় স্তব্ধ। ভয়ে ফ্যাকাশে মুহ্যমান।

—এবার তোমাদের উপর যে সব কাজের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করছি তা বেশ মনোযোগের সহিত শুনে রাখ। দায়িত্ব শুধু নয়—চাই প্রত্যেকটি কাজ যাতে সুসম্পন্ন হয়।

শোন, করিম সর্দার তোমার উপরে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীকে বন্দী করার দায়িত্ব অর্পণ করলাম। যে কোন দিন এবং যেখানে খুশী, তাকে বন্দী করা চাই-ই।

তাজুল খাঁ থাকবে নতুন ব্যাঙ্ক দি গ্লোরিয়াস সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ এর কাজে। তোমাকে কি কি করতে হবে তা পরে বলব।

বাকি দু'জন যাবে পরশু আমার সাথে, বিখ্যাত ধনী রায়বাহাদুর এস চ্যাটার্জীর একমাত্র ছেলেকে চুরি করে আনতে। তাকে এনে রাখা হবে সোনারপুরের জঙ্গলে তেরো নম্বর কুটিরে।

সোনারপুরের জঙ্গলের গুপ্তধনের সন্ধানও এই সময় করা হবে।

যার জন্য কদিন আগে গুর্জর সিংকে খুন করা হলো।

আশা করি তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন কাজ বেশ ভাল করে বুঝে নিয়েছ। তাই আমার আর কোন কথা বলবার প্রয়োজন নাই।

আচ্ছা বন্ধুগণ, শুভ রাত্রি।

ছয়

সেদিন বৈকাল।

দীপক চ্যাটার্জী সারাদিন অজস্র খাটুনির পর ক্লান্ত হয়ে ঘরে বসে বিশ্রাম করছিল।

চাকর এসে খানিকটা খাবার তার সামনে রাখল।

হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করল রতনলাল। মুখটা গম্ভীর। অনেকটা ব্যস্ত ভাব।

—কি খবর রে? হঠাৎ এভাবে হন্তদন্ত অবস্থায়?

রতন মৃদু হাসল। দীপকের দিকে চেয়ে বলল—সাধে কি আর এত ব্যস্ত অবস্থায়। এদিকে খবর বড় অদ্ভুত! একটা সূত্র এসে পড়েছে হাতে!

—কি সূত্র? দীপক আগ্রহান্বিত হয়ে প্রশ্ন করে।

—তুই জানিস এর আগে বলবন্ত পুলিস কমিশনারকে ফোন করেছিল।

—হ্যাঁ শুনেছি।

—সে বলেছিল যে, সে শহরের কোন এক ধনীর একমাত্র পুত্রকে অপহরণ করবে।

—হ্যাঁ, তাও জানি আমি।

—সেই ধনী কে জানিস?

—না।

—শোন তবে।

—আজ বিকেলে হোটেল বেলিভিউতে তুই যে লোকটির কথা বলেছিলি তাকে অনুসরণ করেছিলাম।

—তারপর?

—তারপর সেই লোকটির সাথে আর একজন লোকও এসে জুটল এই হোটেলটিতে। তার সামনের দুটো দাঁত আধভাঙ্গা।

ওই লোকটি পুরানো দাগী আসামী। ওকে আমি আগে দু'একটা খারাপ জায়গায় দেখেছি।

—ভাল কথা, তোকে কি ওরা চিনতে পেরেছিল?

—পাগল, আমার তখন কাবুলির ছদ্মবেশ, আমি ওদের টেবিল থেকে খানিকটা দূরে বসে মনোযোগ দিয়ে ওদের কথা শুনছিলাম। কথাবার্তায় বোঝা গেল ওরা বলবন্তর দল। ওদের হাবভাব আর দু'একবার বলবন্ত নাম উল্লেখ করতে আমার সন্দেহ হলো এই বিষয়ে। আমি ওদের দিকে মনোযোগ অর্পণ করলাম।

তারপর একটু থেমে রতন বলে চলল—আধঘন্টা ওরা কথা বলে চলল। তারপর এক সময় গল্প করতে করতে উঠে চলে গেল।

এই সময় দেখলাম একখানা চিঠি ওদের একজনের পকেট থেকে ছিটকে পড়েছে। আমি আনমনে দেখে এগিয়ে সেটা তুলে নিলাম।

সেই চিঠিটায় লেখা আছে।

প্রিয় পরিমল ও বিপ্রদাস,

তোমাদের দুজনের কাল রায় বাহাদুর এস. চ্যাটার্জীর ছেলের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতে হবে। উপযুক্ত সময়ে আড্ডায় এসে পৌঁছাবে আশা করি।

ইতি

বলবন্ত

দীপক বলল—ও বলবন্তের শিকার তাহলে রায়বাহাদুর এস. চ্যাটার্জীর ছেলে?

রতন হেসে বলল—হ্যাঁ। আমি মনে করছি পুলিসকে এ বিষয়ে জানাব না কিছু।

দীপক বলল—নিশ্চয়। আমাদের নিজেদের এগুতে হবে ওদের বিরুদ্ধে। কাল তুই রায়বাহাদুর এস. চ্যাটার্জীর বাড়িতে পাহারা দিবি।

রতন বলল—আচ্ছা।

সাত

বর্ষণক্লান্ত কলকাতার বুকে আঁধার নেমে এসেছে।

পথে শুধু জল আর কাদা। মাঝে মাঝে কাদা ছিটিয়ে ট্রাম বাস হু'চারটা যাতায়াত করছে।

রিকশা ঠুং ঠুং শব্দ তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে খদ্দেরের আশায়।

সেন্ট্রাল এভিনিউর ওপরে বিরাট চারতলা বাড়ির ওপরের ঘরগুলোতে আলো জ্বলছে। নীচের ঘরগুলি সম্পূর্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

একটা কালো মোটর গাড়ি এসে দাঁড়ালো বাড়িটার সামনে।

গাড়ি থেকে নামল চারজন লোক।

নেপালী দারোয়ান প্রশ্ন করল—কিস্‌কো চাহিয়ে আপ্‌।

একজন বলল—রায়বাহাদুর মিঃ চ্যাটার্জীকে!

দারোয়ান বলল—তিনি উপরে আছেন, আচ্ছা আপনারা এধারের ঘরে এসে বসুন।

কিন্তু তাকে আর বেশী দূর এগোতে হল না। হঠাৎ পেছন থেকে একজন সজোরে আঘাত করল লোকটির মাথায়।

আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো সে! তারপরেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

তিনজনে ধরাধরি করে ওকে বেঁধে ফেলল। হাত দুটো, মুখ বেশ ভাল করে বেঁধে ফেলে একজন ছুটে গিয়ে কলিং বেল টিপে দিল। অন্য দু'জন আহত লোকটাকে ধরাধরি করে পাশের ঘরে রেখে এলো।

কলিং বেল টিপতেই একজন উর্দিপরা বেয়ারা ছুটে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল।

ক্ষ্যাপা বাঘের মত তিনজনে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঐ লোকটির উপরে। সামান্য শব্দ করার আগেই এদের মিলিত আক্রমণে বন্দী হলো লোকটি। তার হাত পা বেশ ভালভাবে বেঁধে চারজনে একসঙ্গে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

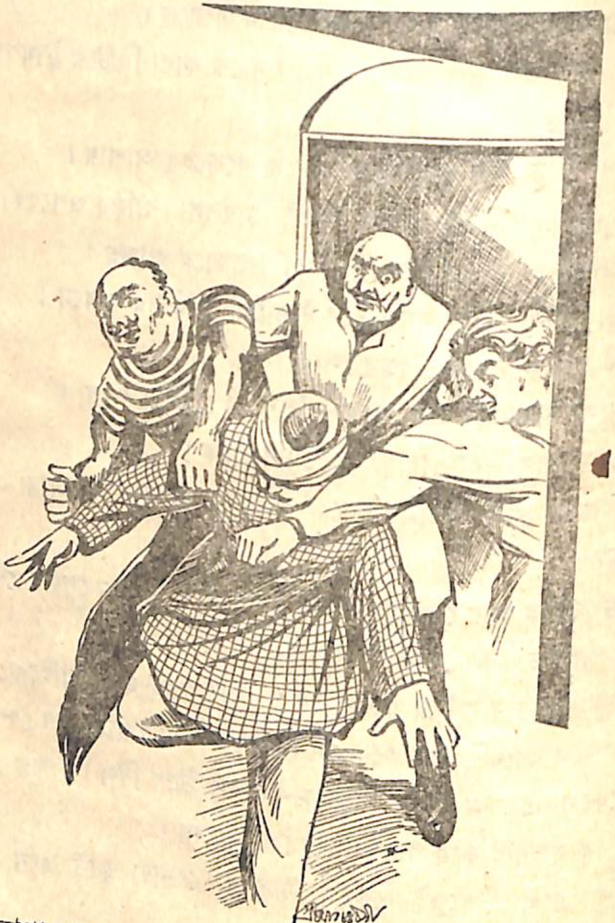

ক্ষ্যাপা বাঘের মত তিনজনে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির উপরে।

একসঙ্গে এতগুলো লোকের পায়ের শব্দ উপর থেকে টের পেয়ে মিঃ এস. চ্যাটার্জী তক্ষুনি পুলিসে ফোন করবার জন্যে রিসিভারটা তুললেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য! টেলিফোনের তারটা অনেক আগেই কাটা হয়ে গেছে।

সমস্ত বাড়িটার উপর দিয়ে বয়ে গেল একটা তীব্র অত্যাচারের ঢেউ।

হইচই চেঁচামেচি, হুল্লোড়।

ধস্তাধস্তির শব্দ, চিৎকার আর কোলাহল।

তারপর শোনা গেল সিন্দুক ভাঙবার প্রচণ্ড একটা শব্দ। একটা ভয়ার্ত শিশুর আতঙ্কের চিৎকার শোনা গেল তারপর।

ভেসে ভেসে উঠল একটা আর্তনাদ—যেন ধরিত্রীর পাঁজরে এঁকে দিল এক বিরাট মহাজিজ্ঞাসা।

কিছুক্ষণ পরে—

চারজনে যখন মোটরে উঠল তখন দেখা গেল তাদের সঙ্গে একটি জ্ঞানহীন শিশু, আর দুটি বড় বড় থলি অলংকার আর টাকা বোঝাই করা।

বাড়িটাতে পড়ে রইল শুধু কয়েকজন আহত ভয়ার্ত নরনারী, আর লণ্ডভণ্ড অবস্থায় কতকগুলি জিনিসপত্র।

গাড়ি স্টার্ট দিল।

ওদিকে এমনি সময়ে দেখা গেল মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা পাগলটা যেন মৃদু হাসল।

তার হাসির কারণ কি তা কেউ বুঝল না।

এতক্ষণ সে শুধু কতকগুলি ছেঁড়া ন্যাকড়া, ডাবের খোসা আর কাগজের টুকরো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল আনমনাভাবে।

এবার সে এগিয়ে গেল জোর পায়ে দূরের একটা ট্যাক্সির দিকে। তারপর

গাড়িতে উঠে বসার উপক্রম করতেই ড্রাইভার বলে উঠল —এই উল্লুক, ভাগ তু হিঁয়াসে।

কিন্তু পাগলটা কোনও কথা না বলে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে তাকে দেখাল।

সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার সেলাম ঠুকে সরে দাঁড়াল।

এবারে ভাল করে তাকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যেত যে, দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলাল ছাড়া অন্য কেউ নয়।

আগের গাড়িটা ছুটছিল।

তার পেছনের লাল আলোটা দেখা যাচ্ছে।

রতনের নির্দেশে ট্যাক্সি ছুটে চলল সেই গাড়ির পেছনে পেছনে।

অনেকটা দূরত্ব থাকলেও রতনদের ঐ গাড়িটা অনুসরণ করতে কোনও কষ্ট হলো না। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ি দুটি ছুটে চলল পূর্ণ বেগে।

আট

নৈশ আঁধারে সুপ্ত মহানগরী কোলকাতা।

পথ ধরে ছুটে চলেছে দু'খানা মোটরগাড়ি তীব্র বেগে গতি-সীমার বাঁধন না মেনে।

যেন একটি কক্ষচ্যুত উল্কা ছুটে চলেছে কোন্ একটা অচেনা পথে।

প্রশস্ত রাজপথ পড়ে আছে চুপচাপ। বাধা নেই কোথাও, অসুবিধে নেই খুব জোরে চালাতে।

মোড়ের মাথায় এলো গাড়ি।

কনস্টেবল হাত তুলল প্রথম গাড়িখানা থামাবার জন্যে। কিন্তু পারল না।

কে কার কথা শোনে ?

এতটুকুও কমল না গতিবেগ।

ভয় পেয়ে কনস্টেবলটি একপাশে সরে গেল। তারপর গাড়ির নম্বরটা টুকে নিয়ে চালকের উদ্দেশ্যে অভদ্রভাষায় গালাগালি করতে লাগল।

কিন্তু ওরা ততক্ষণে চলে গেছে অনেক দূরে। শুধু পেছনের আলোটা জ্বলছিল। লাল আলো দুটি যেন কোনও শিকারী বাঘের চোখের মত জ্বলজ্বল করছিল।

আশুতোষ মুখার্জী রোড, রসা রোড পেরিয়ে টালিগঞ্জ ব্রীজ।

ব্রীজ পার হয়ে গাড়িখানা তীব্রবেগে ছুটে চলল আরও দক্ষিণের দিকে।

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো ছাড়বার পরও তার গতি একটুও কমল না।

বোঝা গেল আরও অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে গাড়ি দুটো। তাদের লক্ষ্য অনেক দূরে।

আরও মিনিট পনর কুড়ি দুটি গাড়ি ছুটলো পূর্ণ গতিতে। গাড়ি দুটোর গতি কমেনি।

পেছনের গাড়িটা তখন মাত্র আর পঞ্চাশ গজ পিছিয়ে আছে।

—গুড়ুম !

বাতাসকে মথিত করে সামনের গাড়িটা থেকে গর্জে উঠল পিস্তল।

পেছনের গাড়িটা থমকে গেল। গতি কমাল। সেই অবসরে সামনের গাড়িটা আরো এগিয়ে গেল।

পেছনের গাড়িটা এবার তার দেড়শো গজ পিছন থেকে অনুসরণ করতে লাগল সামনের গাড়িকে।

পথের বাঁক।

বাঁকের পর সামনের গাড়িটা অদৃশ্য হলো।

বাঁক পেরিয়ে এসে পেছনের গাড়িটা আর সামনের গাড়ির সন্ধান পেল না।

সামনের গাড়িটা কোথায় গেল? সেটা কি তবে একবারে বাতাসে মিলিয়ে গেছে?

পেছনের গাড়ি থেকে রতন নেমে এবারে মাটির উপরে চাকার দাগ দেখতে লাগল টর্চ জ্বেলে।

ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে দাগ খুঁজতে লাগল পথে।

হ্যাঁ পাওয়া গেছে।

ঐ তো, মাটিতে গাড়ির চাকার দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সামনের গাড়িটা তাহলে এই পথ ধরে চলে গেছে নিশ্চয়।

কিন্তু ও পথ দুর্গম।

এ পথ ধরে গেলে তারা কি সহজে এগোতে সক্ষম হবে, এত রাতে?

বেশ ঘন জঙ্গল।

এ জঙ্গলে বাঘ ভালুকও হয়ত আছে।

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে চলে গেছে আঁকাবাঁকা একটা পথ।

এ পথ ধরে এগোলে কোথায় যাওয়া যায় তা কে জানে?

কিন্তু রতন অত সহজে ভয় পাবার লোক নয়।

তাই সে এগিয়ে চলল সরু পথটা ধরে পায়ে হেঁটে, ধীরে ধীরে।

সে ভাবল, এর শেষ কোথায় তা সে দেখতে চায়।

খুব বেশি দূর তাকে এগোতে হলো না।

মাত্র আধ মাইল পথ সে পথের উপরে গাড়ির দাগ আর পায়ের ছাপ দেখে দেখে এগিয়ে গেল।

তারপরেই জঙ্গলের মধ্যে দেখা গেল একটা বড় পোড়ো বাড়ি। বাড়িটা

পাকা। মাথায় টিনের চাল দেওয়া। মাঝে মাঝে সেটা ভাঙ্গা। একটা ভ্যাপসা আঁধার যেন বাড়িটা ঢেকে রেখেছে।

বাড়িটার চারদিকে সরু সরু সব তার দিয়ে ভাল ভাবে ঘেরা।

সেদিকে চেয়ে রতন থমকে দাঁড়াল হঠাৎ।

যেভাবে তারগুলো ঠাঙানো আছে তা দেখে রতনের সন্দেহ হলো।

হয়ত এর মধ্যে ইলেকট্রিক কারেন্ট চলাচল করছে।

কিন্তু তা কিভাবে পরীক্ষা করা যায়? কিন্তু তা পরীক্ষা না করে তো আর এগোন চলে না—তা উচিতও নয়।

অগ্রসর হবার আগেই বাড়িটা চারপাশ থেকে বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল রতন।

বাড়িটার পেছনে নানা ধরনের গাছ দাঁড়িয়ে আছে জড়াজড়ি করে।

তাল, নারকেল, পিয়ারা, কুল এইসব গাছ সেখানে।

নীচে ফণিমনসা, কালকাসুন্দা, আসশেওড়া প্রভৃতি গাছের জঙ্গল।

রতন একটু ভাবল।

তাকে অগ্রসর হতে হবে বেশ বুদ্ধি করে ধীরে ধীরে।

রতন গাছের মাথায় উঠল। একটা গাছে উঠেই লাফ দিয়ে সে অন্য পারে পড়ল।

রতন সফল হলো। তার মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি।

রতন ভাবল, এরপর সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হবে তার কাজে।

তবে সে ভাবল, এই বাড়িতে ঢোকা যত সহজ বের হওয়া তত সহজ নয়।

তবু সে চিন্তিতভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ভাবল, এখানে এসে সে হয়ত ভাল কাজ করেনি বিশেষ করে একা।

তবু বাঘের গুহায় হাত দিয়ে কোনও লাভ হবে কি তার?

দেখা যাক, শেষ অবধি কি হয়?

নয়

বাইরে থেকে বাড়িটা দেখে মনে হয় না যে বাড়িটা এত বড়।

এত বড় জায়গা জুড়ে যে তার অবস্থিতি তা দেখে রতন হতবাক হয়ে গেল।

খানিকটা ফাঁকা জায়গা পার হয়ে একটা পোড়ো জমির মত জায়গা ছিল।

তারপরেই ঝোপ আর জঙ্গল। অনেকগুলো ছোট বড় গাছের জটলা।

তার মাঝ দিয়ে সরু পায়ে চলার পথ। দু তিনটে পথ ভাগ হয়ে গেছে। একে একটা বিরাট গোলকধাঁধা বলে মনে হয়।

কোন্ দিক দিয়ে যে এগোতে হবে তা রতন ঠিক করতে পারল না।

বাঁ দিকের পথটা ধরে রতন এগিয়ে চলল। একবার মনে মনে ভাবল, দীপককে খবর পাঠালে মন্দ হতো না তার।

তারপর ভাবলে, কি প্রয়োজন? দীপককে ছাড়া কি সে একা ওদের মুখোমুখি হতে পারবে না?

সাহসে ভর করে সে এগিয়ে চলল। সামনে চার পাঁচখানা ঘর।

প্রতিটি ঘর খোলা। কোনও জনমানবের চিহ্ন মাত্র নেই।

আশ্চর্য!

এ বাড়িতে কি তাহলে কেউ থাকে না নাকি?

কিন্তু এখানে এসেই কিছু আগে ঐ কালো মোটরটা মিলিয়ে গেল। তাহলে?

কিন্তু না। রতন অত সহজে হার মানতে রাজী নয়। দস্যু বলবন্ত তাকে অত সহজে ঠকাতে পারবে না কখনোই!

বাঁ পাশের ছোট্ট ঘরটাতে অনেক জিনিসপত্র ঠাসা ছিল।

সেগুলো দেখে মনে হয় কোনও ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার করার নানা সরঞ্জাম সেসব। কাচের সব শিশি-বোতল, ফ্লাস্ক, টেস্টটিউব ইত্যাদি। কিন্তু এ ঘরে কে থাকে যে, এত সব জিনিসপত্র নিয়ে কাজকর্ম করে?

রতন ভাবতে লাগল।

ডানদিকে বারান্দা। তারপর পাশাপাশি যত ঘর একের পর এক। প্রত্যেকটা ঘরই বাইরে থেকে বেশ বড় বলে মনে হয়।

সব ঘরের দরজা খোলা।

রতন সামনের বড় ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ল হঠাৎ। বিরাট ঘরটা—নিস্তব্ধ, নিঝুম। কেউ কোথাও নেই।

লোকগুলো সব গেল কোথায়?

ঘরটি বেশ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল রতনলাল। ঘরের মধ্যে সে যেন কোনও কিছু আবিষ্কার করতে বদ্ধপরিকর।

প্রতিটি দালানে সে টোকা দিল। কিন্তু কোথাও ফাঁকা আওয়াজ পেল না।

তারপর মেঝের উপরে পা দিয়ে আঘাত করতে লাগল রতনলাল। তাতেও কোনও সূত্র মিলল না।

হঠাৎ দালানের কাছাকাছি একটা জিনিস রতনের মনোযোগ আকর্ষণ করল। দালানের উপরে একটা বড় পেরেক পোঁতা।

রতন পেরেকটার উপরে সজোরে একটা লাঠি দিয়ে আঘাত করল।

হঠাৎ!

দালানের একটা অংশ যেন নড়ে উঠল।

ঘড় ঘড়—

শব্দ হতে না হতেই দেখা গেল মেঝের ঠিক উপরে দেওয়ালের একটা অংশ সরে গিয়ে বিরাট একটা গহ্বর দেখা দিল।

টর্চের আলো ফেলল রতন গহ্বরের মধ্যে। লম্বা একটা সুড়ঙ্গ। নিশ্চয় ভূগর্ভ পথ এটা।

সার সার সিঁড়ি যেন নেমে গেছে ধীরে ধীরে নীচের দিকে। পৃথিবীর কোন্ অতল তলে গিয়ে যে শেষ হয়েছে তা কে জানে?

নির্ভীক রতনলাল!

লঘু পায়ে সে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যেতে লাগল। সব সিঁড়ি পার হয়ে একেবারে নীচে নেমে গেল সে।

একটা দালান।

মৃদুকণ্ঠে কথার আওয়াজ ভেসে আসছে উপর থেকে।

একটা দরজা।

দরজার ফাঁকে চোখ রেখে রতন দেখতে পেল, তার ওপরে কয়েকজন লোক চুপচাপ বসে কি শুনছে।

ভেসে আসছে শব্দ।

একটা মাইক থেকে যেন মৃদু আওয়াজ ভেসে আসছে।

কে যেন গম্ভীরকণ্ঠে আদেশবাণী উচ্চারণ করে চলেছে।

যেন পৃথিবীর ওপারের কোনও লোক থেকে ভেসে আসছে সে শব্দ-তরঙ্গ।

বন্ধুগণ,

তোমরা ভাল করে আমার প্রতিটি কথা আবার শোন। একটি বর্ণও যেন ভুলে যেয়ো না।

কাল রায়বাহাদুর মিঃ চ্যাটার্জীর কাছে আমার চিঠিটা যাবে।

আমার মনে হয় তিনি ব্যাঙ্ক থেকে সামান্য এক লাখ টাকা তুলে তা

আমাদের হাতে দিতে আর কোন আপত্তি করবেন না। আর যদি তা না শোনেন, তার ফল যে কি ভয়াবহ হবে তাও শুনিয়ে দেব তাঁকে নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, এবার তোমাদের অন্য দুজনের কাজ করার সময় এসেছে। তোমাদের তো সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তবু আবার বলছি।

তিন নম্বর, তুমি যাবে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর পেছনে। তিন দিনের মধ্যেই তাকে বন্দী করে আমার কাছে আনা চাই।

সাত নম্বর, তোমার উপরে ব্যাঙ্কের ভার পড়েছে, তা তুমি জান। তুমি কাল যাবে এই দলের চারজনকে নিয়ে,—দু, পাঁচ, ছয় আর এগারো নম্বর তোমাকে সাহায্য করবে। যত টাকা আনতে পারবে, তার অর্ধেক তোমরা পাবে শুধু তোমাদের পারিশ্রমিক বাবদ।

দস্যু বলবন্তের নামে আজ সারা শহর, সারা বাংলাদেশ চকিত, সন্ত্রস্ত, ভীত। কোনও ধনীর চোখে রাতে ঘুম নেই আমার কথা চিন্তা করে।

আর পুলিসবাহিনী?

অপদার্থ পুলিসবাহিনী আমার কথা ভেবে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

তা তারা ফেলবেই—কারণ অত সহজে আমি ধরা দিই না।

কথা শেষ হলো না।

হঠাৎ শোনা গেল একটা ক্ষিপ্ত হুঙ্কার।

রতন স্থির থাকতে পারল না।

সে পিস্তল হাতে হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে।

ঠিক শিকারী বাঘের মত তার গতি।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত লোকগুলি ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো।

রতন বলল—খবরদার, কেউ একটা পাও নড়বে না। মাথার উপরে হাত তোল সব শয়তানের দল। তোমাদের পালা ফুরিয়ে এসেছে আজ। যে

বাধা দেবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে আমি ঠিক কুকুরের মত গুলি করে মারব। এতটুকু দয়া হবে না আমার তোমাদের মত নীচ, জঘন্য, নরকের কীটদের হত্যা করতে।

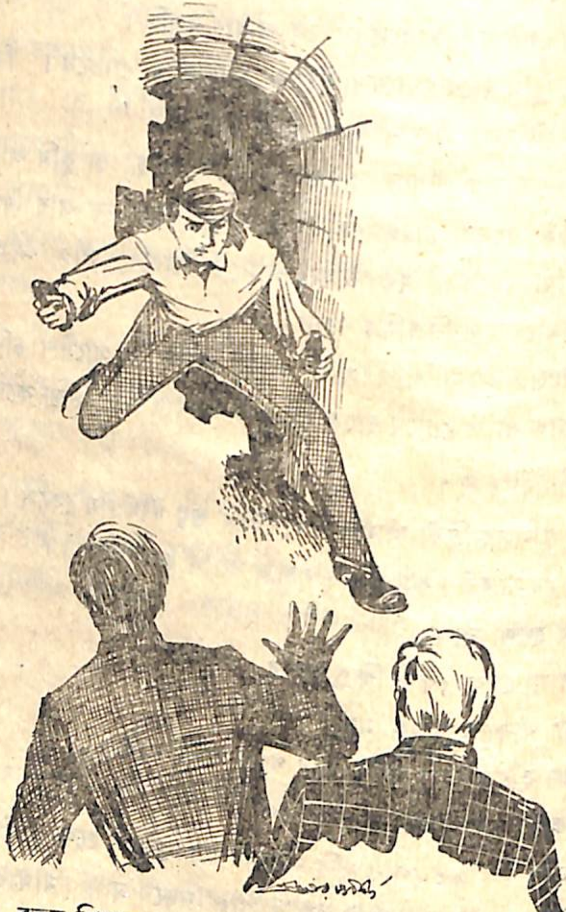

রতন পিস্তল হাতে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে।

রতনের হাতের পিস্তল উদ্যত।

তার দুটি চোখে তখন আগুন জ্বলছে।

একজন একটু এগোবার চেষ্টা করতেই রতন তার পা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল।

সকলে বাধ্য হয়ে হাত তুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো স্থাণুর মত।

দশ

সকাল সাড়ে সাতটা বাজে।

চা শেষ করে খবরের কাগজটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল দীপক।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল ঘন ঘন—ক্রিং ক্রিং—

রিসিভার তুলে নিল দীপক।

—হ্যালো, কে কথা বলছেন?

—লালবাজার থেকে ডেপুটি কমিশনার মিঃ রায় কথা বলছি।

—কোনও নতুন খবর আছে নাকি?

—হ্যাঁ, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের একটা বড় ভ্যান ভরতি টাকা, ব্যাঙ্ক নোট ইত্যাদি চালান যাচ্ছে। এই সব ব্যাপারের দিকেই তো দস্যুদের নজর থাকে বেশী, তা জানেন। তাই যদি আপনার সময় হয়, দয়া করে ওটার উপরে একটু নজর রাখতে হবে।

—পুলিস পাহারা থাকছে তো?

—হ্যাঁ। ঐ ভ্যানের পেছনে এক লরী পুলিস অবশ্য পাহারায় যাবে। কিন্তু তবু আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

—এত ভয়ের কি কারণ হলো ?

—কারণ আছে। কিছুদিন হলো কোলকাতা শহর এবং শহরতলীর উপর দস্যু বলবন্তের অত্যাচার যে কি হারে চলছে, তা নিশ্চয় জানেন আপনি ?

—তা তো জানিই।

—এখন কথা হচ্ছে, এই ধরনের মোটা টাকা একসঙ্গে দেখলেই বলবন্তের নজর সেদিকে আগে আকৃষ্ট হয়, তা তো জানেন।

—তা বটে।

—আচ্ছা, মিঃ এস. চ্যাটার্জীর ছেলেটিকে হঠাৎ যে চুরি করল, এর পেছনে আপনি তো কাজ করছেন। তাই না ? কোনও সমাধান পাননি ?

—না। রতনলাল তো ব্যাপারটার পিছনে কাজ করছে। তারপর রতনলাল এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ আছে। তার কোন পাত্তা নেই। বাধ্য হয়ে আমিই চেষ্টা করছি ঐ ব্যাপারে। কোন সমাধানে এখনো পৌঁছুতে পারিনি। তবে আশা করছি শীগ্‌গীরই একটা সমাধান পাব।

—তা হলে আপনি রাজী ?

—নিশ্চয়ই। আমি আজ থেকেই এদিকে নজর রাখছি বিশেষভাবে। দেখি যদি কোনও পথের রেখা চোখে পড়ে। অবশ্য সবই নির্ভর করছে ভাগ্যের উপরে।

ডেপুটি কমিশনার বললেন—দেখুন একটু মনোযোগ দিয়ে। তা না হলে আমাদের পুলিস বিভাগের যা দুর্নাম রটে গেছে, কোথাও তো কান পাতাও যায় না।

—সে কথা সত্যি।

—দস্যু বলবন্ত অল্পদিনের মধ্যে যেন একেবারে সবাইকে ছাপিয়ে গেল।

—দেখা যাক, কতদূর কি করতে পারি। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে আমি ভয় পাই না। তা তো জানেন।

—ধন্যবাদ।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল।

* * * *

আধো অন্ধকার ঘরের মধ্যে দশ বারো জন লোক সারসার বসেছিল। প্রত্যেকের মুখে ছিল একটা করে কালো মুখোশ আঁটা।

ঘরের মধ্যে অসীম নীরবতা।

এতগুলি লোকের চোখ একদৃষ্টে যেন রতনের দিকে নিবদ্ধ।

তাদের দৃষ্টিতে ভয়াবহ হিংসা আর কুটিলতা। যে কোনও মুহূর্তে তারা রতনের উপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে রুদ্ধ আক্রোশে।

রতনের দুহাতে দুটো পিস্তল।

তার ভঙ্গীতে অসীম দৃঢ়তা।

রতন দৃঢ়কণ্ঠে বললে—যে এতটুকু নড়বে সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেব। আমার কাছে আজ কোন ক্ষমা নেই। আমি নির্দয়, নিষ্ঠুর। দরকার হলে সব কজনকে একে একে গুলি করে হত্যা করব। কেউ পালাবার চেষ্টা করো না।

সকলেই মাথার উপরে হাত তুলল।

রতনের কাছে ছিল একটা বড় সিল্কের দড়ি। রতন সেটা এদের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল—তোমরা একজন অন্যজনকে দড়ি দিয়ে বাঁধ। বেশ শক্ত করে। না বাঁধলে বা আমার আদেশের অন্যথা হলেই গুলি খেতে হবে।

কিন্তু হঠাৎ রতনের কথা বন্ধ হলো।

কোথা থেকে যেন ভেসে এলো একটা তীক্ষ্ণ অট্টহাসির শব্দ—হাঃ হাঃ হাঃ।

একটা কণ্ঠস্বর যেন ভেঙে ভেঙে পড়ছে প্রচণ্ড হাসির আবেগে।

তারপরে কোথা থেকে যেন ভেসে এলো একটা কণ্ঠস্বর—মূর্খ, মূর্খ তোমরা। তোমার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে—তাই তুমি এই বাঘের গুহাতে পা দিয়েছ। আর তুমি বের হতে পারবে না।

কিন্তু লোকটাকে দেখা গেল না।

রতন ভাবল, আশ্চর্য, কোথা থেকে অদৃশ্য লোকটির কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে?

রতন জোরে জোরে বললে—কে তুমি? সাহস থাকে তো আমার সামনে এসে দাঁড়াও।

কণ্ঠস্বরে ভেসে এলো—আমিই দস্যু বলবন্ত। আমি পুলিসের বিহ্বলকারী, ধনীর শত্রু। তোমার মত সামান্য রতনলালের সাধ্য নেই, আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে।

রতন বুঝতে পারল। সবার চোখের আড়াল থেকে সে মাইক্রোফোন বা ঐ জাতীয় যন্ত্রের মধ্য দিয়ে কথা বলছে। কিন্তু কোথায় যে সে লুকিয়ে আছে তা দেখা যাচ্ছে না।

রতন গর্জে উঠল—যদি সাহস থাকে তো বেরিয়ে এসো শয়তান। চোখের আড়ালে লুকিয়ে থেকে বক্তৃতা দেওয়াটা মোটেই বীরত্ব নয়।

কিন্তু কে বেরিয়ে আসবে? বলবন্তের নামগন্ধও নেই কোথাও।

হঠাৎ—

রতনের চোখের সামনে আলোটা ধীরে ধীরে নিভে গেল।

ঘন অন্ধকার—সে অন্ধকার যেন দিগ্‌বিদিক্‌কে গ্রাস করছে।

অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজে ভর করে গুলি ছুড়ল রতন—গুড়ুম!

নৈশ রাতের আঁধার যেন কেঁপে কেঁপে উঠল পিস্তলের গুলিতে।

শোনা গেল একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

তারপর কোথা থেকে একটা সজোরে আঘাত এসে পড়ল রতনের মাথায়।

কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল তা ভাল করে বোঝার আগেই রতন জ্ঞান হারাল।

তখনও ওধারে কে যেন বিদ্রূপের হাসি হাসছে—হাঃ হাঃ হাঃ—

যেন বিদ্রূপ করছে সারা বিশ্বকে। সারাটা পুলিস বিভাগকে।

সব মানুষকে সে যেন একান্তভাবে উপেক্ষা করে চলতে অভ্যস্ত। ভয়াবহ, দুর্ধর্ষ।

এগারো

ঢং ঢং—

বেলা বারোটা বাজল। পেটা ঘড়ি ঘোষণা করল বেলা এখন দুপুর।

ডালহৌসী স্কোয়ার।

মোড় পেরিয়ে একটা ভ্যান ছুটল সোজা দক্ষিণ দিকে। তীব্র তার গতি।

তার পেছনে আর একটা পুলিস লরী ছুটেছে তাকে পাহারা দিয়ে।

দুটি গাড়িই ছুটেছে পূর্ণ বেগে।

হঠাৎ—

কোত্থেকে একটা বিরাট মোটর ভ্যান ছুটে এসে পুলিস লরীতে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিল।

দুটি গাড়িই ছিটকে পড়ল। দুটি গাড়িরই পেট্রল ট্যাঙ্ক ভেঙে গেল।

দাউ দাউ করে আগুন জলে উঠল—সারাটা পথে সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল।

উন্মত্ত তাণ্ডবে বিরাট ধ্বংসলীলা শুরু হয়ে গেল।

একসঙ্গে অনেক লোক এসে সামনের ভ্যানটা হঠাৎ ঘিরে ফেলল।

সংখ্যায় তারা পাঁচজন।

প্রত্যেকের হাতেই উদ্যত রাইফেল। প্রত্যেকের কোমরে পিস্তল রাখা আছে।

মুহূর্তমাত্র।

ভ্যানের সব লোককে তারা বেঁধে ফেলল। তারপর আহত পুলিসদের সামনে দিয়ে গাদা গাদা ব্যাঙ্ক নোট বোঝাই বাক্স উঠল একটা গাড়িতে।

যে মোটরে সব উঠল, সেটাতে উঠে বসল লোকগুলি।

সে গাড়িটা ছুটে চলল।

সব যেন ঘটে গেল ঠিক একটা সিনেমা বইএর দৃশ্যের মতোই আকস্মিক ভাবে।

কিন্তু অন্য একটা দৃশ্য দেখা গেল।

আর একটা মোটর দূর থেকে এই সব গাড়িকে ফলো করে আসছিল।

তাতে বসেছিল গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী স্বয়ং। সে কোনও বাধা দিল না।

সে যে এই সব দৃশ্য দেখতেই এখানে এসেছে তা বোঝা যায় না।

ব্যাপারটা কি ঘটছে তা ভাল করে বোঝার আগেই পুলিস লরী ও ভ্যানের লোকরা দেখতে পেল যে দস্যুরা সব টাকা নিয়ে পলায়ন করছে।

অথচ তাদের বাধা দেবার কোন ক্ষমতাও তাদের ছিল না।

দেখতে দেখতে লোকজন জমে গেল।

সকলের মুখে এক কথা।

কে এই দুঃসাহসিক দস্যু? কি তার প্রকৃত পরিচয় তা কে জান?

আহত লোকগুলিকে তুলে তারা শুশ্রূষা করতে লাগল। দস্যুদের উদ্দেশ্যে তারা গালাগালি করতে শুরু করল।

কিন্তু এসব ঘটনা ঘটার আগেই দস্যুদের গাড়িটা ছুটে চলল পূর্ণ বেগে দক্ষিণ দিকে।

আর তাদের দূর থেকে অনুসরণ করতে লাগল একটি গাড়ি।

সে গাড়িতে বসে রয়েছে মাত্র একজন লোক—সে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন।

সেই লোকটিই হলো গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী স্বয়ং। সে গাড়ির গতি বৃদ্ধি করে অনুসরণ করে চলল।

* * *

ধীরে ধীরে রতন জ্ঞান ফিরে পেল।

দেখল সে একটা অন্ধকার স্থানে চুপচাপ শুয়ে আছে।

নীচে ভেজা স্যাঁতসেঁতে মাটি। দিন না রাত তা বোঝার কোন উপায় নেই।

নিজের বুদ্ধিহীনতাকে ধিক্কার দিল রতন। রতনের পায়ের শব্দ পেয়ে অনেকগুলো বাদুড় আর চামচিকা উড়ে গেল।

হাতের টর্চটা খুব সাবধানে চারদিকে ফেলে দেখতে লাগল রতন।

কিন্তু কোথাও কেউ নেই। বাইরে শুধু মাতাল বাতাসের একটানা কান্না। শোঁ শোঁ—

দুঃসাহসী রতন।

জীবনে বহুবার বহু বিপদে সে পড়েছে বটে কিন্তু কখনো ভয় পায়নি।

হঠাৎ রতন তাকাল সামনের দিকে।

বিরাট একটা বুদ্ধমূর্তি।

এই ঘরে এমন মূর্তি কেন? রতন চিন্তা করতে শুরু করল।

রতনের হাত পা বাঁধা নেই। এই ভূগর্ভ কক্ষ থেকে বের হবার কোনও পথ নেই বলেই তার হাত পা সব খোলা ছিল।

রতনের কৌতূহল হলো।

সে এগিয়ে গিয়ে বুদ্ধমূর্তিটা ধরে টান দিল। কিন্তু তা নড়ল না একটু।

এটা কি তবে দালানের সঙ্গে আটকানো আছে? রতন চিন্তা করতে লাগল।

মূর্তিটির নীচে একটা ছোট বোতাম।

আলো ঘরে খুব সামান্য আছে। তবু বোতামটা যেন চকচক করছে।

রতন এগিয়ে গিয়ে বোতামটাতে খুব জোরে চাপ দিল একবার।

ঘট্ ঘট্ ঘটাং—

মূর্তিটা এক পাশে সরে গেল।

কোলকাতা থেকে এত দূরে একটা পোড়ো বাড়ির বুকে সে যে এমন সব ঘটনা দেখবে তা ভাবতেও পারেনি। যে দলের সঙ্গে সে সংগ্রাম করতে অবতীর্ণ হয়েছে তারা কত শক্তি ধরে তা সে বুঝল।

তার সারা জীবনে এমন শক্তিশালী দলের সঙ্গে সে সংগ্রাম করেনি।

রতন অবাক হলো।

তবু ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবার ছেলে রতনলাল নয়। ভয় পেলে সে দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী হয়ে এসব কাজে নামত না।

রতন দেখল বিরাট একটা গহ্বর হাঁ করে আছে তার সামনে।

রতন সাহসে বুক বাঁধল।

দেখা যাক কি হয়।

কিন্তু সে কিছু করতে পারল না।

তার আগেই দেখা গেল উপরের দিকে একটা অংশ ফাঁক হয়ে গেল। দেখা গেল একটা দরজা।

সিঁড়ি বেয়ে চলে এলো একটি লোক। হাতে তার উদ্যত পিস্তল।

সিঁড়ি বেয়ে চলে এলো একটি লোক। হাতে তার উদ্যত পিস্তল।

লোকটা বললে —এই যে টিকটিকি। তারপরে কেমন আছো এখন ?

—ভাল।

—আমি কে জান ?

—না।

—আমিই দস্যু বলবন্ত। যার নামে সারা ভারত ভয়ে কাঁপে।

রতন তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে —তা হতে পারে। তুমি একটা ডাকাতএই তো ?

—হ্যাঁ। কিন্তু সাধারণ নয়। তা হোক, তুমি এখন বুঝতে পারছ তো কত আমার ক্ষমতা ?

—না।

—পারনি ? পারবে শীগগীর। তবে আমি যে কত ভয়ানক তা বোঝার আগেই তুমি শেষ হবে। তা হোক, একটা কথা বলবে ?

—কি কথা ?

—কি করে তুমি আমাদের সন্ধান পেলে ?

—জানি না।

—বলবে না ? দরকার নেই। তবে জেনে রাখো, যারা আমার পেছনে লাগে তাদের আমি একটি মাত্র দণ্ডই দিয়ে থাকি।

—জানি। মৃত্যুদণ্ড।

—ঠিক। মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে তোমার মৃত্যু ঘটবে এখানেই।

—বেশ।

—কিন্তু ছোকরা, তুমি এত বড় বড় কথা কেন বলছ বলো তো ? আমরা আজই বিরাট অঙ্কের টাকা পেয়েছি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লুট করে। তা ছাড়া এবার এস্. চ্যাটার্জীর ছেলের বাবদ টাকা আদায় হবে। পুলিসের ক্ষমতা নেই আমাকে বাধা দেয়।

—কিন্তু, একটা কথা বলবন্ত—

—কি ?

—তোমার কি ধারণা আমি একাই তোমার খবর জানি ?

—না। তা জানি না।

—তবে ? পুলিস এলো বলে।

—আসুক। এখান থেকে কেউ ফিরে যেতে পারবে না। আমার দলে বহু লোক আছে। প্রতি লোক সব খবর রাখে। আমার পেছনে যারা লাগবে তাদের সব খবর আমি পাব। আর তারাও সব মরবে তোমার মতই।

—তাই নাকি ?

—মিথ্যা গর্ব আমি করি না। তুমি যে দরজাটা একটু আগে খুললে, এখন দেখ তা বন্ধ।

বলেই বলবন্ত একটা শীশ দিল।

একজন লোক এলো।

সে বললে—একে বেঁধে ফেল।

রতনকে বেঁধে ফেলে রাখল মেঝের বুকে।

বলবন্ত বললে—তিন ঘণ্টায় মধ্যে এই পাতালঘর জলে ভরতি হবে। তোমার ভাগ্যে মৃত্যু লেখা আছে জেনো। আচ্ছা, আমি চলি।

বলবন্ত বেরিয়ে গেল।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

বারো

গাড়িটাকে অনুসরণ করে দীপক এসে পৌঁছাল জঙ্গলের ধারে ?

সে ভাবল, এবার কি করা যায় ?

বাড়িটা সে দেখেছে। ওদের আড্ডা সে জানে। কিন্তু এখন সেখানে যাওয়া নিরাপদ নয়।

ওরা সংখ্যায় অনেক।

আর সে একা।

দীপক তক্ষুণি একটা প্ল্যান ঠিক করল।

সে একটা বিরাট তার খুলে তার সঙ্গে লাগানো ট্র্যান্সমিটার চালু করল।

তারপর বলতে লাগল—হ্যালো—

— কে ?

—আমি দীপক ?

—আপনি কে ?

—পুলিস কমিশনার।

—মোহনপুর জঙ্গল থেকে কথা বলছি আমি।

—কি খবর ?

—শীগ্‌গীর একভ্যান পুলিস পাঠান ?

—কেন ?

—বলবন্তর আড্ডার সন্ধান পেয়েছি।

—ঠিক আছে।

* * *

ঝম্ ঝম্ —ঝম্ ঝম্—

প্রচণ্ড বেগে জল পড়ছে !

পাতালকক্ষে বন্দী রতন। তার কোমর অবধি জলে ডুবে গেছে। হাত পা বাঁধা।

রতন নিঃশ্বাস ফেলল।

তার কোনও উপায় নেই মুক্তি পাবার। তাকে আজ মৃত্যুবরণ করতে হবে ?

দীপক ?

কোথায় দীপক ? সে কি তার সন্ধান জানে এ সময়ে ?

বোধ হয় না।

তাই বলবন্তর হাতে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে আজ এ ভাবে।

জল রতনের বুক ছাপিয়ে উঠল।

এমন সময়—

গুড়ুম্, গুম্—

পিস্তলের শব্দ।

ঘড়্ ঘড়্—

একটা অংশ দেওয়াল থেকে একপাশে হঠাৎ সরে গেল।

মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল রতন।

জল অনেক নেমে গেছে।

শোনা গেল দীপকের কণ্ঠস্বর—রতন, রতন, তুই কোথায় ?

—দীপক—

রতন চিৎকার করে উঠল।

*　　　　*　　　　*

পুলিস ভ্যান এসে গেছিল।

দীপক সদলে বাড়িটা ঘেরাও করে সেটা আক্রমণ করল।

বলবন্তের দলবল সব ধরা পড়ল।

রতনকেও তারা উদ্ধার করল বাড়ির নীচের তলার কক্ষ থেকে।

রায়বাহাদুর চ্যাটার্জীর ছেলেকেও একটি ঘরে পাওয়া গেল।

কিন্তু বলবন্ত উধাও।

কোন্ পথে যে কে পালাল তা কে জানে ?

সে শুধু রেখে গেছে একটা চিঠি।

তাতে লেখা—

প্রিয় দীপকবাবু ও পুলিস কমিশনার,

এবার ব্যর্থ হলেও আবার দেখা হবে। আশা করি সে দিন দূরে নয়।

ইতি—

দস্যু বলবন্ত।

সেদিকে তাকিয়ে দীপক দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

শেষ

বিশ্বচক্র সিরিজ

স্বপনকুমারের ডিটেক্‌টিভ গ্রন্থমালা—প্রত্যেকখানির মূল্য ·৬০ পয়সা

১। অদৃশ্য সঙ্কেত
২। দুরাত্মার ছল
৩। ভ্রান্তপথের শেষে
৪। চলন্ত ছায়া
৫। হিংসার অন্ধকার
৬। অব্যর্থ সন্ধান
৭। বিষাক্ত হাসি
৮। মিথ্যা চমক
৯। চায়না লজ
১০। বিজয়িনী তন্দ্রা
১১। শ্বেতপদ্ম
১২। অদৃষ্টের পরিহাস
১৩। ব্যথার প্রদীপ
১৪। মৃত্যুহীন প্রাণ
১৫। রক্তকমল
১৬। নূতন অতিথি
১৭। পৃথিবী থেকে দূরে
১৮। হারান ডাইরী
১৯। বিকেল ছ'টার 'শো'তে
২০। বিফল স্বপ্ন
২১। বাগানবাড়ি
২২। প্রবালপুরী
২৩। জীবন-মৃত্যু
২৪। পরপারের পথিক
২৫। জমাট অশ্রু
২৬। পরাজয়ের গ্লানি
২৭। আলো-আঁধার
২৮। তিন বন্ধু
২৯। ছায়ার আর্তনাদ
৩০। রাঙ্গাজবা
৩১। এক পেয়ালা চা
৩২। বেনামী চিঠি
৩৩। রত্নমালার কাহিন
৩৪। ঝড়ের সঙ্কেত
৩৫। জবানবন্দী
৩৬। ব্যর্থ অভিযান
৩৭। হারানো মাণিক
৩৮। অদৃশ্য বন্ধু
৩৯। হরতনের নওলা
৪০। গৃহপ্রবেশ
৪১। জোয়ার ভাটা
৪২। বেআইনী দখল
৪৩। রূপমহল
৪৪। পরশ-পাথর
৪৫। চোখের ভুলে
৪৬। চারশো বিশ
৪৭। রঙিন সূতো
৪৮। বিষকন্যা
৪৯। শুধু দুটি হাত
৫০। সন্ধ্যা-মালতী
৫১। বন্দী বাসুকী
৫২। শেষ রাতের কাহিনী
৫৩। বলয়গ্রাস
৫৪। মায়া-কানন
৫৫। ছদ্মবেশী
৫৬। ছন্দহারা
৫৭। তেরো নম্বর বাড়ী
৫৮। বন্দিনী বিশাখা
৫৯। একটি চোখের রহস্য
৬০। মুখার্জী ভিলা
৬১ চীনের পুতুল
৬২। কালো মুখোস
৬৩। গ্রীন ড্রাগন
৬৪। নাইট ক্লাব
৬৫। সোনার হরিণ
৬৬। তিন নম্বর ফ্লাট
৬৭। ঘূর্ণি হাওয়া
৬৮। বিষের বাঁশী
৬৯। ভাড়াটে বাড়ী
৭০। ঘুম ভাঙা রাত
৭১। শেষ অঙ্ক
৭২। লাল কুঠী
৭৩। নিশি মালঞ্চ
৭৪। পাগল হাওয়া
৭৫। ঝরা বকুল
৭৬। চৈত্রের পলাশ
৭৭। সাগর বেলায়
৭৮ আণবিক রশ্মি
৭৯। পাহাড়তলির বাংলো
৮০। কাঁটা ও কমল
৮১। প্রলয়ের আলো
৮২। জীবন-দোলা
৮৩। শ্রাবণী সন্ধ্যা
৮৪। সীমান্ত ষড়যন্ত্র
৮৫। রক্ত করবী
৮৬। অদৃশ্য পথরেখা
৮৭। অজয়গড়ের রহস্য
৮৮। পলাতক আসামী
৮৯। আঁধার রাতের পথিক
৯০। আঁধার রাতে আর্তনাদ